শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট
ও
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র
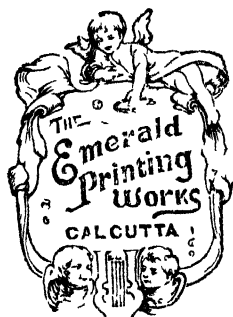
উৎসর্গ

মাতৃচরণে

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত

অন্নপূর্ণার মন্দির	১৲
দিদি	১৷৷৹

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টক

পক্ষীরাজ

ছেলেটা সেদিন বড়ই গোলমাল করিতেছিল, তাহার সর্দ্দি হওয়াতে সেদিন সে মাঠে খেলিতে যাইতে পায় নাই। তাহার মাতাকে 'গল্প বল্' 'গল্প বল্' বলিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলাতে বিরক্ত হইয়া সপুত্র তিনি আমাকে আসিয়া পাকড়াও করিলেন। আমি তখন সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত—স্কন্ধে চাদর খানা ফেলিয়াছি, লাঠিটা লইতে কেবল বাকি। এমন সময় হুকুম হইল, "ছেলেটাকে একটু আটকাও না, কাপড় কেচে আসি।" হুকুম অমান্য করাও কঠিন, এদিকে সন্ধ্যার মধুর আলোটুকুও আমায় বাহিরে টানিতেছে। আমি বলিলাম, "আমি যে বেড়াতে যাচ্ছি।" উত্তর যাহা পাইলাম তাহা হুকুমের চাইতেও জোরের জিনিষ, কারণ সেটা একটা নিঃশ্বাস, এবং সেই নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন একটা গভীর অনুযোগ ছিল যাহা অবহেলা করা অন্ততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব। পুত্রের ও তাহার মাতার মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া আমি চাদরটা আবার আলনায় রাখিয়া দিলাম। পুত্রকে বলিলাম, "আয় অমু আমি তোকে

গল্প বল্‌ছি।" অমু তাহার মাতার অঞ্চল পরিত্যাগ ক
নিকটে আসিল। তখন পিতা-পুত্রে বারান্দার বেঞ্চিখানায় ।।শ্চ
আকাশের দিকে চাহিলাম। আমার বুক হইতেও একটা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আকাশে মিলাইল—কিন্তু তৎপূর্ব্বে অমুর মাতা চলিয়া গিয়াছে।

আমি সামান্য লোক, সামান্য বেতনের চাকরী মাত্র আমার সম্বল। সারাদিন হাডভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া তারপর এই সন্ধ্যাটুকুই আমার অবসর; এবং সেইজন্য দিনের ও রাত্রের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মরাশির পেষণ যন্ত্রণা হইতে এইটুকুই আমার মুক্তি, এইটুকুই আমার জীবন। অন্য সময় ত' আমি যন্ত্রমাত্র। তাই এই সময়টুকুর আনন্দকেও ত্যাগ করিতে হইলে আমার জীবনের আর কিছুই থাকে না। তবু এইটুকুও আমার প্রায়ই বিফল হইয়া যায়, কারণ আমি সামান্য লোক;—দু'বেলা দু'মুটা কোন রকমে জোটে এই যা।

কিন্তু শিশু ত' তাহা বুঝে না। সে তাহার শিশুত্বের রাজকর পুরা-দস্তর আদায় করিয়া লইবেই। তাহার হুকুমে, তাহার প্রয়োজনে—অপ্রয়োজনে খাটিবার জন্য সর্ব্বদাই লোক চাই। তাহার পিতা যে সওদাগরী অফিসের কেরাণী মাত্র, সে খোঁজ ত' সে রাখে না। সে বিধাতার বরে রাজপুত্র হইয়াই জন্মিয়াছে;—যতদিন না সেই বর অভি-শাপে পরিণত হয় ততদিন সে তো কাহাকেও ছাড়িবে না।

যাহাই হউক পুত্রকে লইয়া গল্প করিতে বসিয়া গেলাম। কিসের গল্প? যাহা চিরদিন চিরকালের পিতা-মাতা চিরকালের শিশুকে বলিয়া আসিয়াছে সেই গল্প—সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্রের খাঁড়া, সেই রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, সেই সোনার কাঠি রূপার কাঠি, সেই ঘুমন্ত পুরীর

ঘুমন্ত রাজকন্যা। সন্ধ্যার আলোটুকু যতই দূরে দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, যতই অন্ধকার আসিয়া আকাশকে গভীরতর, নিকটকে দূরতর করিতে লাগিল, ততই এই নিতান্তই কোটরবদ্ধ কেরাণীর মনটাও দূরে দূরে পুত্রের সহিত কল্পনার পক্ষীরাজে চড়িয়া উধাও হইয়া গেল। তখন এই কেরাণীর মন বড় বড় 'লেজার' বইএর বড় বড় রেজিষ্ট্রীর অসংখ্য 'কলমের' আকণ্ঠবদ্ধ জড়তা হইতে, একেবারে সত্য-মিথ্যার মিল-গরমিলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কোথায় যে উড়িয়া চলিল তাহার ঠিকানাই রহিল না। অমু যে কি করিতেছিল, সে শুনিতেছিল কি ঘুমাইতেছিল সে দিকে লক্ষ্যই করিলাম না—কেবল বকিবার আনন্দে বকিয়াই চলিলাম। যখন চৈতন্য হইল, তখন শুনিলাম, অমুর মাতা বলিতেছে, "ওকি হচ্চে? অমু যে ঘুমিয়ে পড়েছে, হুঁস নেই? ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে যে!"

তাইত! হুঁস নেইই ত' বটে! আমি মাছীমারা কেরাণী—আমি এই এতক্ষণ ধরিয়া রাজা-উজির, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব মারিতেছি! এই দিন মজুরীর জাঁতাপেষা ছাড়িয়া আমি কোথায় গিয়াছিলাম! তাহা হইলে এই সংসারঘানীতে ঘুরিবে কে? আমি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া লজ্জিতভাবে অমুকে তাহার মাতার জিম্মা লাগাইয়া দিলাম।

রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিয়া খাতাপত্র খুলিলাম—দিনের পিষ্টপেষণের জেরটুকু ত সারিতে হইবে? কিন্তু কোথায় আমার মন? সে যে কিছুতেই ফিরিয়া আসিয়া এই জমাখরচের মিলের মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে না। অনেকক্ষণ ধস্তা-ধস্তির পর, বিরক্ত হইয়া ভিতরে আহারের তাগাদায় গেলাম; এবং কিছুক্ষণের মধ্যে উক্ত কার্য্য সারিয়া কল্পনাসঙ্গিনী বুদ্ধিবিস্তারিণী দুশ্চিন্তা-নাশিনী হুক্কা-দেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু কেরাণীর

চক্ষু বেশীক্ষণ বিস্ফারিত এমন কি অর্দ্ধ নিমীলিতও থাকিতে পারে না,—অতএব শীঘ্রই পূর্ণভাবে মুদিবার উদ্যোগ করিল। তখন অগত্যা শয্যাগ্রহণ করিয়া আমি কল্পনাকে বিদায় দিলাম।

অর্দ্ধরাত্রে একি কাণ্ড। ডাকাত পড়িল নাকি? খট্ খটাং খট্—কাহারা যেন লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে উঠান পার হইয়া দাওয়ায় উঠিল। আমি ত' ভয়ে কাঠ। স্ত্রীকে যে উঠাইব তাহার সাহসও লোপ পাইয়াছে। ঐ যে দরজায় ধাক্কা দিতেছে! এইবারেই গেলাম! এই দরিদ্রের দুয়ারেও এমন রাজদ্বারোচিত রাজভাণ্ডারোচিত অতিথি! কি বলিয় সম্ভাষণ করিব? খট্ খটাং খট্! কে বাবা তোমরা এই ভাঙ্গা সিন্দুক আর অফিসের খাতাপত্রের লোভে এখানে আসিয়াছ? এই সব বড় বড় জমাখরচের সংখ্যাগুলা দেখিয়া যদি সন্তুষ্ট হও ত' বল, খুলিয়া বসিতেছি। ফুটা থালা বাটী গেলাস আর স্ত্রীর হাতের কাঁচের চুড়ীর লোভে যদি আসিয়া থাক তাহা হইলে তুমিও অপ্রস্তুত হইবে, আমিও হইব। অতএব আর কেন বাবা, সরিয়া পড। তবু খট খটাং খট্! না, জ্বালাইল দেখিতেছি।

কি করি; অগত্যা উঠিয়া বসিলাম। প্রদীপটা বোধ হয় তখনও নিবে নাই। আমি অতি সন্তর্পণে দরজায় যাইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম। কৈ কোন শব্দ ত' শুনা যাইতেছে না। না না ঐ যে আবার খট্ খটাং শব্দ! যেন কোনো চতুষ্পদ জন্তু আমার দাওয়ায় বেড়াইতেছে। সাহসে ভর করিয়া দরজা খুলিলাম।

দরজা খুলিয়াই অবাক্! যখন শুইয়াছিলাম তখন, বেশ মনে আছে যে, রাত্রিটা ছিল বেজায় অন্ধকার। কিন্তু এ যে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না! বেশ স্মরণ আছে, আমি যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি তখন শুক্লা তৃতীয়ার

চন্দ্র অস্ত গিয়াছিলেন। তবে এ কিসের আলো? আর বাহিরটাই বা এত পরিবর্ত্তিত এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইল কিরূপে!

আবার আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার দরজার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব অশ্ব! কিংথাপের সাজ, তাহাতে জরীর কাজ করা, সম্মুখে পশ্চাতে সোনার পাটা, কপালের উপর একটা কি চক চক করিতেছে, মাথায় সরু চামরের মত কি একটা নড়িতেছে; সর্ব্বোপরি তাহার পার্শ্বে ছবির পরীদের মত উজ্জ্বল অথচ দুই খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাখা। আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

একি হইল! আমি কি হঠাৎ কেরাণী-রাজ্য হইতে একেবারে পরীরাণীর রাজ্যে উপস্থিত হইলাম না কি? আমার সন্ধ্যার আঁধারের পক্ষীরাজ কি স্বপ্নরাজ্য পার হইয়া এই ভাঙ্গাঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে নাকি!

আমি বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে পাইলাম না। সেই অপূর্ব্বজীব আমার বিস্ময়ের মাত্রা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বলিল, "এস এস শীগ্‌গির এস, কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বে?"

তাইত! যাইতে হইবে? কিন্তু কোথায়? এ দিন মজুরী ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আমার মত লোকেরও আবার যাইবার স্থান আছে? আমাকেও কেহ এমন দূত পাঠাইয়া ডাকে?

অশ্ব আবার বলিল, "এসনা, বাইরে এস? ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" বাহিরে যাইব! ঐ যাহারা আমার শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের ফেলিয়া কোথায় যাইব? কেমন করিয়া যাইব? এই আঁধার ঘরে এই আষ্টে পিষ্টে বাঁধা দাসত্বকে আঁকড়াইয়াই যে চিরদিন থাকিতে হইবে।

আমি ফিরিয়া দেখিলাম আমার বালক পুত্র ঘুমাইতেছে, আর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমারই দ্বিতীয় মানুষটীও নিশ্চিন্ত মনে একান্ত নির্ভয়ে ঘুমাইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া শেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "পারিব না।" কিন্তু অশ্ব তাহা শুনিল না ; সে লইতে আসিয়াছে,— লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ—সে শুনিবে কেন ? সে আর একটু কাছে আসিয়া দরজার মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিল। তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ করিতেই কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া দাঁড করাইয়া দিল। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শত অদৃশ্য কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "চল চল"—আমার অন্তর হইতে দূর আকাশের নক্ষত্র লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একটি মাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল— 'চল চল'। অশ্ব বলিল,—"আমি পক্ষীরাজ, তোমায় নিতে এসেছি"।

পক্ষীরাজ ! তুমি ত' পক্ষীরাজ ; কিন্তু আমি ত' কোন রাজপুত্র নই, মন্ত্রিপুত্র কোটালের পুত্রও নই, এমন কি সওদাগরের পুত্রও নই। আমি যে সওদাগরের অফিসের কেরাণী। এমন কি আমি আমার অমুও নই। পক্ষীরাজ বলিল, "অমু আবার কে ? কেউ নেই কিছু নেই।" আমি ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—এ কি কোথায় গেল তাহারা ? আমার ছোট একতালা ঘরখানা আমার—

পক্ষীরাজ চিৎকার করিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পাখার বাতাসে ধূলা উড়াইয়া বলিল, "তুমি রাজপুত্র, তোমার জন্য এসেছি।"

আমি রাজপুত্র ! তাইত এ পোষাক কোথায় পাইলাম, কখন পরিলাম ? এই হীরা-মাণিকের তাজের উপর ফেজ ! এই সাঁচ্চা কামদার জরির পোষাক, এই কোমরবন্দ ! আর এ খানা কি ? এই বুঝি তালপত্র খাঁড়া ! খাঁড়াখানাও যেন নাকি সুরে খন্ খন্ করিয়া বলিল,

"নাও নাও আমায় নাও।" খাঁড়াখানা হাতে লইতেই আমার শরীর হইতে সমস্ত জড়তা অপসৃত হইল—মন হইতে সমস্ত দ্বিধা এক নিমেষে শুষ্ক পত্রের মত ঝরিয়া পড়িল। আমি এক লম্ফে পক্ষীরাজের পিঠে চড়িয়া বসিলাম। তারপর ছুট্—ছুট্—ছুট্।

আমি জন্মাবধি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নাই। কিন্তু পক্ষীরাজের পিঠের সঙ্গে আমার দেহটা কি করিয়া যে তখন আঁটিয়া গিয়াছিল বলিতে পারি না, তথাপি পক্ষীরাজ যাই হুস্ হুস্ করিয়া উড়িয়া চলিল, আমি ততই মহানন্দে তাহাকে তাড়না করিতে লাগিলাম। পাহাড় পর্ব্বত বন নগর সমস্ত কোথায় ধোঁয়ার মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। পক্ষীরাজের পিঠে চড়িতেই আমার কেবলি যেন স্মরণ হইতে লাগিল,—পড়িয়া থাকা আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ঊর্দ্ধে উড়াই আমাদের স্বভাব। কে এ কথা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ ছিল না, কিন্তু এইটুকুই কেবল মনে হইতেছিল যে, আমি মাটীর কীট নই, আমি উড়িবার জন্যই জন্মিয়াছি; আকাশ বাতাস দ্যু-লোক-অলোকই আমার প্রকৃত বিচরণ স্থান।

উধাও—উধাও—ঝড়ের মত উড়িয়া চলিয়াছি। মেঘের উপরে আকাশের কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। পক্ষীরাজের প্রকাণ্ড পাখায় ঠেকিয়া জোনাকির মত কত তারা নক্ষত্র ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। আমার বৈমানিক অশ্বের পদতলে কত নীল মেঘ, সোণালি মেঘ, সাদা মেঘ, চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। চাঁদের আলোর রূপালী সাগর ভেদ করিয়া আমরা ছুটিয়া চলিলাম। আমার তাজে কত তারকার আলোক চূর্ণ, আমার জরির জুতায় কত মেঘের কোমল স্পর্শ, আমার উড্ডীয়মান পিঠ-বস্ত্রে কত তুষারের শুভ্র চুম্বন

অঙ্কিত হইল তাহার ঠিক নাই। আকাশের গায়ে বিদ্যুতের রেখা আঁকিয়া আমি ছুটিয়া চলিলাম।

এইরূপে কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই—কারণ তখন ছুটিবার আনন্দে ছিলাম। প্রচণ্ড গতির মধ্যে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই ধূমের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন ছিল কেবল বর্ত্তমান —ছিল কেবল ছুটিয়া চলা।

হঠাৎ যখন আমার গতি রুদ্ধ হইল, দেখিলাম, আমি এক অপূর্ব্ব দেশে আসিয়াছি। সে দেশ কখনও দেখি নাই অথচ তাহা যেন সম্পূর্ণ পরিচিত, তাহার শ্বেত পাথরে বাঁধা পথ, তাহার সোনার পাহাড়ে রূপার ধারার নির্ঝর, তাহার রাম ধনুকের রং দিয়া তৈয়ারী পথতোরণ, তাহার নীলা হীরায় বাঁধান ঘাটের উপর মাণিকের মন্দিরের অচেনা ঠাকুর, সবই অচেনা কিন্তু অজানা নয়।

পক্ষীরাজ থামিতেই আমি নামিয়া পড়িয়া বলিলাম, "এ কোথায় আন্‌লে ?"

"এই যে 'অচিন-অভিন' পুরী, চিন্‌তে পার্‌ছ না ?" চিনিতে পারিতেছি না ? এ যে আমার অন্তরের চির পরিচিত ! ইহাই ত চির দিনকার চিনিবার আর সবই অচেনার।

আমি পক্ষীরাজকে আর কিছু বলিলাম না, কারণ আমার মনে হইল যে এই অচিন দেশকে না চেনা বড় অপরাধ। আমি ইহার বিষয় প্রশ্ন করিয়াই অন্যায় করিয়াছি। চিনি বৈ কি, প্রাণ দিয়া চিনি।

পক্ষীরাজকে একটা অচেনা গাছের উজ্জ্বল শাখায় বাঁধিয়া রাখিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। কিন্তু একি ! চতুর্দ্দিকেই যে অসংখ্য পক্ষী-রাজ বাঁধা রহিয়াছে। এত অসংখ্য রাজপুত্র এখানে আসিয়াছে ?

তাইত, ঐ যে তাহারা। আমি অতর্কিতে একটা বিশাল জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, সকলেরই চেহারা আমারই মত, সকলের একই পোষাক একই আকৃতি একই বয়স সবই এক। বলিতে কি সকলেই ঠিক যেন আমি।

আমাকে দেখিয়া সেই অসংখ্য আমির দল কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "এই যে এসেছ।" কেহ বলিল, "তোমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।" কেহ বলিল, "চল চল।" অন্য একজন আমার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "আর দাঁড়ান হবে না এগোও।"

আমি অগ্রসর হইয়া সেই 'অচিন' দেশের 'অচিন' পুরীর দরজার সম্মুখে দাড়াইলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড কালো পাথরের কপাট দুইটা ভিতর হইতে বন্ধ। আমি কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, 'তুমি ছোঁও তা হ'লেই খুলে যাবে।" আমি যন্ত্র চালিতবৎ দ্বার স্পর্শ করিলাম—অমনি নিঃশব্দে সেই প্রকাণ্ড কপাট খুলিয়া গেল। অমনি সেই অসংখ্য আমির দল ছুটিয়া সেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।

তারপর যাহা দেখিলাম তাহার বর্ণনা হয় না—কারণ অচিন্ দেশের সমস্তই অজানা ভাষায় বুঝিয়াছিলাম, জানা ভাষায় তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিব না। তখন কি যে সব বুঝিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ নাই যেটুকু আছে তাহাই লিখিতেছি।

স্মরণ হয়, যেন আমি প্রবেশ করিতেই অসংখ্য বাঁশি বাজিয়া উঠিল; অসংখ্য অদৃশ্য বীণার তারে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার, এবং অসংখ্য অদৃশ্য কণ্ঠে মধুর সংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যেন সেই অচিন্-অভিন্ পুরীর ইট-পাথর গাছপালা সমস্তই সুরের তৈয়ারী।

আমি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটা মনোরম উদ্যান। উদ্যানটীর সমস্ত অংশ চাঁদের আলোর অপেক্ষাও মধুরতর আলোকে উদ্ভাসিত। বৃক্ষ-লতাদি হইতে যেমন গীতধ্বনি বাহির হইতেছিল, তেমনি ঐ আলোকও যেন সমস্ত বস্থ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইতেছিল। তাহাদের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য যেন অন্য কোন বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন নাই—তাহারা আপনাদের আলোকে আপনাদের শব্দে আপনা-দিগকে জানাইতেছে।

আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী অপূর্ব্ব স্রোতস্বতীর তীরে, আলোকে বাঁধান ঘাটের উপর সুন্দরী রমণীর মেলা! সে এক অদ্ভুত সমাবেশ! সকলেই সুন্দরী অথচ সকলেই এ উহা হইতে পৃথক্। কেহই এক রকমের নয়। তাহাদের বেশভূষা পৃথক্, তাহাদের আকৃতি পৃথক্, তাহাদের চেষ্টা পৃথক্, এমন কি তাহাদের দেহের প্রত্যেক ভঙ্গীটী পর্য্যন্ত পৃথক্। মনে হয় যেন, অসংখ্য দেশের অসংখ্য ভাবুকের মন গড়া এক একখানি প্রতিমা! যেন কত যুগ-যুগান্তরের লোক-লোকান্তরের অসংখ্য মনের সৌন্দর্য্য বোধের অসংখ্য অভিব্যক্তি। অথচ সকলেই যেন আমার চেনা মানুষ!

আমি অনতিদূর হইতে অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে একজন আমার পার্শ্বে আসিয়া মধুর স্বরে বলিল, "এসেছ?" একি এ যে আমার চেনা—কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম না।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমাদের চিন্‌তে পার্‌ছ না?" আমার সমস্ত দেহ মন অস্তিত্ব, সমস্ত অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যেন চিৎকার করিয়া বলিতে চাহিল, "চিনি

চিনি বৈকি।" কিন্তু কি জানি কেন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, "না আমি চিন্‌তে পার্‌ছি না।" তখন সেই অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তিগণের চক্ষে বিষাদের একটা ছায়াপাত হইল, তথাপি সেই অগ্রবর্ত্তিনী বলিল, "চেন না? তবে কি কর্‌তে এসেছ?"

তাইত! কি করিতে আসিয়াছি? কি চাই, কাহাকে চাই? কাহাকে পাইবার জন্য স্বপ্ন-সাগর পার হইয়া এই অচেনা দেশে আসিয়াছি? কোন্ চির প্রার্থিত রত্ন এই প্রস্তর কপাটবদ্ধ স্বপ্নপুরীর মধ্যে লুকান আছে?

আমাকে নীরব দেখিয়া সেই রমণী তাহার পদ্মহস্তে আমার হস্ত চাপিয়া ধরিল। সে কি স্পর্শ। সে যেন জন্ম জন্মান্তরের সুখ স্মৃতির স্পর্শ, সে যেন চির-প্রার্থিত চির অলভ্য ধ্যানগম্যের স্পর্শ, সে যেন—সে যেন—না সে যে—কি তাহা বলিবার জো নাই। আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। রমণী কিন্তু আমায় টানিয়া লইয়া সেই অসংখ্য নারীমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল।

আমি বিহ্বল হইয়া দেখিলাম যে সেই অসংখ্য রমণীমণ্ডলী ঠিক একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দিকে ফিরি সেই—সেই—সেই। দূরেও সেই, নিকটেও সেই। সৌন্দর্য্যের সারভূতা একই নারী দূর দূরান্ত যুগ যুগান্ত ধরিয়া একই আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সকলেই আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। হঠাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে একই মধুর কণ্ঠে সহস্র নারী প্রশ্ন করিল, "চেন না? চেন না? চেন না?"

কি বলিব? কেমন করিয়া বলিব চিনি না? এ যে মধুরে চেনা, ভীষণে চেনা, অদূরে চেনা, সুদূরে চেনা, অন্তরে চেনা, বাহিরে

চেনা, আদরে চেনা, অনাদরে চেনা ; এ যে দুঃখে সুখে, বেদনায় আনন্দে সহস্রভাবে সহস্ররূপে চেনা মানুষ।

তবু কি জানি কেন বলিয়া ফেলিলাম, "চিনি না।" অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে সূচীর মত তীক্ষ্ণ অথচ তীব্র মধুর হাস্যে সমস্ত কানন জল স্থল আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। তারপর চাহিয়া দেখি, সেই যে সমস্ত আমার মত বেশধারী রাজপুত্রগণ বাহিরে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহারাই প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যেক লতা প্রত্যেক ইট, কাঠ, পাথর হইতে বাহির হইয়া এক একটী রমণীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আমি যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি, আমারই মূর্ত্তির পার্শ্বে সেই একই রমণী মূর্ত্তি! লোকে লোকে যুগে যুগে ভাবে ভাবে এমন কি জড়ে জড়ে তৃণে তৃণে পশু পক্ষী সকলের মধ্যেই সেই আমি আর সে!

তারপর আবার প্রশ্ন হইল, "চেন কি?"

আমার সমস্ত অন্তঃস্থল অশ্রুভারে পীড়িত হইয়া উঠিল—একটা তীব্র বেদনায় আমার অস্তিত্বের এ পাশ ও পাশ তীক্ষ্ণ তরবারীর ন্যায় বিদ্ধ হইল। আমি বলিতে চাই 'চিনি—ওগো তোমায় চিনি' কিন্তু কে যেন আমায় জোর করিয়া বলাইল "চিনি না কিছুতেই চিনিব না।" আমার বুক ফাটিয়া শব্দ বাহির হইল—"পার্‌লাম না, তোমায় চিন্‌তে পার্‌লাম না।"

অমনি এক নিমেষে সমস্তই অন্তর্হিত হইল। আমি চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম—শেষে আমার দৃষ্টি আমার নিজের উপর পড়িল। এ কি আমার সেই রাজবেশ কৈ! আর কে ঐ কাঁদিতেছে? সমস্ত উদ্যান ব্যাপিয়া ও কাহার বুকফাটা কান্না!

সেই অচিন-অভিন দেশের প্রত্যেক লতা গুল্ম বৃক্ষ তৃণ ইষ্টক প্রস্তর

হইতে একটা অতি করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যেন সেই উদ্যানের প্রতি অণুপরমাণু হইতে কে কাঁদিয়া বলিতেছে,—"ফিরে এস—আর কতকাল এমন ভাবে কাঁদাবে—ফিরে এস।"

কে ফিরিবে! কাহার অপেক্ষায় এই স্বপ্নজগৎ এমন ভাবে কাঁদিতেছে! কে তুমি কাঁদিতেছ! কোথায় তুমি! কাহাকে চাও! এই অচিন জগতের অশোকবনে কে 'একাকিনী শোকাকুলা' হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। এ ক্রন্দনের স্বর আমার পরিচিত, কিন্তু কে এই অচিন পুরীর স্বপ্ন প্রাচীরের মধ্যে আপনাকে চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতেছে! কেন তোমায় চিনিতে পারিলাম না? অচিন পুরীতে আসিলাম, দুস্তর স্বপ্ন-সাগর পার হইলাম, কিন্তু তোমায় কেন চিনিলাম না! তুমি কেন অচিন অথচ আমা হইতে অভিন রহিলে।

আমি পাগলের মত ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই ক্রন্দনের স্বর মৃত্যুর মত আমার পশ্চাতে লাগিয়াই রহিল। যেখানেই যাই সেইখানেই সেই বুক ফাটা কান্না।

ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের সিংহ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। সে কে তাহা জানি না, কারণ সে কেবল মূর্ত্তিভাবে রূপভাবে আমার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, কোন বিশেষ রূপ বা বিশেষ মূর্ত্তিতে তাহাকে বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহাকে দেখিলাম কেবল রূপ, কেবল মূর্ত্তি। সে যে কি তাহা মনে নাই, কেবল তাহার অপূর্ব্ব প্রশ্ন ভরা গভীর দৃষ্টিই আমার মনে আছে।

মূর্ত্তি আমায় হাতছানি দিয়া ডাকিল। আমি যন্ত্র চালিতবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু প্রাসাদের দ্বারের

চৌকাট পার হইয়াই আমি চাহিয়া দেখি আমার পায়ে ঠেকিয়া অসংখ্য সূর্য্যকান্ত-মণি, চন্দ্রকান্ত-মণি আরও কত নাম রূপহীন মণিরত্ন আমার পায়ে ঠেকিয়া ছিটকাইয়া যাইতেছে। আমি ব্যস্ত হইয়া দুই একটা বৃহৎ মণি তুলিয়া লইয়া কম্পিত হৃদয়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইতি-পূর্ব্বে ইহাদের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ আমার পদতল পিষ্ট রত্নগুলির উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মূর্ত্তি সহসা ফিরিয়া বলিল, "একি ও তুমি কি হাতে নিয়েছ।" আমি বলিলাম, "মণি!" মূর্ত্তি বলিল—"মণি! তুমি ও সব চেন নাকি?"

আমি কি জানি কেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলাম "চিনি।" অমনি আমার চতুর্দ্দিকে একটা ধিক্কার ধ্বনি উত্থিত হইল; আর আমার মনে হইল, আমি যেন কোন স্বর্গ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছি। যে অপূর্ব্ব আলোকে আমার সেই জগৎটা উদ্ভাসিত ছিল, সেই আলোকও যেন ক্রমশঃ আমার চক্ষু হইতে অপসারিত হইতেছে। হঠাৎ আমার যেন মনে পড়িল, যে, আমি যাহা দেখিতেছি, আমি যে জগতে রহিয়াছি, আমি যেন সে জগতের কেহ নহি! কাতর ভাবে চাহিয়া দেখি আমার সম্মুখস্থ সেই মূর্ত্তিরও চতুর্দ্দিকস্থ আলোকটুকুও যেন কমিয়া আসিয়াছে, সেও যেন একটু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তথাপি সেই মূর্ত্তি অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে আমার লজ্জা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বলিল, "এই সমস্ত তুচ্ছ জিনিষ চেন?"

হায় হায় কি করিলাম? কেন চিনিলাম? মূর্ত্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন চেনো বল্‌তে পার?" আমি বলিলাম, "আমি যে অতি দরিদ্র, এর একখানায় যে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হতে পারে। আমি যে সারা জীবনের দুঃখের পীড়নে এদের চিনেছি।"

মূর্ত্তি কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "এঁ, তুমি ত রাজপুত্র নও,—তুমি তবে কে? এই সব ধূলা মাটি তুমি চেনো তাই তুমি আমায় চিন্‌লে না?"

ধীরে ধীরে সে বসিয়া পড়িল। কি ভয়ঙ্কর তাহার দুঃখ! কি বুকফাটা তাহার সেই গভীর শ্বাস, কি অগ্নির মত জ্বালাময় তাহার অশ্রু! কি হতাশের সেই উদাস দৃষ্টি।

ক্ষণ পরে মূর্ত্তি পুনরায় উঠিয়া বলিল, "চিরদিন তুমি আমায় এমনি করে কাঁদাচ্ছ, তাই চিরদিন—এইখানে এসে তুমি থেমে যাচ্ছ, আমায় পাচ্ছ না, আমাকেও পেতে দিচ্ছ না। হায় তোমায় পাওয়া আমার হল না।"

আমায়? আমাকেও কেহ চায়! আমি নতজানু হইয়া বসিয়া বলিলাম, "কি করে তোমায় পাব? বল তুমি, কি হলে আমি তোমার হব।"

গভীর বেদনায় সেই অনুপম মানুষ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কি মর্ম্মন্তুদ সেই দৃষ্টি। আমি কাতর হইয়া বলিলাম, "বল, বল, কি হলে তোমায় আমায় মিলন হবে? বল, কি কর্‌লে আমি তোমায় চিন্‌তে পার্‌ব?"

মূর্ত্তির দেহের চতুর্দ্দিকে আবার সেই দীপ্তি জাগিয়া উঠিল—তাহার দেহের মধ্যেই যেন কে একটা গুপ্ত অগ্নি জ্বালিয়া দিল। সে আবার অগ্রসর হইয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিল, "পার্‌বে? আমাকে এই স্বপ্ন জগৎ হইতে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে? এই পদাঙ্কহীন অপার স্বপ্ন-সাগর বেষ্টিত অরূপ দ্বীপ হতে আমায় উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে? আমি যে আর পার্‌ছি না, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বাজের মত ছিঁড়ে এখান থেকে তোমার লোকে নিয়ে যাও। এই

অলোক থেকে লোকে নিয়ে যাও, অরূপ থেকে রূপে নিয়ে যাও, এই অভাব থেকে একেবারে ভাবে টেনে নিয়ে যাও। এই অসীমতা আর সইছে না আমার। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—পার্‌বে না?” মূর্ত্তির স্বরে কি কাতরতা, কি অনুনয়, কি গভীর দুঃখ! আমি সবেগে বলিলাম “পার্‌ব।” মূর্ত্তি তখন অতি আনন্দে বলিল, “এস তবে।” আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একটা কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি নির্ব্বাক্ হইয়া গেলাম। দেখিলাম সে কক্ষটা আমার চিরদিনের পরিচিত। আর সেই চির পরিচিত কক্ষের চিরপরিচিত শয্যায় শুইয়া দুইটী চির পরিচিত প্রাণী। একটী নারী আর তাহারই বুকের কাছে তাহারই বুকের ধন একটা বালক।

মূর্ত্তি বলিল, “এদের চেনো।” আমি বলিলাম, “চিনি।” মূর্ত্তি বলিল, “কে এরা?” আমি বলিলাম, “ওরা যে আমারই”—কে? কে ইহারা? কে ইহারা আমার চির পরিচিত? কিছুতেই তখন তাহা মনে পড়িল না, অথচ সেই অচিন জগতেও আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কে বলিয়া উঠিল “এরা যে আমার—আমার”—আমার কিন্তু কে? আমার কে ইহারা? আমি চাহিয়া চাহিয়া সেই ঘুমন্ত আপনার জনের নিকটে বসিলাম।

তারপর চাহিয়া দেখি, মূর্ত্তি যেন আবার নিবিয়া যাইতেছে। তথাপি যেন অতি করুণ অতি মিনতিপূর্ণ স্বরে অতি দূর হইতে শব্দ আসিল, “এদেরকে ভুলে, এদেরকে বিলিয়ে দিয়ে, তোমার সমস্ত পরিচিতকে অপরিচিত করে আমায় পেতে চাও কি? যদি বল্‌তে পার যে ‘আর কেউ আমার নয়, আর কিছু আমার নয়, তুমিই আমার একমাত্র’ তবেই আমার এই চিরকালের বিরহের অবসান হবে, নইলে নয়। বল, জোর করে সত্য

করে বল যে এদের আর চাও না, তোমার অতীত আর তোমার পক্ষে কিছু নয়, এদের আর চেনো না কেবল আমাকেই চেনো, তা হলেই তোমায় পাব, তুমি আমায় পাবে।"

আমার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমার কাতর চিত্ত এইবার যেন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। তাইত কি করিয়া তাহা বলিব? আমি যে দরিদ্র, আমার যে আর কিছুই নাই। আমি যে সওদাগরের অফিসের কেরাণী। এই যে আমার মনে পড়িয়াছে, আমি কে! আমি যে রাজপুত্র নই, মন্ত্রিপুত্র নই, কোটালের পুত্র নই, এমন কি সওদাগরের পুত্রও নই, আমি যে সওদাগরের অফিসের চাকর মাত্র! আমি কি করিয়া আমার স্বপ্ন-রাজ্যের দেবতার জন্য এই দীন দরিদ্রের আঁধার ঘরের মাণিকদের বলিব, চিনি না—চাই না। আমার কি সাধ্য যে এ এদের অস্বীকার করি। ওগো আমার স্বপ্নের বিরহিণী, তোমার জন্য আমার দারিদ্র্যের একমাত্র সম্বলগুলি কি করিয়া বলি দিব? সে শক্তি আমার কৈ? না আমি পারিব না।

মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে নিবিয়া গেল। স্বপ্ন-সাগর পার হইয়া এই জাগ্রতের তীরে আসিয়া সে ফিরিয়া গেল।

তারপর আমার চতুর্দ্দিকে একটা ভয়ানক অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কি একটা ভয়ে আমি ব্যস্ত হইয়া সেই আপনার-জন দুইটীর উপর বুক দিয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম—"পারব না, পারব না—মানসীর জন্য প্রেয়সীকে ছাড়তে পারব না, আকাশ কুসুমের জন্য সত্যিকার গলার মালা ছিঁড়তে পারব না—কিছুতেই পারব না। আমি যে—"

"ওকি অমন করছ কেন?"

"তাইত ! দুর্গা দুর্গা—উঃ কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।" অমুর মাতা একখানা পাখা লইয়া আমায় বাতাস করিতে লাগিল। যদিও তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছিল তথাপি নিদ্রিত দেখিয়া অমুর মাতা আমাকে জাগায় নাই।

আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুখে চোখে জল দিয়া দেখি, আমার অমু তাহার First Book খুলিয়া পড়িতেছে "The hen can fly but the fox cannot."

ঠিক কথা। হায়রে fox তোর কি সাধ্য যে তুই উড়িবি! তোর সমস্তই যে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা। ওরে fox তোর উড়িয়া কাজ নাই। হাতের গোড়ায় যাহা তাহাই তোর পরম লাভ—তাহা লইয়াই তুই সন্তুষ্ট থাক। আমি সারাদিন ধরিয়া জপ করিতে লাগিলাম—"খেঁকশিয়াল পারে না—পারে না—পারে না।"

শ্রীবিভূতিভূষণ ভদ্র।

ব্রত-ভঙ্গ

১

অতুলচন্দ্র কবিতা, কল্পনা, নাটক নভেল, এমন কি, প্রণয়, ভালবাসা, প্রেম শব্দগুলার উপরেও বিষম চটিয়া গেল। অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইলেই সেটা কার্য্যে প্রকাশ করা শরীর ও মনের একটা বিশেষ গুণ; নহিলে শক্তির স্ফূর্ত্তির প্রমাণাভাব ঘটে। অন্তরে চৈতন্য জাগ্রত হইলে দেহে তাহার তেজ বিকাশ পাইয়া থাকে।

কাজেই অতুলচন্দ্র তাহার দেওয়ান, গোমস্তা, অভিভাবক, আত্মীয় ইত্যাদি বলিতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্যেঠাইমার স্কন্ধে তাহার যাবতীয় অস্থাবর, কি না কবিতার খাতা, ফাউণ্টেন্ পেন্, রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী, মহিমফ্লুট হার্‌মোনিয়ম, "হাওয়াগাড়ি" সিগারেটের বাক্‌স, কেস্, জাপানী দেশলাই প্রভৃতি, এবং স্থাবর সম্পত্তির নূতন বোঝাটি ফেলিয়া দিয়া, এলাহাবাদে বন্ধু রমেশের নিকট পলাইয়া গেল। বৈষয়িক হিসাবে যাহাকে স্থাবর অস্থাবর বিষয় বলা যায়, বহুদিন হইতেই সেগুলি জ্যেঠাই-মার অধিকারভুক্ত।

জ্যেঠাইমা অতুলের পলায়নে তত বেশী উদ্বিগ্ন হইলেন না; কেন না, অতুলের এরূপ কার্য্য এই প্রথম নয়। তাহার দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাবিলেন, "যুগ্যি ছেলে। আর বেশী রাশটানা উচিত নয়। দু'দিন মনটা একটু ভাল ক'রে ঝোঁক্‌টা সাম্‌লে আসুক।"

অতুলের বন্ধু ও শিষ্য শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র কল্পনা ও কবিতায় এখন তাহাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গুরুর বাক্যে ও কার্য্যে বৈরাগ্যের ঘোর প্রভাব দেখিয়াও সে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল না। বহু গুরু-মারা টীকা করিয়াও যখন সে সুকৃতিশালী, চতুর্ব্বিধ ভজনাকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, বিবিক্ত-হৃদয় অতুলকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না, (হায় মূঢ় রমেশ! ভগবানের অতি প্রিয় যে পথ, সেই পথের পথিক অতুলের মাথা নিশ্চতই খারাপ হইয়াছে, এই তাহার ধারণা।) তখন সে তাহার ত্রিতলস্থ একটি কক্ষের সমস্ত আস্‌বাব বাহির করিয়া দিয়া এক সুদীর্ঘ কম্বল পাতিয়া, খানকয়েক মৃগচর্ম্ম ও এক বিকট শার্দ্দূল ছাল সংগ্রহ করিয়া গুরুকে ব্যবহার করিতে দিল। ছয় আনা দামের একখানি ক্ষুদ্র গীতা-হস্তে নবীন সন্ন্যাসী অতুলচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং পরম-নিবিষ্টচিত্তে জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রকৃতি, পুরুষ, মায়া, সত্ব রজঃ তমঃ, কাম্য, নিষ্কাম, বন্ধ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেল। শ্রীধর স্বামী, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ধর্ ধর্ করিয়াও তখন তাহার নাগাল পাইলেন না।

জীবের মুক্তির পথ নিকটস্থ হইলে অহেতুক বৈরাগ্য এই রূপেই উপস্থিত হয়। ইহা জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফল।

২

পুরা এক মাস এই বৈরাগ্যের স্রোতে তর্‌তর্ বেগে ভাসিয়া গিয়া সহসা এক বিষম চোরাবালিতে ঠেকিয়া অতুলচন্দ্রের গীতা-রূপ তরণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যে তরণীর আশ্রয়ে তাহার জীবাত্মা সংসার-সাগরের আধিপূর্ব্বব্যাধিরূপ ঝঞ্ঝা-বাত্যাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া "উদাসীনো গতব্যথঃ"

হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল, সেই তরণীর এহেন বিপত্তিতে অতুলচন্দ্র নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। এই চোরাবালিও একটি আত্মাভিমানী বস্তু! ইনি রমেশের তরুণী বিধবা সহোদরা ইন্দুমতী।

সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কিছুদিন হইতেই অতুলের অমিশ্র সত্ত্বগুণাশ্রিত জীবাত্মায় কিঞ্চিৎ তমোগুণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভগবানই বলিয়াছেন "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।" তমোগুণ যথা "আলস্য নিদ্রাভিঃ।" তবে পরজন্মের জন্যই তিনি পূরা এই একমাস নৌকাখানা অতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত চলাইয়াছিলেন; কেন না, এ সব কিছুই নষ্ট হইবার নয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্!"

সন্তরণবিদ্যা যেমন বহুদিনের অনভ্যাসেও লোপ পায় না, যে কেহ সে বিদ্যা যতটুকু আয়ত্ত করিয়া রাখে, জলে পড়িবামাত্র তাহার হস্ত পদে তখন সেটুকুর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও অতুল যে জন্মজন্মান্তরেও তাহার এই এক মাসের সঞ্চিত সম্পত্তির দায়াধিকার প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল।

ইন্দুমতী বালবিধবা, কিন্তু শিক্ষিতা, এবং বোধ হয় সমধিক শিক্ষার জন্য উৎসুক। কেন না, অতুল তাহাকে প্রায়ই বারান্দায় রয়েলরিডার, মেঘনাদবধ কাব্য, ঋজুপাঠ প্রভৃতি হস্তে আসীনা দেখিতে পাইত। রমেশের মাতা নাই, পিতা অল্পদিন গত হইয়াছেন। তিনি কিশোরী কন্যাকে অন্দরে বাহিরে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। সেই অভ্যাস-বশতঃ ইন্দুমতী এখনও মাথায় কাপড় দিতে বা কাহাকেও দেখিয়া সঙ্কুচিতা

হইতে শিখে নাই। সংসারে অভিভাবিকার মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতুলানী। পিতা বালিকা কন্যাকে বিধবা-বেশ পরান নাই, সেই জন্য এখনও ইন্দুমতীর বেশ কুমারীর ন্যায়। পিতা মনে মনে একটু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতীও ছিলেন। অনেক সময় রমেশের অনুপস্থিতিতে তাহার কক্ষে কোনও শিক্ষানবীশের সসঙ্কোচ অঙ্গুলিস্পর্শে দুই চারিটা সোজা গৎ এবং চলিত গানের সুর ধীরে ধীরে বাজিতে থাকে, তাহাও অতুলের কর্ণ এড়ায় নাই।

তমঃকে অভিভূত করিয়া কচিৎ রজঃ ও সত্ত্ব উত্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এবারে যে কি আসিল, তাহা স্থির করিতে অতুলচন্দ্রের অনেকক্ষণ লাগিল। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ইহা রজোমিশ্রিত সত্ত্ব। কেন না, কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিতেছে, অথচ সে কর্ম্মটী নিষ্কাম। এই যে বালিকাটি, ইহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, এ শিক্ষা-প্রয়াসিনী। ভগবান বলিয়াছেন,—"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"। তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছেন। বিশেষতঃ, "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।" অতএব এই শিক্ষাভিলাষিণী বালিকাটির সমধিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিষ্কাম হইয়া করিতেই হইবে।

রমেশের প্রকৃতি তমঃপ্রধান। ঈশ্বরোঽহম্ অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—এ ভাবটি রমেশে অত্যন্ত অস্ফুট। কেবল সে নিজের সুখেই মত্ত, ভগিনীর কোনও সংবাদই রাখে না। অতুল একদিন রমেশকে এ জন্য যথোচিত তিরস্কার করিল। অকালকুষ্মাণ্ডটী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার গীতা জ্ঞান শেষে যে রিফর্মেশনে দাঁড়াল; এতে আশা হচ্ছে।" অতুল বন্ধুর অজ্ঞানসম্ভূত প্রজ্ঞা নষ্ট করিবার জন্য কর্ম্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিল, তথাপি

রমেশের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। ভগবান এই জন্যই অজ্ঞানের—মূঢ়ের নিকট পরাবুদ্ধির রহস্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রান্ত অতুল হাঁফ ছাড়িয়া দিয়া খানিকটা বরফজল চাহিয়া পান করিল।

কিন্তু পরদিন ইন্দুমতীর শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু পুস্তক আসিল। একটি কক্ষ তাহার পাঠাগার-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীমতী ইন্দুমতী প্রফুল্লমুখে শিক্ষকের নিকট নিয়মিতভাবে পাঠ লইতে লাগিল। অতুলচন্দ্র সে বিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করিল। দ্বাদশ বৎসরে বিধবা হইয়া গত দুই বৎসর ইন্দুমতী পিতার নিকট কেবল পড়াশুনাতেই কাটাইয়াছে। জগতে সে আর কিছুই জানে না, তাহার জন্য কামনাও কিছু ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এই এক বৎসর সে জীবনের কোনও আশ্রয় পাইতেছিল না। খেয়ালী ভ্রাতাটীরও নিকটস্থ হইতে পাইত না। এখন এই শিক্ষাব্যপদেশে ভ্রাতাও এক এক দিন, "দেখি রে ইন্দু, কি শিখ্‌লি ?"—বলিয়া তাহাকে ডাকে, এবং অতুলকে বাহবা দেয়। ইন্দু জানিল, অতুলই ইহার মূল। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে, তাহা সে বোধ হয় জন্মেও শোনে নাই। তাই একদিন আমাদের নিষ্কাম কর্ম্মবীর অতুলচন্দ্রকে সে কথাপ্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অতুলের তাহা লাগিল ভাল। সতত আত্মসন্ধিৎসু অতুলচন্দ্র ভাবিল, তবে কি এ অমিশ্র রজোগুণ ?

৩

যত দিন যাইতে লাগিল, তত্ত্বজ্ঞানী অতুলচন্দ্রের তত্ত্বান্বেষী মনে ততই নানাভাবের বিকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ বোধ হইল, সে গুণাতীত

পুরুষ। কেন না, কোনও গুণের বিচারই এখন তাহার সহজে মনে আসে না। কয়েক মাস পরে মনে হইল, তাহার জীবন্মুক্ত আত্মার কোনও বন্ধন নাই। সে কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত, মুমুক্ষু, আত্মবশী। সে পরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এটা কি, সেটা কি, তাহার আর বিচারের প্রয়োজন নাই। বৎসর যখন পূর্ণ হইয়া গেল, তখন আর এ সব চিন্তা তাহার মনেও উদিত হইত না। বোধ হয়, ইহাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব। কিন্তু হায়! সে সত্তা যে ভোগ করিবে, সে এ বিষয়ে তখন একেবারেই উদাসীন। সে-ই এখন ইন্দুমতীর শিক্ষক।

বাটী হইতে জ্যেঠাইমা পত্রের উপর পত্র লিখিয়াও কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি বহু সাধ্য সাধনা, অনুনয় বিনয়, শেষে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবার পর অতুলের নিকট হইতে একখানি পত্রের উত্তর পাইয়াছিলেন। অতুল লিখিয়াছিল—"আমার জীবনের যত দূর ক্ষতি করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন ; এখন যদি আমাকে বিবাগীর বেশে সংসার ত্যাগ করাইতে ইচ্ছা না করেন তো এরূপে আমায় ত্যক্ত করিবেন না। আমি আর দেশে যাইব না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এরূপ টানাটানি করিলে শেষে সন্ন্যাস-পন্থা গ্রহণ করিব।" কাজেই জ্যেঠাইমা আর তাহাকে বিরক্ত করেন নাই।

সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি, তাহা মিলাইবার জন্য অতুল গীতাখানার সন্ধান করিয়া সংবাদ পাইল, মলিন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে এ কোণে ও কোণে পড়িয়া থাকিয়া ঘরময় কেবল ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা ছড়াইতেছিল। ঝড়ুয়া খান্‌সামা সেখানাকে শেষে বাবুদের চায়ের উনানের ইন্ধন-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া তাহার গীতা-জন্ম সার্থক করিয়া দিয়াছে। অতুল গুম্ হইয়া খানিক ভাবিল, শেষে তাহার মনে পড়িল, "ব্রহ্মাগ্নৌ" ; তাহাতে

গীতার পাতাগুলি "ব্রহ্মহবিঃ," এবং হোতাও ব্রহ্ম, অতএব ঝড়ুয়া এই ব্রহ্মকর্ম্মসাধন হেতু পরিণামে ব্রহ্মত্বই পাইবে।

অতুলচন্দ্র তো গীতা ছাড়িয়াছে, কিন্তু গীতা তাহাকে ছাড়ে কই! দগ্ধীভূত হইবার পরও তাহার অচ্ছেদ্য অদাহ্য অশরীরী আত্মা অতুলচন্দ্রের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অতুলচন্দ্র দেখিল, গীতার সেই অনাসক্তির ভাব সর্ব্বত্রই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এ দিকে রমেশের কাব্য ও কবিতায় অনাসক্তি ও গান বাজনায় বিরক্তি জন্মিয়াছিল; "দূর হোক্ গে ছাই—আর ভাল লাগে না" ভাষায় প্রকাশ না করিলেও, এই ভাবগুলি সর্ব্বদাই যেন রমেশের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অতুল ইন্দুমতীর পাঠে অমনোযোগ দেখিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত, বুঝি একটু ব্যথিতও হইল। সেদিন প্রভাতে চা-পানের পর রমেশ একখানা খবরের কাগজ লইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। অতুল ইন্দুমতীর পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্মুখে রাখিয়া "মানসী" কাব্যখানা হস্তে লইয়া ইন্দুমতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার কাব্যখানায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মন বসিল না। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুমতী আসিল। অতুল চাহিয়া দেখিল, তাহার হস্তে গুটিকতক সিক্ত পুষ্প, ললাটে চন্দনচিহ্ন, চুলগুলা একটু বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পরিধানে একখানা সরুপাড় গরদ। ইন্দুমতী ফুল কটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "দাদা কই? মামীমা আশীর্ব্বাদী দিয়েছেন।"

অতুল বলিল, "তোমার স্নান হ'য়ে গেছে দেখ্ছি যে? আজ পড়্‌লে না?"

"না, মামীমার আজ অনেক কাজ ছিল, সে জন্য তাঁর কাছে ছিলাম। দাদা! মামীমা তোমায় আশীর্ব্বাদী দিয়েছেন।"

রমেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া কাগজখানা এক দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উদাসীনভাবে একটা ফুল তুলিয়া লইল। ইন্দুমতী অতুলকে বলিল "আপনিও নেন।"

ফুলটি লইতে গিয়াই, জ্যেঠাইমার কথা অতুলের মনে পড়িল। অতুল বলিল, "তুমিও পূজো কর্‌তে শিখেছ নাকি?" ইন্দুমতী একটু সলজ্জ-ভাবে হাসিল। "আজ আর পড়্‌বে না?"

"না, ওবেলায় পড়া নেবেন।"

অতুল গম্ভীরমুখে বলিল, "তুমি আজ কাল একটু অমনোযোগী হ'য়েছ।" ইন্দুমতী হাসিল। অতুল শিক্ষকের গুরুত্বসূচক স্বরে বলিল, "এ রকমে তো চল্‌বে না।"

ইন্দুমতী মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "ভাল লাগে না।"

রমেশ বলিল, "ঠিক্। ত্যক্ত ধরে যাচ্ছে। না, একটু চেঞ্জ্ না আন্‌লে আর চলে না।"

অতুল সে কথা কানে না করিয়া বলিল, "অভ্যাসটাই একেবারে না ছেড়ে, সে সময়ে পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু পড়্‌তে হয়। কাব্য বা গল্প সাহিত্য যা ভাল লাগে।"

"তাই ত পড়ি।"

"কই তোমার কাব্যটাব্য, বইটই সবইত এই ঘরে ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি।"

"আমি একখানা নূতন বই আনিয়েছি, দ্যাখেন নি বুঝি?"

"কি বই?"

"নৈবেদ্য।"

রমেশ বলিল, "চল অতুল, দু দিন একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

"কোথায়?"

"বাঙ্গ্লায় ; যেখানে ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ, ছায়া অসরল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ।"

অতুলের অন্তরে কে যেন সজোরে বারকয়েক আঘাত করিল। সে বলিল "না।"

"ও, তুমি যে বঙ্গ হইতে পলাতক! তবে কলিঙ্গে চল। ওয়াল্‌-টেয়ারে যাবে?"

"তা গেলে হয়। কিন্তু বেশী দেরী করা হবে না।"

"কেন? তোমার ও আমার গৃহ তো শাস্ত্রোক্ত গৃহ নয়। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ'—"

অতুল আবার একটু ধাক্কা খাইল। বলিল, "ইন্দুমতীর পড়ার ক্ষতি হবে।"

ইন্দুমতী বাধা দিয়া বলিল, "কিছু ক্ষতি হবে না। দাদার মন ভাল হবে, ওয়াল্‌টেয়ার খুব ভাল জায়গা শুনি, শরীরটাও সার্‌বে, আপনারা যান্। আমি নিজে নিজেই পড়্‌ব।"

রমেশ বলিল, "অর্থাৎ এই ফাঁকে তুইও একটু হাওয়া খেয়ে নিবি?" ইন্দুমতী হাসিল।

সত্যই রমেশ তল্পী তাল্পী বাঁধিয়া ফেলিল। অগত্যা অতুলও প্রস্তুত হইল। যদিও সঙ্গে চাম্‌ড়া-বাঁধা বিছানা, খাবারের বাক্‌স, দড়াদড়ি-বাঁধা ট্রাঙ্ক, টিকিটমারা দুখানা বাইক, ঝড়ুয়া খানসামা, তথাপি অতুলের মনে তাহার বৎসরাধিক পূর্ব্বের প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ হইল! আর মনে পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নির্জ্জনে বসিয়া নিজমনে মৃদু সুরে কি বৈরাগ্যমাখা মুখে ইন্দুমতী গায়িতেছিল, "ঘাটে বসে আছি

আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়। এ বাতাসে তরী ভাসাব না, তোমা পানে যদি নাহি বয়।'

৪

চিল্কা হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগর এবং তথা হইতে বৈতরণী নদী, শতদ্রু, বিপাশা, মহানদী কাটজুড়ী, ভদ্রক প্রভৃতি নদ নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া তিন মাস পরে অতুল ও রমেশের তরী গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দুমতী হাসিমুখে আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু এত বিলম্ব করার জন্য অনুযোগ করিতে ছাড়িল না। অতুল বলিল, "রমেশ কি তবু ফির্‌তে চায়?"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "না রে ইন্দু! তোর পড়ার ক্ষতি হচ্চে বলেই এতই শীগ্‌গির ফির্‌লাম। অতুল তো ভেবেই অস্থির যে, যা শিখেছিলি, সব বুঝি এ তিন মাসে গুলে খেয়ে ফেল্‌লি।"

ইন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক্‌ই ভেবেছেন।"

বিকালে রমেশ তাগাদা লাগাইল, "চল, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে' আসা যাক্‌!"

"চল" বলিয়া অতুল টেবিলের উপরিস্থ কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার নূতন পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "এ বই কার?"

রমেশ নত হইয়া বলিল, "শান্তিনিকেতন। ইন্দুর হাতে! ইন্দুও তোমার মত যোগ-অভ্যাসে মন দিলে নাকি? ইন্দু!- ইন্দু!" ইন্দু আসিল। "এ বই কার?"

"আমার।"

"পড়িস্ নাকি ?"

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

"বই গুলো কেমন ? ভাল লাগে ?"

"হাঁ।"

রমেশ দু এক পাতা উল্টাইয়া উদাসীনভাবে রাখিয়া দিয়া বলিল, "ভাল বটে, পড়িস্। চল হে অতুল।"

অতুল প্রশ্ন করিল, "সব বুঝ্‌তে পার ?"

ইন্দু নতমস্তকে বলিল, "না।"

"তবে ?"

"বুঝ্‌তে চেষ্টা করি। যেটুকু বুঝি, তাতেই আনন্দ পাই।"

অতুল আর প্রশ্ন করিল না।

অতুল দেখিল, ইন্দুমতী যেন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। আর সে বালিকার মত চাল চলন বেশ ভূষা আচার ব্যবহার কিছুই নাই। চুল আর বাঁধেই না, রুক্ষ বিশৃঙ্খল ভাবে জড়ান থাকে মাত্র। বসন ভূষণও তদ্রূপ। হার্ম্মোনিয়ামে ছাতা ধরিয়া গিয়াছে। পড়ার বই অপেক্ষা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে, পূজা ইত্যাদিতে তাহার বেশী সময় যায়। অতুল বিস্মিত হইতেছিল বটে, কিন্তু বিরক্ত হয় নাই। এই পূজারিণী তরুণী সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার নয়ন যেন পরিতৃপ্ত হইল। বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বস্তুটি কি সর্ব্বত্রই এত মধুর ! অতুল ভাবিতে লাগিল।

বন্ধুর দল সেদিন নৌকাযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে বায়ুসেবনে বাহির হইল। দাঁড় টানিতে টানিতে তরুণ হৃদয়গুলি নানা কাব্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। জলে স্থলে তখন অপূর্ব্ব শোভা। প্রকৃতির অনবদ্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যদর্শনে একজন চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখ দেখ কি সুন্দর !"

"ঐ হোথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।" আর একজন বলিল, "হেথায় কি আছে আলয় তোমার, ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার, মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে?"

তিন চারিজন একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাহার, কাহার?"

রমেশ বলিল, "নৌকা ফেরাও; আর না।" অতুল নীরবে হালখানা ধরিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। হালটা সজোরে ঘুরাইতে যাইবামাত্র জীর্ণ দড়ী সহসা ছিঁড়িয়া গেল। ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া অতুল একেবারে জলে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিজন বন্ধু ও রমেশ ঝাঁপ দিয়া অতুলকে বহু চেষ্টায় নৌকায় তুলিল। পতনের সময় মস্তকে গুরু আঘাত লাগিয়া অতুল নিশ্চেষ্ট বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

৫

অতুলকে পাঁচ সাত দিন শয্যাগত থাকিতে হইল। প্রবল জ্বরে ও মস্তকের বেদনায় ৩।৪ দিন সে অজ্ঞান ভাবেই ছিল; পরে সুস্থ হইতে লাগিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা নাই।"

ইন্দুমতী ও রমেশের অক্লান্ত সেবায় অতুল অষ্টম দিবসে উঠিয়া বারান্দায় চেয়ারে গিয়া বসিল। আট দিন পরে আজ রমেশও একটু বেড়াইতে বাহির হইল। ইন্দুও কর্ম্মান্তরে গেল। অতুল চেয়ারের গায়ে দুর্ব্বল মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। ললাটে তখনও যেন কাহার কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে, মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখেও কাহার উদ্বিগ্ন কোমল দৃষ্টি, নাসাপথে কাহার অঙ্গসৌরভ। তখনও অতুল অনুসন্ধানে বিরত নয়। কিন্তু সে দেখিল, শরীরের এই

দুর্ব্বল অবস্থায় তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; এ সুখচিন্তাকে এখন তাহার মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইবার সাধ্য নাই। একটু সবল হইতে হইবে; তবে।

ঝড়ুয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। জ্যেঠাইমার হস্তাক্ষর। অনেক দিন পরে। ঈষৎবিচলিতভাবে সে পত্রখানা ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিল। জ্যেঠাইমা লিখিয়াছিলেন :—

"কল্যাণবরেষু!

"অতুল! কর্ত্তব্যবোধে তোমায় আজ একবার আসিতে বলিতেছি। তোমার বিষয় আশয় সবই আমার হাতে। আমি আগামী ৭ই তারিখে কাশী যাত্রা করিতেছি। তোমার সম্পত্তি একবার আসিয়া বুঝিয়া লইয়া, তার পর তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। বাড়ী আসিতে তোমার যে বাধা, তাহাও আর নাই। যে বোঝা তোমার মাথায় আমি দিয়াছিলাম, আমিই তাহা নামাইয়া দিয়া তোমার সংসার হইতে বিদায় লইতেছি। আজ দেড় বৎসর তাহাকে আনিয়া শুধু চোখের জলেই ভাসাইয়া রাখিয়াছিলাম, কাল তাহাকে আমি নদীর ধারে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও বন্ধনই নাই, শুধু এই বিষয়ের বাধাই আমায় এ দু'দিন বিলম্ব করাইল। যদি ৭ই তারিখের মধ্যে নাও আস, তথাপি আমার কাশী যাওয়া নিশ্চিত। ধর্ম্মে খালাস হইবার জন্য তোমায় একবার জানাইলাম ইতি—

শ্রীভবতারিণী দেব্যা।"

"আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় ব'য়ে গেছে যে। ওষুধ খান্!" অতুল চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ইন্দুমতী! ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাড়ী যেতে হবে।"

"বাড়ী—কোন্ বাড়ী? আপনার দেশে?" "হাঁ!" ইন্দুমতী কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল; কেন না, কথাটা অশ্রুতপূর্ব্ব। তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া অতুলও লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিয়া রহিল।

"এ রকম অবস্থায় বাড়ী যাবেন কেন? খুব দরকার নাকি?"

"হাঁ!"

"তা হলেও প্রাণের চেয়ে বড় কিছুই নয়। অন্ততঃ আর দিন পাচ ছয় না গেলে হ'তেই পারে না।"

"দিন পাঁচ ছয় দূরের কথা, আজই—এই রাত্রের ট্রেণেই আমাকে যেতে হবে। পরশু ৭ই।"

"কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে কি?"

"হাঁ!"

ইন্দুমতী চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই ত দাদাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন, আপনার এই অবস্থা, কি করে' এত রাস্তা একা ট্রেণে যাবেন?"

"যেতেই হবে।" বলিয়া অতুল প্রায় টলিতে টলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

ইন্দুমতী বলিল, "কি খুঁজ্‌ছেন!"

"আমার ট্রাঙ্ক—কাপড় চোপড়গুলো।"

কি আশ্চর্য্য! যদি নিতান্ত যেতেই হয়, দাদাও হয় ত আপনার সঙ্গে যাবেন। তিনি আসুন! এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন?"

"সময় নেই বেশী; ৮টা বাজে; আমার বইগুলো—"

"এই সঙ্গে সবই নিয়ে যাবেন? আর আস্‌বেন না নাকি কখনও যে, সব খোঁজ কর্‌ছেন?"

"না না, আর আস্‌ব না।"

ইন্দুমতী সম্মুখে আসিয়া ভর্ৎসনাসূচকস্বরে বলিল, "ফেলুন ও সব। চেয়ারখানায় বসুন একটু, বসুন—"

অতুল চেয়ারের দিকে না গিয়া টলিতে টলিতে গিয়া শয্যায় পড়িল। পশ্চাৎ হইতে ইন্দুমতী তাহার বাহু না ধরিলে হয় ত সে পড়িয়াই যাইত।

একটু পরে অতুল বলিল,—"একখানা গাড়ী আন্‌তে বলো।"

"পাগল হলেন কি? এইটুকু চল্‌তে পার্‌ছেন না, ট্রেণে যাবেন?" নিজ মনে ইন্দুমতী বলিল, "আঃ, দাদা কর্‌ছেন কি? এখনও এলেন না!" অতুল চাহিয়া দেখিল, কি আশঙ্কাব্যাকুলমুখে ইন্দুমতী তাহার পানে চাহিয়া বাতাস করিতেছে। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া পাখা রাখিয়া টেবিলের উপর হইতে বলকারক ঔষধ ঢালিয়া আনিল, "এটুকু খান দেখি।"—অতুল নীরবে তাহার আদেশ পালন করিল।

সেই করুণ মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে অতুলের দিক্‌ভ্রম হইল; সে স্থান কাল পাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইল; তাহার মনে হইল, সে ও ইন্দুমতী—উভয়ে "অনাদি কালের হৃদয়-উৎস" হইতে যেন একজোড়া ফুলের মত প্রণয়ের কূলপ্লাবী স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। এ সংসারে আর কেহ, আর কিছু নাই। মুক্ত—আজ অতুল মুক্ত। আজ সে অনায়াসে ইন্দুমতীকে জানাইতে পারে, তাহার হৃদয়ে বহু দিন হইতে বিশ্বহিতবাসনার যে অরবিন্দ ফুটিয়াছে, তাহার কোরকে "পাদপদ্ম রয়েছে তোমার অতি লঘুভার।" অতুল কি বলিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে নবীনার আননে সেই কারুণ্যজ্যোৎস্নালোকে নিবিড় নীল নীরদে ঢাকিয়া গেল। অতুল দেখিল, কি করালকান্তি মেঘ, চকিতে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রবাণী—"ছি ছি,

অতুল দাদা! দাদার মত আপনাকে জানি, আপনার মুখে এ কি কথা! মাথা খারাপ হয়েছে আপনার।”

সেই বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে অতুলের নষ্ট সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে আজ এ কি করিল! এতকাল সাধনার পর শেষে তাহার এই পরিণাম? অতুল তাড়িতস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনও তাহার মস্তিষ্ক ধূম্রজালে পরিপূর্ণ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা দিয়া অগ্নির জ্বলন্ত শিখা তখনও বহির্গত হইতেছে। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সবেগে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া নৈশ অন্ধকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে করিতে সগর্জ্জনে ট্রেণ ছুটিয়াছে। অতুল একটা খোলা জানালায় ক্লান্ত বাহু ও মস্তক রাখিল। চলন্ত ট্রেণের গতি ও বায়ুর মত্ত হুঙ্কারের শব্দের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া তাহার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হইতেছিল—“সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।” অতুলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

৬

অতুল ডাকিল, “মা!” তখনও তাহার স্মৃতি স্বস্থানে ফেরে নাই, নহিলে সে হয় ত “জ্যেঠাইমা” বলিয়া সে নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করিত।

কোনও উত্তর আসিল না, কেবল ক্ষুদ্র একখানি হাত তাহার ললাটের উপর অতি মৃদুভাবে চলিতে লাগিল। অতুল অনুভব করিল, হাতখানি অতি কোমল। এ হাত তো জ্যেঠাইমার নয়। অতুল বলিল, “আমি কোথায়?” তথাপি কেহই উত্তর দিল না। অতুল বিস্মিতভাবে

চাহিয়া দেখিল। এই খাট, এই মশারী, ঐ জানালা, তাহার পার্শ্বে ঐ টেবিল চেয়ার, ঐ বইয়ের সেল্‌প, সবই যে তাহার সুপরিচিত। ঐ যে জানালা দিয়া চিরপরিচিত নিম গাছের মাথা দেখা যাইতেছে। এ যে তাহার ঘর। অতুল ডাকিল, "জ্যেঠাইমা!"

এবার উত্তর আসিল, অতি নিকট হইতে ততোধিক মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জ্যাঠাইমা খাবার ক'রে আনতে গেছেন।" অতুল ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল; কেন না, কণ্ঠটি অপরিচিত। ফিরিয়া দেখিল, মুখখানিও তাই। অতুল চাহিতেই মুখখানি কুণ্ঠার সহিত নত হইয়া পড়িল। চাহিয়া চাহিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অতুলের বিস্মিত দৃষ্টিপাতের প্রতিপলকে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিল, এবারে মাথার কাপড়টা সে দীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। অতুলের বিস্ময় ক্রমে সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। "তোমার নাম কি? জ্যেঠাইমার কে হও তুমি?" বালিকা রক্তিমমুখে একবার তাহার পানে চাহিয়া সহসা কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল; তাহার মলের রুনুঝুনু শব্দটুকু অতুলের কাণে বড় মধুর লাগিল; কিন্তু ততোধিক মধুর সেই সলাজ দৃষ্টিটুকু।

জ্যেঠাইমার গম্ভীর মুখের কঠিন দৃষ্টি দেখিয়া অতুল কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। পথ্যপানান্তে একবারমাত্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কবে বাড়ী এলাম?" ভাষাটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই বাল্যকাল হইতে শ্রুত অলঙ্ঘ্য আদেশ কাণে আসিল, "আর খানিকটা ঘুমোও, তার পরে সে কথা।" ক্লান্ত মস্তিষ্ক এ আদেশ পালন করিতে বড় বেশী বিলম্ব করিল না।

নিদ্রাভঙ্গে আবার যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্ত আভা মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া ঘর-

খানাকে যেন সোণালি আলোকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। নিকটে বসিয়া যে মাথায় বাতাস দিতেছিল, অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র আলোকে তাহাকে সন্ধ্যারাণীর মত দেখাইতেছিল। তাহার মৃদু নিঃশ্বাসে যেন স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকোরকের সুবাস, নয়নে সন্ধ্যা-তারকার স্নেহকোমল দীপ্তি! মুগ্ধ অতুল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" বালিকা এবার পলাইল না। পাখা রাখিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া সানুনয়স্বরে অতুল বলিল, "আমার কিছু মনে পড়্‌ছে না; অসুখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" নত মুখ তুলিয়া বালিকা অতুলের পানে চাহিল—বেদনাব্যাকুল দৃষ্টি সহসা যেন তরল আকারে গলিয়া পড়িল। বিস্মিত অতুল সহসা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি? তুমি কি—তুমি কি—কমলা?"

বালিকা বাম হস্তে চক্ষু আবৃত করিল, ডান হাতখানি অতুলের মুষ্টির ভিতরে। অতুল অনুভব করিল, সেখানি বড় কাঁপিতেছে; চাহিয়া দেখিল, আবৃত হস্ত বহিয়া সেই তরল বেদনাধারা কম্পিত ক্ষীণ ওষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িতেছে। আবার অতুল নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। কয়বার ব্যাকুলকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "কমলা—কমলা—কমলা!"

৭

জ্যেঠাইমার মানবচরিত্র-জ্ঞান ও অপূর্ব্ব কৌশলময়ী প্রতিভার সহিত তাহার শিশুকাল হইতেই পরিচয় আছে, তাই অতুল সে বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। সে কিরূপে বাড়ী আসিয়াছিল, এ সম্বন্ধেও

জ্যোঠাইমার কাছে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু স্বল্পভাষিণী জ্যোঠাইমার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অপরাধী অতুল প্রশ্নটা নিজেই পরিপাক করিয়া ফেলিল। তত্ত্বান্বেষী হৃদয় এবার অল্পেই তৃপ্ত হইল। কমলার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে এইটুকু জানিয়াছিল, একটি ভদ্রলোক তাহাকে পঁহুছিয়া দিয়া পরদিবসেই চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতেই সে ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়াছিল। অতুল সবল হইয়াই গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাধ্যায়খানা চাহিয়া আনিয়া শ্রীমদ্ভগবৎগীতার পাতাগুলা খুলিয়া বসিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস,—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" গীতা সে শীঘ্র ছাড়িবে না।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অর্জ্জুনের "বায়োরিব সুদুষ্করং" তুলনাটিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে সে অতীব কৃপাপাত্র বলিয়াই বিবেচনা করিত। তাঁহার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত মূঢ়ের মত। কেন না, বায়ুরোধের অপেক্ষা মনোনিগ্রহ যে কত সহজ, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতেন না। অতুল জলে ডুব দিয়া দু চার মুহূর্ত্ত না থাকিতে পারিলেও, মনের দুর্নিগ্রহত্ব সম্বন্ধে কই তাহাকে এত ভাবিতে হয় নাই! তাহার বিশ্বাস ছিল, অর্জ্জুনের সমসাময়িক হইলে ভগবানকে কখনই অত বাক্যব্যয় করিতে হইত না! কিন্তু আজ সে ধীরে ধীরে অর্জ্জুন-বাণীর অন্তরালে লুকাইয়া তাঁহার "কাং গতিং গচ্ছতি" প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতে লাগিল।

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে"। অতুল ধীরে ধীরে বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিল। এ তাহার পুনর্জ্জন্ম! শ্রী—সে তো মূর্ত্তিমতী, এবং কি বিশুদ্ধ শুচিতা মনে প্রাণে সে সম্প্রতি অনুভব করিতেছে! গুম্ হইয়া বসিয়া

ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, কমলা সহাস্যমুখে একখানা পত্র লইয়া আসিতেছে। অতুলের প্রজ্ঞা শুষ্ক-তত্ত্বানুসন্ধানে বিরত হইল। এ দেহে পূর্ব্ব-দেহের বুদ্ধিসংযোগে তাহার মনঃপূত হইল না। গীতাকে মাথায় ঠেকাইয়া সরাইয়া রাখিল।

রমেশ পত্র লিখিয়াছে :—

"ভায়া হে!—ভেব না যে, আমায় একেবারে অবাক করে দেবে। এ উত্তর-গো-গৃহে বৃহন্নলা বেশে কালযাপনের সময় সৈরিন্ধ্রীকে যে সঙ্গে আননি, সে ভালই করেছিলে; তা হলে হয় ত বেচারা আমাকেই কীচক-বধ করে যেতে। এখন অজ্ঞাতবাসের শেষে উভয় হস্তে গাণ্ডীবজ্যা-নির্ঘোষ করিতে করিতে উত্তর-গো-গৃহে কবে দেখা দেবে, বল দেখি? হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স-সহধর্ম্মিণী তোমাকে দেখবার জন্য এখন আমরা অতিশয় ব্যাকুল। আমরা অর্থে আমি ও ইন্দু। ইন্দুর বুদ্ধি শোন—সে ইতিমধ্যে একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড বাধিয়েছে। এই ২৫শে আমার বিয়ে। ক'নে দেখা-টেথা ইন্দু কিছুই বাকী রাখেনি! তুমি সস্ত্রীক কবে আস্‌ছ? ইন্দুর আর একটি বিশেষ অনুরোধ,—প্রয়াগ তীর্থস্থান, জ্যেঠাইমাকে অবশ্যই সঙ্গে আন্‌বে—অন্যথা না হয়। তোমাদের যেন দেরী না হয়; কেন না, ইন্দু একা।

ইতি তোমার রমেশ।

পুঃ—তোমার মাথাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে ত? ইন্দু সে জন্য চিন্তিত।"

অতুলের পত্রপাঠ শেষ না হইতেই বাধা দিয়া কমলা বলিল, "তুমি

এখানে আসার সময় যিনি সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি রমেশবাবু? তোমার ব্যারামের সময় তাঁর বোন জ্যেঠাইমাকে দু তিনখানা পত্র লিখে তোমার খবর নিয়েছেন; আজও আবার জ্যেঠাইমাকে কত করে' পত্র দিয়েছেন। তার নাম ইন্দুমতী—নাকি? তার ভাইয়ের বিয়েতে আমাদেরও ত যেতে হবে? ইন্দু নামটি বেশ!"

অতুল কমলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু-কোমলস্বরে বলিল, "হাঁ, সে রমেশের বোন! সে আমারও দিদি।"

শ্রীনিরুপমা দেবী।

বোবার ডায়েরী

বোবার ডায়ারী

১

'ওগো কথা কও—বৌ কথা কও—'

তুমি ত বলছ কথা কও, কিন্তু কি করে কইব? আমি যে একেবারে বৌ! মা-প্রকৃতি আমার বাক্‌যন্ত্রের উপরেও ঘোমটা টেনে দিয়েছেন যে! তবু তুমি বলছ কথা কইতে? আচ্ছা, বেশ, কথাই কইব, কিন্তু কেবল তোমারই সঙ্গে। কিন্তু বাক্‌দেবী যখন আমার জিভের উপর এতটা নির্দ্দয়তা করেছেন, তখন তাঁর কলমটার আশ্রয় নিলাম—দেখি সে আমার কথা সব লিখ্‌তে পারে কি না। আর এই কলমটা ব্যবহার কর্‌বার শক্তি হতে তিনি যখন আমায় বঞ্চিত করেন নি তখন সেইটুকু দয়ার জন্য তাঁকে নমো নমঃ।

বাক্‌দেবতাকে নমস্কার!—ওগো আমি কথা বল্‌তে পারি, যেমন করেই হোক পারি;—কিন্তু আমার কথা কইবার ভঙ্গী দেখে লোকে হাসে, মুখ ফিরোয়। তাই আমি মুখের কথা বন্ধ করেছি—আমার কথার-দেবতার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছি। তিনি বাইরের দিকে কারও সঙ্গে কথা বলেন না—অন্তরের মধ্যে যিনি আছেন কেবল তাঁরই সঙ্গে কথা বলেন। তাই আমিও বাক্যহীন নই—তাই আমিও বাক্‌দেবতাকে প্রণাম কর্‌লাম।

আমি বোবা নই—তোতলা, ভয়ানক তোতলা। একটা কথা কইতে গেলে আমার আধঘণ্টা লেগে যায়, আর এমন মুখ-বিকৃতি

হয় যে তা দেখে অতিবড় গম্ভীর লোকেরও হাসি আপনি ফেটে বেরোয়। তাই বড় লজ্জায় বাল্যকাল থেকেই কথা বন্ধ করেছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা—একদিন আর্শির সুমুখে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে নিজের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল। সেই হতে আমাব কথা বন্ধ। সে কি বিশ্রী দৃশ্য! এতখানি জিভ বেরিয়ে পড়েছে।—অমন যে বালিকার কচি মুখখানি, একেবারে সৃষ্টিছাড়া কদাকার ভাব ধরেছে! সুন্দর বস্তু কুৎসিত হলে কি এতই কুৎসিত হতে হয়। ওগো সৌন্দর্য্যের দেবতা, তুমি আমায় এত দয়া করেছিলে বলেই কি বাক্‌দেবতা তোমায় বিদ্রূপ করবার জন্য আমায় এমন করেছেন।

যখন চুপ করে আছি তখন আমার সমস্ত বাহিরটা ত' বেশ কথা বলে। আলোর-জগতে আমার সমস্ত দেহের প্রকাশটা এত সুন্দর, আর শব্দ-জগতে আমি এত কুৎসিত কেন? আর যদিই বা আমায় ভগবান শব্দ-জগতে কুৎসিত কব্‌লেন, কিন্তু সেই কুরূপটা আলোকের জগতেও দেখা দিল কেন? কথা বল্‌বার চেষ্টা কব্‌লেই আমার সমস্ত সুরূপ কুরূপে পরিণত হয় কেন? তার চাইতে একেবারে বাক্যহীন স্তব্ধ আকাশের অশোকবনে আমায় বনবাসে পাঠালে না কেন নারায়ণ?

চতুর্দ্দিকে এত কথা, এত সুর, এত আনন্দের কলস্বর, তার মাঝখানে বসে আমি একেবারে নির্ব্বাক্! আমার প্রাণের মাঝখান থেকে কত না সুর ঐ বাইরের ধ্বনির সঙ্গে মিলিবার জন্য ছট্‌ফট্ কব্‌ছে! অথচ সেই সুরের সিংহদ্বারে যে বিকটাকার তোতলা দৈত্য

বসে আছে তাকে পার হয়ে আমার প্রাণের সেই সুকুমার সুরগুলি বেরুতে পায় না, ভয়ে পিছিয়ে আসে। এ কি অভিশাপ!

* * * * *

'কথা কও—ওগো কথা কও।' ওগো বনের পাখী, তুমিও বল্‌ছ কথা কও। আর কথার রাজা মানুষের কুলে জন্মগ্রহণ করে', আমি অষ্টপ্রহর মনকে বুঝুচ্ছি, 'কথা কয়োনা—কথা কইতে চেষ্টাও কোরো না।' ক্রমাগত অন্তরাত্মাকে বল্‌ছি, 'থামো ওগো থামো।' কিন্তু সে যে থামতেই চায় না—বাক্যেই যে তার পরম প্রকাশ! সেই প্রকাশ-হারা নিতান্তই একলা মানুষটাকে যে আর সইতে পার্‌ছি না। সে অন্ধ নয়, যে, প্রাণের অন্ধকারে অনুপায় হয়ে বসে থাক্‌বে। সে মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, যে, চুপ করে প্রাণের এক কোণে পড়ে থাক্‌বে। সে যে জড় নয়—সে যে একেবারে চৈতন্য। তার সমস্তটুকুই যে চঞ্চল—তার সবই যে প্রকাশময়। তাকে আট্‌কে রাখবে কে?

* * * * *

ওরে আমার কালীমুখ কলমটি, তোকেই আজ মরণের দ্বারে এসে আশ্রয় করেছি—কারণ আর কথা না কয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আর চুপ করে থাক্‌লে মরণের পরও শান্তি পাব না। ওগো আমার শুভ্রদেহ কাগজগুলি, তোমাদের শাদা বুকে আমার এই কালো দাগ গুলি সযত্নে ধারণ কোরো—কারণ এ দাগগুলি কালো হলেও যে লিখ্‌ছে তার বুকখানা চিরদিনই একেবারে রক্তে রাঙা—সে যে কথাগুলি লিখ্‌ছে তা অন্ততঃ তার কাছে লালে লাল। এবং আজ এই পরপারে পা বাড়িয়ে সাহস করে বল্‌তে পার্‌ছি যে, যাঁর জন্য

লিখ্ছি তিনিও নিশ্চয়ই এগুলিকে রাঙা ফুলের মত আদর করে পায়ে স্থান দিবেন।

*　　*　　*　　*　　*

শুন্তে পাই গো, শুন্তে পাই। বোবা হয়েছি বটে কালা হতে পারিনি। কিন্তু শুন্তে পাওয়াও যে দুঃখের হতে পারে তা'কি কেউ বুঝ্বে? যা আঘাত করে তা প্রতিঘাতকেও জাগায়; কিন্তু সেই প্রতিঘাত যদি বেরিয়ে যেতে না পারে তাকে নিজের মধ্যে হজম করা কি যে কষ্ট তা কি কেউ বুঝ্বে? যে আঘাত জড়ের উপর কর তা হয় প্রতিঘাতের আকারে ফিরে আসে, না হয় সেই জড় বস্তুকে তাতিয়ে দেয়। আমার মনের উপর এই যে রূপ-রস-শব্দের আঘাত আস্ছে তার বড় প্রকাশটি তার শব্দের প্রকাশটি আমার নেই। তাই আমার সমস্ত আত্মাটি রাতদিন উত্তপ্ত হয়েই রয়েছে। এই উত্তাপ সারাদিন সইতে হচ্চে অথচ কোন উপায় নাই। সমস্ত জমাট কথাগুলা একেবারে জগতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকেও ভেঙে চূরে ফেল্বে, অন্যকেও বেদনা দেবে।

*　　*　　*　　*　　*

কথা বল্ব? কিন্তু কবেকার কথা? প্রথম থেকে আরম্ভ কর্ব? কিন্তু এর প্রথম থেকেই যে তোতলার কথা। প্রথম থেকেই যে আমার প্রাণের প্রকাশটা সরুমুখো ঘড়া হতে জল বেরুনোর মত থম্‌কে থম্‌কে ঝলকে ঝলকে বেরিয়েছে। আমি যে কথায় তোতলা, কাজে তোতলা, জাগরণে তোতলা, ঘুমেও তোতলা। বাল্যকালে, কতদিন, মা যখন ঘুমুচ্ছেন, তখন জেগে বসে হাত পা মাথা নেড়ে কত কথাই না বলেছি। মা ঘুমুতেন, শুন্তে পেতেন না—কেউ শুন্তে

পেত না—অথচ আমি অনর্গল তুৎলে তুৎলে বকে যেতাম। দিনের বেলায় কেউ আমায় বেশী বক্‌তে দিত না; তাই রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আপন মনে কথার বাঁধ ভেঙেচুরে ফেল্‌বার প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তাম। কেউ শুন্‌ত না তাই রক্ষে, নইলে সেই নিস্তব্ধ রাত্রের সমস্ত আকাশটাও বোধ হয় বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠ্‌ত।

*   *   *   *   *

আমার কৈশোর ও শৈশবের স্মৃতি সমস্তই ভাঙাভাঙা। যেন আমার জীবনটাই তুৎলে তুৎলে কথা বলেছে। জাগরণে যখন সংসারের নানান কথায়, আদরে-অনাদরে, আঘাতে-অনাঘাতে আমার বুকে একরাশ কথা জমে উঠ্‌ত, তখন আমি তাদের চাপে অজ্ঞানের মত হয়ে যেতাম—আমার নিজের অস্তিত্বটুকুও থাক্‌ত না। তাই আমার জাগরণের বোধটাও ছিল ভাঙা-ভাঙা ছাড়া-ছাড়া। আবার ঘুমিয়ে পড়েও রক্ষে নেই,—স্বপনের মধ্যে কথা জমে উঠ্‌লে সে অবস্থাতেও মনে হত আমি কথা কইতে পার্‌ছি না। অমনি স্বপন কেটে যেত। আমার জীবনটার মধ্যে একটানা একটা স্রোতই যেন নেই।

*   *   *   *   *

কই ভাই, বৌ কথা-কও, আজ কোথায় তুমি? আজ তোমার সাড়া নেই কেন? এরই মধ্যে কি তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় এল নাকি? তবে কার সঙ্গে কথা কইব? এই শাদা বোকা পাতাগুলোর সঙ্গে? এদের মুখে যতক্ষণ কালী না পড়ে ততক্ষণ যে এরা বোবার চাইতেও নির্ব্বাক্‌—একেবারে মড়ার মত শাদা-মুখ। উড়ে গেছ তুমি? বেশ, তবে এদের সঙ্গেই কথা কইব। শোনো গো তোমরা আমার কলমের মুখেই শোনো। কর্ম্মহীন রোগ-শয্যায় তোমাদের

সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসলাম। আর কেউ না শোনে তোমরা অম্লান মুখ মলিন করে তুলে শুনে যাও।

আমি গরীব বামুনের মেয়ে,—জন্মে' পর্য্যন্ত মা-বাপের বুকের বোঝা। একে ত' বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানই মহাপাপের ফল, তার উপর আবার আমি মুখ থাক্‌তে মূক! আমার জন্মনক্ষত্রটা কি জানি না, কিন্তু তার কণ্ঠে ফলং বাক্‌রোধং এটা নিশ্চয়ই প্রথম থেকে সবাই জান্‌তে পেরেছিল। তাই আমি যতই বড় হতে লাগলাম, ততই আমাকে দেখে এবং আমার কথা শুনে সবারই বাক্‌রোধ হয়ে যেত। এমন স্থন্দর মেয়ের এমন দশা!

দশা সে কেমন! একেবারে চরম! যাই কেউ বল্লে, 'মা বাণী আজ কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?'—অমনি বাণীর বাণী বন্ধ, চক্ষু কপালে উঠ্‌ল, ঘাড় বেঁকে গেল—আর দেড় হাত জিভ বেরিয়ে গেল। তার অর্থ যে কি তা কেউ বুঝ্‌ত কিনা জানি না, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আমি না বল্‌তে পারলেও, আমার রুদ্ধ বাক্‌শক্তি জিভ বার করে বুঝিয়ে দিত, যে, আমি জিভ দিয়েই ভাত খেয়েছি। ডাল তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না—খেতে হলে জিভ দিয়েই খেতে হয়। কিন্তু হায়রে বোকা শ্রোতারা, তোমরা মজা দেখবার জন্য আমায় কথা কওয়াতে! আমায় কষ্ট দিয়ে তোমরা আমোদ পেতে! কিন্তু সত্য কথাটা ত' তোমরা বুঝ্‌তে না। খাও তোমরাও জিভ দিয়ে, কিন্তু জিভের সেই আসল ব্যবহারটা তোমাদের মনে থাকে না। তাই তোমরা কেবল সেটাকে ব্যবহার কর মুখ-ভ্যাংচাবার জন্যে—জিভ ভ্যাংচাবার জন্যে। নাক দিয়ে মানুষ নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষ সেই নাকের সজ্ঞান ব্যবহার করে নাক সেঁট্‌কাবার সময়! এমনি সংসার—আর এমনি তার শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মানুষ!

*   *   *   *

হায়রে মানুষের জীবন! এ জীবনে মানুষকে মা-বাপের ঠাট্টাও সহ্য করতে হয়! আমার নাম কি না বাণী! যে বাক্‌শক্তিহীন হবে তার নাম রাখা হয়েছিল বাণী! এ যেন কালো ষণ্ডাগুণ্ডার নাম রাখা নলিনীমোহন না হয় কমলকুমার!—এ যেন পদ্মফুলের মত ছেলের নাম রাখা অঘোর-রুদ্র! এ যেন ধূমাবতীর মত মেয়েমানুষের নাম রাখা ললিতা! এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ের নাম রাখা রাজরাজেশ্বরী!

*   *   *   *

গরীব বামুনের তোতলা মেয়ে, তোতলা কেন প্রায় বাক্‌শক্তিহীন মেয়ের সব চাইতে ভাবনার কথা বিয়ে হওয়া। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মাবাপের আমার সেই ভাবনাটাই বাড়তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ আমিও তা বুঝ্‌তে পার্‌লাম। আমার ১০।১১ বছর হতে আরম্ভ হয়ে কতদিন পর্য্যন্ত কত লোক এসে দেখে গিয়েছে, কিন্তু আমার কথা শুনেই যে তারা হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। সে সবই যে মনে পড়ে! কিন্তু আজ ভাব্‌ছি, কি তারা দেখে যেত! বাইরের রূপ দেখে তারা বল্‌ত, বাঃ বেশ ত! তারপর কথা বলাতে গিয়ে হাসি চেপে তারা বল্‌ত, আহা! কিন্তু তারা ত' কেউ আমায় দেখেনি। দেখবে কি করে? মানুষের যা প্রকৃত প্রকাশ তাই যে আমার নেই—আমি যে বাক্‌শক্তিহীন! ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাক্‌লে কি মানুষকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়? চোখের ভাষা কি কেউ বোঝে? মানুষের অর্দ্ধেকের বেশী বোঝা-পড়াই যে কান দিয়ে! কান মলে না দিলে সে বাল্যকালে পড়ায় মন দেয় না, কোন জিনিষ বোঝে না—বড় হয়েও কান ধরে টানাটানি না করলে তার মাথাই যে কোন দিকে এগোয় না!

*   *   *   *

আমি মাথায় যতই বড় হতে লাগ্‌লাম, মায়ের আমার মুখখানি ততই ছোট হতে লাগ্‌ল। আমি ত তখন প্রায় কথা বন্ধ করেছি। সারাদিন ভূতের মত খাটতাম—জেঠী-খুড়ীদের বকুনির সঙ্গে চোখের নোনা জল দিয়ে ভাত খাই, আর মনকে বোঝাই খবরদার, চুপ করে থাক। কিন্তু সেই চুপ করে থাকাই কাল হল ;—বাবা যতদূর থেকে সম্বন্ধ করে মেয়ে দেখাতে আন্‌তেন, তারা দুচার কথার পরই আরও দূরদূরান্তে চলে যেত। আমার বিয়ের সম্ভাবনাও ততোধিক দূরে সরে যেত।

*   *   *   *

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি নিকট হতে আমার বিয়ের সম্ভাবনা হল। হায়রে! এত নিকট থেকে এতদিন ধরে আমায় দেখে, শেষে আমার মত জানোয়ারকেও সে দয়া করে বিয়ে কর্‌তে চাইলে! কেন এ দয়া করেছিলে তুমি? দয়া কর্‌বার আর মানুষ পাওনি? আমি ত' নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হয়ে একপাশে পড়েছিলাম। আমি ত আমাকে আমার মন-গহনের মধ্যে নির্ব্বাসিত করেছিলাম! সেখানে যা ছিল তা আমারি ছিল—আমার মৌন পাখী, আমার স্রোতহারা নদী, আমার স্তব্ধ আকাশ, আমার অচঞ্চল বাতাস, আমারি মূক লোকজন আমারি চিরস্তব্ধ তপঃলোক। সেখানে তুমি এলে কেন?—আমি ত তোমায় চাইনি। তোমার দয়া স্নেহ প্রেমের কলরব নিয়ে নিস্তব্ধ দেশে এসে তুমিও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছ—আমিও কোন স্তব্ধকর গভীরতম মৌনতার দেশের যাত্রী হলাম।

*   *   *   *

আমি ডাকিনি তবু সে এল!—সে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গ্রামের বড় পুকুরটায় জল আন্‌তে গিয়েছিলাম। বৌ হবার পূর্ব্বেই আমার

বৌ হতে হয়েছিল—কারণ আমার বয়েসের অনেকেরই তখন ছেলে পর্য্যন্ত হয়েছে। তাই জল আন্‌তে হলে গ্রাম্য বধূদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল আমায় তা হতেও বঞ্চিত হতে হয়েছিল। তাই গ্রামপথে লোকসমাগমের পূর্ব্বেই আমায় ঘাটের কাজ সার্‌তে হত।

কলসীতে জল ভরে ফিরে দেখি লাল আকাশের গায়ে কালো দৈত্যের মত নিজের প্রকাণ্ড দেহটা অঙ্কিত করে কে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন প্রভাত সূর্য্যের প্রথম আলো গাছের মাথাগুলো রাঙিয়ে দিচ্ছিল মাত্র। আমি চিরদিনই সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে ভালবাসি—তাই বাল্য-কাল থেকেই ভোরে উঠে কাপড় ছেড়ে জল আনতে যেতাম। মাঠের পারে সূর্য্য যখন লাল হয়ে উঠ্‌তেন তখন পুকুর-পাড় হতে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর দিকে চাইতে চাইতে জল নিয়ে বাড়ী আস্‌তাম। আজও তাঁকেই দেখ্‌তে উঠ্‌ছিলাম। কিন্তু সূর্য্যমূর্ত্তিকে আবৃত করে আজ কাকে দেখ্‌লাম! এ যে আমাদের পাড়ার শম্ভু! ঠাট্টা করে সবাই তাকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বল্‌ত। মস্ত তার মাথাটা, প্রকাণ্ড তার দেহ; আর সব চাইতে ভয়ঙ্কর তার বড় বড় ঈষৎ রক্তাভ দুই চক্ষু!

তাকে আমি চিরদিনই ভয় কর্‌তাম, কারণ যেমন পাহাড়ের মত কালো গম্ভীর মূর্ত্তি, তেমনি সে স্বল্পভাষী। আপন কাজে সে চিরদিন মুখ গুঁজে জেগে থাক্‌ত। বামুনের ছেলে, কিন্তু হেন কাজ ছিলনা যা সে না কর্‌ত। তার অবস্থা ভাল; বাড়ীতে আমলাফয়লা দাসদাসীর অন্ত ছিল না। অথচ সে সারাদিন ভূতের মত খাটে। আর এমনি তার গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ যে হঠাৎ অন্ধকারে শুন্‌লে আঁতকে উঠ্‌তে হয়। পাড়ার সবাই তাকে ভয় কর্‌ত—আমিও কর্‌তাম।

* * * *

সেদিন সেই প্রভাতে সেই শম্ভু আমার সমুখে। আমি এগুবো কি পিছুবো ঠিক করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়ালাম। এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ হল, 'উঠে এস বাণী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

কেন যে দাঁড়িয়ে রইলাম তা সে কেমন করে বুঝবে? তার মস্ত মাথাটায় দুনিয়ার সব ঢুকতে পারে কিন্তু সে যে ভয়ঙ্কর এ কথা ঢুকতেই পারে না, এ কথা সেই ভাবতেই পারে না। পারলে সে কি এমন করে নিজেকে সকলের সামনে বার করত? তা হলে আমি যেমন বাক্যরোধ করে নিজেকেও গোপন করতে আরম্ভ করেছি সেও তেমনি নিজের চেহারাটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করত।

আমি উঠে এলাম। সে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল! কিন্তু যাই আমি তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছি অমনি সে আমার সমুখে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাণী আমার একটা কথা শোনো!" আমি থরথর করে কেঁপে উঠ্‌লাম। মুখ দিয়ে কি শব্দ বেরুল মনে নেই, কিন্তু কলসীটা কক্ষচ্যুত হয়ে গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়ল। কেন ভয় পেয়েছিলাম? কিসের ভয়? সেও মানুষ, আমিও মানুষ, তবু মানুষকে মানুষের এত ভয়!

শম্ভু পিছিয়ে গিয়ে বল্লে, "বাণী, তুমি ভয় পেয়েছ! ভয় কি?" ভয় যে কিসের তা এখনো বলতে পারিনে—তবে এইটুকু মনে আছে যে খুব ভয় পেয়েছিলাম। শম্ভুর মুখ লজ্জায় আরো কালো হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বল্লে, "ভয় নেই, বাণী, আমায় ভয় করবার কোন কারণ নেই। আমি কেবল এইটুকু জানতে এসেছি যে তোমার শুনছি বিয়ে হচ্ছে না। আমায় তুমি বিয়ে করবে? কথা বলে কাজ নেই, ঘাড় নেড়ে বল্লেই হবে।"

হায়রে কপাল! আমার কথা বলাকে সেও ভয় করে। তা করুক,

আমি যখন অকারণে তার চেহারাকে ভয় করতাম সেই বা কেন সকারণে আমার তোতলা কথাকে ভয় করবে না? হতভাগিনী আমি যখন তার সেই গভীর দয়াকে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে অপমান করতে পেরেছিলাম, তখন কেন সে আমাকে বাঘের মত ভয় করে পালিয়ে গেল না? কেন সে আবার এল—বারবার এসে আমার জন্য মায়ের কাছে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে?

* * * *

শম্ভু আমার ঘড়াটায় জল ভরে এনে বল্লে, "চল তোমার বাড়ীতে দিয়ে আসি।" কি সর্ব্বনাশ! তাকে সঙ্গে করে সারাপথ যেতে হবে! কিন্তু শম্ভু কোন কথা বল্লে না, আমার ঘড়াটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়ীর দিকে চল্ল! আমিও মূঢ়ের মত তার অনুগমন করলাম। উপায় কি? সে যে কোন কথা শুনল না!

* * * *

দয়া! তার দয়ার হাত থেকে কে আমায় বাঁচাবে? কেউ না। মা বাবা সে কথা শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—বাঁচা গেল। কারণ শম্ভু সৎপাত্র এবং তার অভিভাবক আর কেউ নেই যে এ বিবাহে বাধা দেবে। তার চেহারাটা ছাড়া সে সর্ব্ববিষয়েই প্রার্থনীয় পাত্র। অতএব এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না।

* * * *

এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না? তা বটে, কারণ আমি যে কুপাত্রী! কেইবা আমার দিকে চাহিবে? কেইবা আমার অকারণ ভয়কে গ্রাহ্য করবে? বাবা চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন। আত্মীয় বন্ধুরা বল্লেন —"বাঃ বোবা বাণীর এমন পাত্র জুটল!—কালে কালে কি না দেখতে

হবে?”—মা-ই কেবল আমার মুখ দেখে হঠাৎ একদিন আমায় বুকে চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বল্লেন, “ভয় কি বাণী!”

ভয় যে কি তা কেমন করে বলব—কিন্তু সে আমার সমস্ত বহিরন্তরকে অধিকার করে বস্‌ল, আমি একেবারে কোণা নিলাম। মাঝে মাঝে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে ভয়ঙ্কর শব্দহীন না—না—না—না— ধ্বনিতে ভরে উঠতে লাগল।

সেই না—না—শব্দ কেউ শুনলে না। কেউ শুনলে না বটে কিন্তু যাকে শোনানর দরকার একদিন তাকে হঠাৎ সমস্ত তোতলামির বাঁধ ভেঙ্গে শুনিয়ে দিলাম—না—না—না। কিন্তু সেও শুনলে না। তার মস্ত বুকখানার মধ্যে যখন দয়ার প্রবৃত্তি জেগেছিল তখন তাকে কে ঠেকিয়ে রাখবে?

*　　*　　*　　*

ভয়ে আমার ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তাই সেদিন দুপুর বেলায় তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার বাড়ীতে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে যাওয়া-আসা যে আমার ছিল না তা নয়। বাল্যকালে যখন পূজাপার্ব্বণে তাদের বাড়ী ঢাকঢোল বেজে উঠত বা যখন তারা কাজে-অকাজে নিমন্ত্রণ করে পাড়াপরশীদের ভোজ দিত তখন ভাল কাপড়চোপড় পরে আমি অনেকদিন তাদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যেমন সবারই বাড়ী যাওয়া ছেড়েছিলাম—তেমনি তাদের বাড়ী যাওয়াও ছেড়েছিলাম।

আজ বিপদে পড়ে অনাহূত হয়েই তার কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম সে দরজার দিকে পেছন করে বিছানায় বসে কি একটা বই

পড়ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে ফিরে চাইল। অমনি তার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

আমি সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে, যা বলবার ইচ্ছে ছিল তাই বলতে গেলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা আর্ত্তস্বর—একটানা অশ্রুরুদ্ধ না—না—শব্দ !

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর তার বিশাল-চোখ দুটি রেখে বল্লে—"তোমার এই ভয় ভাঙাই আমার জীবনের একটিমাত্র কাজ হ'ল। আমি এ বিয়ে করবই। বিয়ের পর তোমার তোতলা রোগ সারাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সারে ভালই, নয়ত আমারও কথা বন্ধ হবে। দেখি তাতেও যদি তোমার ভয় ভাঙে। কেন যে তুমি ভয় করছ তা ত জানিনে—হয়ত এমন দিন আস্‌বে যেদিন তুমি বুঝবে যে আমি ভয়ের জিনিষ নই।"

* * * *

তুমি ভয়ের জিনিষ নও—তুমি যে কিসের জিনিষ তা আজ এই এতদিন পরে মরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু বড দেরীতে, প্রিয়তম, বড বিলম্ব হল। কিন্তু না বোঝাই যে ভাল ছিল। যখন বুঝলাম তখন মৃত্যু যে আমাদের দুজনার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যে ভুল শুধরে কোন ফল নেই। আমি যে তাকে ইচ্ছে করে ডেকে আন্‌লাম। সে যখন এসেছে তখন ত' আর ছাড়্‌বে না।

* * * *

কি কথার মধ্যে কি কথা লিখেছি কাল। যে কথা বলছিলাম শেষ করি।

আমার কথা কেউ শুন্‌লে না, বিয়ে হয়ে গেল। যাকে সমস্ত

বহিরন্তর দিয়ে ভয় কর্‌তাম তাকেই বিয়ে কর্‌তে হল। তার দয়ার নির্দ্দয়তা হতে নিস্তার পেলাম না। এই দয়াটা যে আর কিছু হতে পারে—এ যে সেই প্রকাণ্ড কালো পর্ব্বতের বুকের নির্ম্মল সলিল—প্রেম-নির্ঝর হতে পারে তা যে কিছুতেই মন বুঝতে চায়নি। তাই বিয়ের পর হতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি ভগবান্ আমাকে আমার স্বামীর দয়া থেকে মুক্তি দাও। আমার মত অনেক হাবাকালা বোবা ত' জগতে আছে, তাদের এ দয়া সে দেখাল না। দেখাল এই আমাকে! কেন এই অপমান আমি সইব? আমার রূপটুকুকে মাত্র দয়া দেখাবার তোর কি অধিকার? আমি সুন্দর হয়েও গরীবের মেয়ে, তাই কি এমন লোককে আমার বিয়ে করতে হবে? যাকে দেখলে সবাই ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় তাকেই, গরীব বলে তোতলা বলে আমায় বিয়ে করতে হবে? যাকে কেউ ভালবাসতে পারে না তাকে আমাকেই ভালবাসতে হবে? ভগবান! এ দয়া যে আমি চাই না। তার এই ভয়ঙ্কর দয়া থেকে আমায় মুক্ত কর। যাকে সমস্ত দেহে প্রাণে ভয় করি তাকে ভালবাসতে পার্ব্ব না, তার দয়া আমার সইবে না।

*   *   *   *

বাস্তবিক সে দয়া আমার সইল না? আমার মত পাপীর সে সুধার আগুন সইবে কেন? তাকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই সেই স্বর্গের আগুন আমায় দগ্ধ করলে। ওঃ আমার পাপের কি শেষ আছে? এ জ্বালা কিসে জুড়াবে!

*   *   *   *

সে আমার জন্য কি না করেছে? আমায় কলকাতায় নিয়ে এসে

আজ পাঁচ ছ বৎসর ধরে আমার মন পাবার জন্য কি না করেছে সে। আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মরণের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বুঝতে পারছি কি বস্তু হেলায় হারালাম! নিজের জীবনও নষ্ট করলাম আর একটি মহৎ প্রাণকেও নিস্ফল করে দিলাম। তিনি আমারই জন্য জগৎসংসারের সঙ্গে বাক্যের সংস্রব ত্যাগ করেছেন। এই অগ্নির মত তেজস্বী মানুষকে সহ্য করা কি আমার মত খড়ের প্রতিমার কর্ম্ম।

*　　*　　*　　*

ভুল—ভুল—জীবনব্যাপী মতিভ্রম! হায় দেব অগ্নি, বিবাহের দিন তোমার সাক্ষাতে একি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা আমায় করিয়ে নিয়েছিলে! স্বামী প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর দেহ মন প্রাণ সব আমার, আর নষ্টমতি আমি কি প্রতিজ্ঞা করলাম! কেন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সেই প্রতিজ্ঞা শুনবামাত্র আমার সেই লাল চেলীখানা সত্যি-সত্যি আগুন ধরে লাল হয়ে উঠ্‌ল না কেন? কেন সেই লাজ হোমের সময় আমিও নিজেকে আহুতি দিলাম না? কেন—কেন—

*　　*　　*　　*

প্রতিজ্ঞা করলাম, সারা জীবন আর কারও সঙ্গে কথা কইব না। স্বামীর সঙ্গে ত' নয়ই—মাবাপের সঙ্গেও নয়। যে মহাপ্রাণ মানুষটি এই বাক্যহীনার একটা কথা শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইল তাকে আমার তোতলা কথা হতেও চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত করে রাখলাম।

কথা কইবে না! বটে! তোমার কথা কওয়াটাও যে কি বীভৎস দৃশ্য তা কি সেই প্রতিজ্ঞার সময় মনে ছিল না? তবে মূঢ়ে, তোমার কেন তখন মনে হল না, যে, তোমার কথা না-বলাই যে ভাল—মানুষের নয়ন-সুখকর থাক্‌বার জন্যই যে তোমার বাক্যে সংযমী হওয়া উচিত। স্বামী

উঠছে ওরও যেন আমারই মত ভাঙা-ভাঙা তোতলা ভাষা—ঐ যে—ঐ যে—

*　　*　　*　　*

আর একদিন—কি ভয়ঙ্কর কি নিষ্ঠুর সেদিন আমি হতে পেরেছিলাম। আমার মধ্যে, ওগো চিরন্তন নারী, ওগো নারায়ণী, তুমি কেমন করে এতটা ঘুমুতে পেরেছ ? সে দিন সন্ধ্যায় কাজকর্ম্ম সেরে জানালার গরাদে ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় তিনি হঠাৎ একটা বছর চার-পাঁচেকের কালোকোলো ছেলের হাত ধরে আমার ঘরে এসে বল্লেন "ওগো স্তব্ধরাত্রি, তোমার উপযুক্ত একটি উপহার এনেছি। আমার বোবাকালার স্কুল থেকে এই ছোট অপরাজিতা ফুলটি আমার বাণীর জন্য এনেছি। তুমি এর বাণী ফোটাও।"

হঠাৎ আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ইচ্ছে করল, সেই মুহূর্ত্তে হেসেকেঁদে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু তা হ'ল না। কেন হল না ? কেন সেদিন তা পারলাম না ? তা হলে ত' আজ এ ডায়ারী লিখ্‌তে হ'ত না। এই বুক-ফাটা রুদ্ধবাক্ অশ্রু ফেলতে হ'ত না।

ক্ষণপরেই মনে হল আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙাবার এ এক মন্দ ফন্দী বার করেননি তিনি। যাই একথা মনে হওয়া অমনি আমার সমস্ত দেহমন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। ছেলেটিও আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। সেও এ রাক্ষসীকে চিন্‌লে !

ওরে নিষ্ঠুর, ওরে নির্দ্দয়—ওরে আমার অন্তরের পাথরের চাইতেও পাথরের মানুষ, তুই কি করে সেদিন চুপ করে ছিলি। যে দিন তিনি আমার রুদ্ধবাণী না শুন্‌তে পেয়ে আমার চাইতেও যারা হতভাগা সেই

বোবাকালাদের কথা ফুটিয়ে তাদের মুখে আমার কথা ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন সে দিনও তুই একটি কথা দিয়ে তাঁকে আনন্দিত করিস্‌নি আর যেদিন সেই মূক বালককে আমার কোলের কাছে এনে দিলেন সে দিনও তুই নির্ব্বাক ছিলি! ওরে পাষাণ—ওরে—ওরে—

*　　*　　*　　*

এই ঘটনার পর হতে দেখি স্বামীও কথা বন্ধ করলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে তিনি আর বাক্যালাপ কর্‌তেন না। তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দিনে দিনে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল তিনি ততই বাইরের সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশে গেলে, তিনি হয় নিজে চুপ করে পড়েন, না হয় নীরবে আমার হাতে কোনো বইয়ের পাতা খুলে দিয়ে চুপ করে আমার পানে চেয়ে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেটে যায়। সংসারের কাজে কেউ ডাকলে আমি উঠে যাই, তারপর ফিরে এসে দেখি সেই পরম একক মানুষটি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছেন!

ওরে ভক্তিহীন, ওরে উদ্ধতা নারী, কেন তুই নীরবে সেই পায়ে মাথা লুটাতিস্‌ না? কে তোকে সেই সামান্য একটু কাজ কর্‌তে মানা কর্‌ত?

*　　*　　*　　*

নারায়ণ! তুমি নাকি সৃষ্টির আগে একলা ছিলে? কিন্তু সে কি এমনি একলা? তোমার শ্রী, তোমার শক্তি, মা লক্ষ্মী যদি তোমার পাশে সেই সময় এমনিভাবে মড়ার চাইতেও মড়া হয়ে, জীবন্ত হয়েও চাঞ্চল্য-হীনা হয়ে পড়ে থাকতেন তা হলে তোমার নীল চক্ষে কত বেদনা গভীর হয়ে দেখা দিত দেবতা? হে আদি কবি, যদি তোমার সেই প্রথম

সৃষ্টিসঙ্গীতের সময় তোমার বাক্ তোমার বাণী তোমার পাশে মূঢ় মূক হয়ে পড়ে থাকতেন সে দুঃখ কি তোমার সইত? তবে এই কপাটবক্ষ বিশাল-হৃদয় আমার একমাত্র শ্যামমূর্ত্তি নর-নারায়ণটির তা সইছে কি করে? কি শক্তি তাকে দিয়েছ প্রভু, যে, সে এই অধমাকে এত ভাল বেসেছে অথচ সেই অধমার কাছ থেকে সারা জীবনে একটা ইঙ্গিত বা একটা অক্ষরও সে ভিক্ষে করেও পেলে না? অথচ সে দুঃখ তাকে সইতে হ'ল? কি তার অপরাধ? কেন তার এই শাস্তি? নারায়ণ, তার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ কেড়ে নাও—সে বাঁচুক—সে সুস্থ হোক!

* * * *

যতদিন পেরেছিলাম কোন রকমে দেহটাকে খাড়া রেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ কোন্ দিন একেবারে শয্যা গ্রহণ করতে হল ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এইটুকু মনে আছে যে স্বামী দিনরাত্রি আমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বসে থাকৃতেন। তাঁর অক্লান্ত সেবার চেষ্টা দেখে কত সময় যে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছি তার ঠিক নেই। তবু তিনি ত' আমায় ত্যাগ করেননি।

এমনি সময় স্বামী কোথা হতে আর-একজনকে আমার সেবার জন্য নিয়ে এলেন। স্বামীর কালাবোবার ইস্কুলে নাকি সে কি করত। সে এল সেবা কব্তে, কিন্তু তার প্রথম করস্পর্শে ই আমার বুকের দ্বার খুলে গেল অমনি সে একেবারে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ কব্লে। কি মধুর তার স্পর্শ! কি মধুর তার সেই প্রথম কথাগুলি!

* * * *

উঃ একি জ্বালা!—না, আজ আর কিছু লিখ্তে পারব না। ভিতর

থেকে একটা কাঁপুনি বেরিয়ে আসছে—অথচ বাইরে একটা প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব হচ্চে।—নাঃ পারলাম না—

*　　*　　*　　*

আহা কি মিষ্টি তার নামটি—সুভাষিণী—মিষ্টি কথা। শুধু কি তার কথাই মিষ্টি, তার সবই মিষ্টি। তার নামের আগে ইংরিজি মিস্ কথাটাও মিষ্টি ;—মিস কথাটা বাংলা মিষ্টির আধাআধি—আধাআধি কেন, তারও বেশী।

প্রথম যেদিন সে আমার সমুখে এসে দাঁড়াল তখনই তাকে দেখে আমার মনটা তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর যখন সে বল্লে—'আমি ক্রিশ্চান, আমার হাতে ওষুধ খাবে ত' ভাই',—তখন আমার মনে হল, কেন কথা বন্ধ করেছি? কেন তার হাত ধরে বল্‌তে পারলাম না, যে, তুমি যাই হও তুমি আমার পরমাত্মীয়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ঝিকে ডেকে বল্লে, "তোমায় আমি যখনই ডাকব, এসে ওষুধ খাইয়ে যেও—খাবার দিয়ে যেও। আর বামুন ঠাকুর যেন সব সময় বাড়ী থাকেন, তাঁকে যেন ডাক্‌লে পাই।"

ঝি বল্লে, 'বাবু বলে দিয়েছেন, আপনার কথা-মত সবই হবে। বাড়ীর কাজের জন্য নতুন লোক রাখা হয়েছে।'

*　　*　　*　　*

সুভাকে পেয়ে পর্য্যন্ত সবই আমায় নতুন হয়ে গেল। সে ডাক্তারী শিক্ষাতেই জীবন কাটায়নি—তার গিন্নিপনাও চমৎকার! সবই যেন কলে চল্‌তে লাগল। আমি শুয়ে শুয়েও অনুভব কর্‌তাম, কার নিপুণ হাতে পড়ে স্বামী হতে আরম্ভ করে ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সবাই যেন কেমন এক রকমের হয়ে গেল। সবই যেন ঘড়িঘণ্টা ধরে চলতে লাগল। সুভা

এল আমার সেবা করতে, কিন্তু তার সেবার শক্তি রোগীকে ছাড়িয়ে সারা সংসারে ছড়িয়ে পড়ল।

কোথা হতে যে সে এসেছে, ইতিপূর্ব্বে তার কি কাজ ছিল, তার বাপপিতামহ কোন্ জগতের মানুষ, কিছুই খোঁজ নিলাম না। সে যেন চিরদিনকার আপনার জন। মায়ের পেটের ভাইবোনও আমার ছিল, সবাইকেই আমি পর করেছিলাম। সকলেই আপন-আপন সংসার নিয়ে ব্যস্ত, চিরদিন আমাকেও উপেক্ষা করে এসেছে, আমিও কাউকে কখন ডাকিনি। কিন্তু আজ এই মরণের দ্বারে এসে এ কোন্ আপনার জনকে লাভ কর্‌লাম? কোথায় এতদিন এ লুকিয়ে ছিল?

*　　*　　*　　*

আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। সুভার সঙ্গে মনে মনে 'মিষ্টিকথা' পাতালাম। স্বামীকেও যা দিতে পারিনি তা আমার মিষ্টি-কথাকে দিলাম—তাকে ভাল বাস্‌লাম। ভালবাসতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে। কিন্তু সে আমায় তাই শেখালে—নিজে ভালবেসে প্রাণপণে সবারই যত্ন করে মেয়েমানুষকে যে কি রকম হতে হয় তাই শিখিয়ে মরণোন্মুখ আমায় বাঁচালে। আমার মনে হচ্ছে, যদিই বা আমি এখন মরি তবু যে ক'দিন সংসারে থাকব সে ক'দিন বেঁচেই থাক্‌ব। কারণ আমি তাকে দিনে দিনে মাসে মাসে ভালবাসতে পেরে আর সবাইকেও ভালবাস্‌তে পারলাম। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই। আমার স্নেহের উৎসের মুখে যে পাথর চেপে ছিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সুভা দু'হাত দিয়ে জোর করে সেই পাথরখানা তুলে ফেলে দিয়েছে।

বাঁধ ভেঙে গেল কি করে—পাথর সর্‌ল কি করে? সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেদিন সন্ধ্যায় চুপ করে শুয়ে আছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

চাকর যে আলোটা ঘরে দিয়ে গিয়েছিল সেটাকে কমিয়ে আড়ালে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমুইনি—তবে চোক বুজে পড়ে ছিলাম। ক'মাস থেকেই অনুভব করছিলাম যে ক্রমশই আমার ভাল করে জেগে থাকবার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। একটা তন্দ্রার মত অবস্থা আমায় যখন-তখন এসে আক্রমণ করে। সেই রকম একটা অবস্থায় চুপ করে শুয়ে ছিলাম।

স্বামী আমার মাথার শিয়রে নীরবে বসে কি করছিলেন—কি আবার করছিলেন?—এই হতভাগিনীর দেহে যদি একটু প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন সেই আশায় আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম কে এসে দাঁড়াল। একবার চেয়ে দেখলাম। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমাদের উভয়কে দেখ্‌লে; তারপর, বেশ অনুভব কর্‌লাম, সে চেপে-চেপে একটা নিঃশ্বাস ফেল্লে। শেষে স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বল্লে 'আপনি উঠে যান, আমি বস্‌ছি।' স্বামী প্রথমটা উঠিলেন না—সেও দঁাড়িয়ে রইল। শেষে স্বামী উঠে বাইরে গেলেন, সে আমার পাশে বসল। তারপর হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌তে লাগল। সে কি কান্না! সে কি গভীর বেদনার চাপা কান্না!

কেন কাঁদ্‌ল সে? কি তার দুঃখ? কি বেদনা তার বুকে ঢুকেছে? আমি আর থাকিতে পারলাম না—দুই হাত দিয়ে, আমার যতটুকু জোর ছিল তাই দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে দেখ্‌বার চেষ্টা করলাম। সেও যেন আমার প্রশ্ন বুঝ্‌লে। কতদিন সে এসেছে তবু চোখে-চোখেও তার সঙ্গে আমি কথা বলিনি। এই তার সঙ্গে—তার সঙ্গে কেন, বিয়ের পরে এই বোধ হয় প্রথম মানুষের সঙ্গে, আমার সম্ভাষণ!

সে অশ্রুসিক্তমুখে ভাঙা-ভাঙা গলায় বল্লে, "হতভাগিনী! কি রত্ন

তুমি হেলায় হারালে, হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললে তা বুঝ্‌লে না। জানি না সেই শেষ দিনে তুমি ঈশ্বরের কাছে কি জবাব দেবে। নিজের ওপর অন্যায় করে অত্যাচার করে অন্য একজন নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষকে এত বড় শাস্তি তুমি দিয়ে গেলে। তোমার জন্য কাঁদ্‌ব, না তার জন্য কাঁদ্‌ব, আমি যে বুঝতেই পার্‌ছি না। তুমি নিজের কণ্ঠরোধ করেছ, কিন্তু আর একজনের কণ্ঠই বা কেন এমন করে রুদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? সংসারের আর একজন প্রিয়জনের কেন হাত-পা-হৃদয়-মন জন্মের মত বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? তাকে কেন চিন্‌লে না? কেন তাকে ভালবাস্‌লে না? উঃ তুমি মেয়েমানুষ নও!"

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুন্‌তে লাগলাম। কি জানি কেন তার সেই কথাগুলো আমার অসাড় মনটাকে হঠাৎ তাতিয়ে তুল্‌লে, তার কথাগুলো একেবারে জ্বলন্ত অক্ষরে আমার মনে লেখা হয়ে গেল। সে আমার সেবা কর্‌তে এসে এই প্রথম তিরস্কার কর্‌লে, অথচ তা যেন আমার সমস্ত অন্তর-বাহিরের ওপর তীব্র ওষুধের মত কাজ কর্‌লে। কেন সে এ তিরস্কার কর্‌লে! কোথায় আঘাত পেয়ে সে এই প্রতিঘাত আমায় কর্‌লে?

* * *

প্রথমটা তার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু তারপর বুঝ্‌লাম। আমি যা কখনো সাহস করে ভেবে দেখেনি—যে কথা আমি নিজের কাছে নিজেই গোপন করে রেখেছিলাম, সেই কথা সে আমায় জোর করে বুঝিয়ে দিলে—শুনিয়ে দিলে। সে বুঝিয়ে দিলে যে আমি কেবল আত্ম-হত্যার পাতকী নই, স্বামীহত্যাও করতে চলেছি। স্বামীর স্নেহের এত নিদর্শন পলে পলে পেয়েও ইচ্ছে করে তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করিনি। এমন

করে স্বামীকে দূরে ঠেলে রাখ্‌বার আমার অধিকার নেই—ভালবাসাকে এত অপমান করবার কারও অধিকার নেই। তাকে জীবনে পূজা কর্‌তেই হবে—নইলে শুধু মৃত্যু নয়, তার চাইতেও ভয়ঙ্কর আরও কিছু ভাগ্যে আছে। তাঁর স্নেহময় মূর্ত্তি আমার প্রাণের দ্বারে প্রতিমুহূর্ত্তে এসে আঘাত করেছে, তাকে ফিরিয়ে আমি নারায়ণকে নির্ব্বাসিত করে মৃত্যুকে এনে অন্তরাসনে বসিয়েছি। আমার নিস্তার নেই—নেই—নেই।

কিন্তু কেন? কে বলে দেবে কেন? হয়তো বাল্যকাল হতে ভালবাস্‌তে শেখাই আমার হয়নি। কাউকে ভালবাস্‌তে দেখিনি, কারও স্নেহ অনুভব করিনি, কাউকে নিজেও ভালবাসিনি। স্বামী যখন তাঁর অগাধ স্নেহ নিয়ে আমার প্রাণের দরজায় আঘাত কর্‌লেন, তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারিনি—ঘৃণাকে ক্রোধকে অভিমানকে ভেতরে ডেকে নিয়ে সজোরে অন্তরের কপাট বন্ধ করে দিয়েছি। যে অগ্নিকে সাক্ষী করে ঘৃণা আর ক্রোধকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিলাম, সেই অগ্নি তাঁদের সঙ্গে অলক্ষ্যে আমার বুকে প্রবেশ করেছিলেন। আজ তাঁর দহন সারা দেহমনে অনুভব হচ্চে।

* * *

আমি নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম—আমার সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল।

ব্যর্থ হয়ে গেল? সত্যিই কি তাই? না, তা নয়—আজ এই মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হচ্চে যে, না তা নয়, আমি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাইনি। মরতে মরতে আমি মরলাম না—আমি বেঁচে গেলাম। ঐ অতবড় বিশাল পর্ব্বতের মত মানুষকেও ভালবাসা যায়—ওকেও বুকে নেওয়া যায়। শুধু পূজা নয়, শুধু ভক্তি নয়, শুধু

দূর হতে নমস্কার নয়, নিজেকে একেবারে ঐ মহাপুরুষের স্নেহস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, মিশিয়ে দেওয়া যায়। বেঁচে গেলাম গো বেঁচে গেলাম। ঐ অসিত গিরির বাহ্য রুক্ষতাকে পাতার শ্যামল শোভায় ফুলের নানা রঙে ভরিয়ে দেওয়া যায় এ সাহস আমার মিষ্টিকথার মিষ্টি কথায় আমার প্রাণে জোয়ারের মত সজোরে এসেছে। আমি ভয় হতে অভয়ে, অনাশ্রয় হতে আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হলাম। ও আমার সুভাষিণী, ও আমার মিষ্টিকথা, তুমি আমায় বাঁচালে। আমার ধূসর আকাশে ঐ সজল জলদকে নতুন শোভায় জাগিয়ে তুমি আমায় বাঁচালে, ভাই, বাঁচালে। তুমি যাকে ভালবাস্‌তে পার, তাকে কি আর আমি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি? সে আমার হৃদয়াকাশে এতদিন ভীষণ উষ্ণতা হয়ে বিরাজ কর্‌ছিল, আজ তোমার অশ্রু-শীতল নিঃশ্বাসে সে আজ কান্তকোমল শ্যামল মেঘের শোভায় মধুর বর্ষণোন্মুখ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার প্রাণ-চাতক বেঁচে গেল গো, বেঁচে গেল।

* * *

একি নতুন জীবনস্রোত আমার সমস্ত দেহে প্রবেশ করছে! এও যে আমায় আগুনের মত তাতিয়ে তুললে! আমি কথা কইতে যাচ্ছি, কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে আমার মধ্যে। সারা জীবনের নিজের তৈরি বাঁধ আজ দেখ্‌ছি শক্ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছে। আমি ত পারলাম না। জিভ আমার একেবারে জড় হয়ে গিয়েছে। কোথায় মা বাক্‌দেবী। এক মুহূর্ত্তের জন্য দয়া কর মা—একবার তাকে বল্‌তে দাও যে তোমার জয় হয়েছে—ওগো তোমারই জয়! হায়, যে তোতলাবার শক্তিটুকু ছিল তা থাক্‌লেও বাঁচতাম। তাও যে আমার নেই! কি হবে!—

পারলাম না—পারলাম না—ও ভাই মিষ্টিকথা, কিছুতেই যে পারলাম না। তোমার বাক্‌শক্তি ধার দিতে পার বোন? তা হলে সারা জীবন ধরে তুমিই আমার এই কথাগুলো তাঁর তৃষিত কর্ণে শুনিয়ো। বোলো, আমি তাঁকে এই শেষ ক'দিন কি যে ভাল বেসেছি তা লিখে যেতে পারব না। মিষ্টিকথা, তোমার মিষ্টি কথায় সু ভাষায় বোলো যে তাঁর সাধনা নিষ্ফল হয়নি—মহাবীর এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। আমার মরণের পর আমার এই হাত দুখানা তুমি নিজের হাতে তুলে তাঁর গলায় দিয়ে বোলো "এই তোমার জয়ের মালা!"

* * *

পরিয়েছি, আমি নিজে মালা পরিয়েছি। বীরের গলায় তাঁর জয়চিহ্ন দিয়েছি—তার পুরস্কারও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। বাঁচালে—আমায় বাঁচালে—.

* * *

সখী, আর দুদিন আমায় ধরে রাখ—আর একদিন—উঃ এ যে ভয়ঙ্কর আনন্দ—আমার সইছে না যে —

* * *

আর পারলাম না—প্রিয়তম, আমার কথার শেষ হল না—প্রিয়তম, আমার শেষ কথা আমার মিষ্টিকথার জন্য রেখে গেলাম। মিষ্টিকথা, তুমি আমার এই ভারটুকু নিও ভাই—আমার কথা তুমি বোলো ভাই—আর যে লিখ্‌তে পারছি না—হাত যে কাঁপ্‌ছে তবু প্রাণপণে লিখ্‌ছি—

কাল যদি পারি ত'—

* * *

আর পারলাম না—প্রিয়তম—শেষ কথা শেষ হবে না—সুভা,—শেষ কোরো ভাই—

*　　　*　　　*

বেঁচে গেলাম—প্রিয়তম বাঁচিয়েছ—আর লিখতে পারব না—কলমটা পড়ে যাচ্ছে—একটু থাম ওরে—আর একটা—

২

বোবার কথা মধ্য পথে থামিয়া গিয়াছে। এখন এই ডাইরি শেষ করিবার ভার যাহার উপর পড়িল সে বোবা নয়। তথাপি মনে হয় যে বোবা হইতে পারিলেই বুঝি হতভাগিনী বাণীর শেষ বাণী সকলকে জানাইতে পারিতাম। তাহার প্রাণের মধ্যে এই কথাগুলা লিখিবার যে প্রচণ্ড একটা চেষ্টা যে প্রাণান্তকর তাগিদ ছিল আমার মধ্যে তাহা কিরূপে আসিবে? মরণের প্রপাতের মুখে তাহার প্রাণের স্রোত যতই অগ্রসর হইতেছিল ততই প্রাণপণে সে আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাই তাহার লেখার মধ্যে যে ভাষার বাঁধভাঙ্গা ভাবের স্রোত অন্ততঃ আমি অনুভব করিয়াছি, অন্যে তাহা অনুভব করিবে কি না জানি না, কিন্তু আমার প্রাণেও সেই মরণোন্মুখ প্রিয়জনের শেষ জীবনে প্রচণ্ড তরঙ্গ লাগিয়াছে। তাই তার শেষ অনুরোধ রাখিতে বসিলাম।

*　　　*　　　*

কিন্তু কেন আমি এ ভার গ্রহণ করিলাম? সে কথা নাই বা লিখিলাম। যাহা আমার নিতান্তই আপনার কথা সে কথা এই ডাইরিতে লিখিয়া যাইবার প্রয়োজন কি? আমার কথা ত' বাণীর কথা নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি যে দিনের পর দিন, কিংবা যেদিন অবসর

মত ইহাতে যাহা কিছু লিখিব তাহা বাণীর কথাই লিখিব? যাঁহার জন্য ইহা লিখিতেছি তিনিও যেন বাণীর কথা বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করেন। বাণীর শেষ ইচ্ছানুসারে তিনিই ইহা আমার হস্তে দিয়াছেন—অতএব বাণীর কথাই ইহার কথা।

* * *

বাণীকে কতদিন পরে আজ স্বপ্নে দেখিলাম। কি সুন্দর তার এখনকার মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তিই কি চিরদিন তিনি দেখিয়াছিলেন? তাই কি সারা জীবন নির্ব্বাক্ এই মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া অন্তরে বাহিরে ধ্যানমুগ্ধের মত থাকিতেন? এ মূর্ত্তি যে সব দিয়া ধর্ম্ম দিয়া কর্ম্ম দিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্তি দিয়া ভালবাসিবার। তাই বুঝি সেই প্রথমদিন হইতেই সেই রোগকাতর অনতিলুপ্ত শোভা মুখখানির দিকে আমার সমস্ত প্রাণ ঢলিয়া পড়িয়াছিল। আমিও বুঝি না দেখিয়াও জীবিত বাণীর মুখে এই সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছিলাম।

বাণীও স্বপ্নে এই ডাইরী খানাই যেন আমার হস্তে তুলিয়া দিল। কোন কথাই সে বলে নাই। তাহার মুখে ছিল সেই চির পরিচিত নির্ব্বাকভাব। কিন্তু তার স্বপ্নের চক্ষু দুইটি কি যে আমায় নিবেদন করিয়াছিল তাহা কেবল আমি জানি।

বলিব বাণি, বলিব—তোমার কথা শেষ না করিয়া থামিব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

* * * *

বাণীর এ ভার সে স্বয়ং দিবার পূর্ব্বেই আমি লইয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে যখন এই ডাইরী লিখিতে আরম্ভ করে তখন হইতে প্রতিদিনই ইহা পড়িয়াছি। সে তাহা জানিতে পারে নাই। এবং অন্তত

এই সামান্য ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া যে তাহার মধ্যে একটা মধুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহা দেখিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহার মনে পরম অনুতাপকে জাগাইতে পারিয়া মনে মনে কতবার বলিয়াছি "ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর, ওগো বেদনার মূর্ত্তি, ওগো যীশু, তুমি এই অকৃতজ্ঞ সংসারের জন্য যে বেদনা সহ্য করিয়াছ, সেই পরম স্নেহের, পরম ভালবাসার বেদনা আমার মধ্যে জাগাইয়া দিয়া আমাকেও বাঁচাইয়াছ আর এই জীবন্মৃত নারীকেও বাঁচাইলে। আমাব মধ্য দিয়া এই যে স্নেহ ইহার দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা ত তোমারি প্রভু!"

* * * *

বাণী ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে যাইতেছিল—ভয়ঙ্কর নরকাগ্নি তাহাকে চিরদিন ঘিরিয়া দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু মূঢ়মূক নারী তাহা ত বুঝিতে পারে নাই। তাই সে এই রসাতলের অগ্নিকে তাহার আত্মার শক্তির উত্তাপ মনে করিয়া বসিয়াছিল। তাই সে পলে পলে দগ্ধ হইয়া শেষে কোথায় চলিয়া গেল? কিন্তু শেষ কয়দিন হে দয়াল, তুমি সেই গ্যালিলী সাগরের ঝড়ের মত তার এই আগুনের ঝড়কে থামাইয়া দেও নাই কি? দিয়াছিলে বই কি তাই তোমার পদে কোটী কোটী প্রণাম।

* * * *

আজ কেন জানি না, কেবলি মনে হইতেছে কেন এ ভার আমার হস্তে আসিল। দয়াময় যীশু, আমি তোমার ক্ষুদ্রশক্তি দাসানুদাসী। আমার কতটুকু ক্ষমতা? তুমি ত সবই জান অন্তর্যামী। তবে কেন বাণীর স্বামীর হাত দিয়া এই আগুনভরা মহাসুরাপাত্র আমার হাতে দিলে? এ ভার আমায় কেন? তোমার পবিত্র পানপাত্রের এই ক্ষুদ্রানু-

ক্ষুদ্র অনুকরণের ভার সহ্য করার ক্ষমতাও যে আমার নাই। আমি যে ইহাকে সহিতে পারিতেছি না নাথ!

* * * *

সহিতে পারি না—তবু এ ভার লইতেই হইবে এমনি তোমার কঠিন আদেশ! যেদিন দেখিলাম যে একটী ক্ষুদ্র চ্যুতদল ফুলের উপর—মৃত বাণীর বুকের উপর পড়িয়া ঐ অতবড় ধীরতার পর্ব্বতও বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; সেই মহামুহূর্ত্তে আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমি ভুলিয়া গেলাম যে, তিনি বিধর্ম্মী, তিনি পৌত্তলিক, তিনি অন্য জগতের মানুষ। তখন এইটুকুই কেবল মনে হইয়াছিল যে তিনিও মানুষ আমিও নারী।

সে কি আমি ভুল করিয়াছিলাম প্রভু! যদি ভুল করিয়া থাকি সে ভুলও ত' তোমারি;—আমি তোমারি ভুলে ভুলিয়া থাকিব। তোমারই ভুল যেন আমার পরম সত্য হয়। দয়াময়, সেই সত্যটুকু হতে আমায় চ্যুত করো না।

* * * * *

আমি তাকে বাণীর কথাই বলিতেছি। এ আমার কথা নয়—আমার কথা নয়। এই যে আমার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়া সেই নির্ব্বাক নিশ্চল মানুষটির মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে এ প্রাণত' আর আমার নয়। বাণী আমায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে—তিনি যেন না বুঝেন যে এ সমস্ত আমার কথা। এই যে দিনে দিনে আমি চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে তাঁহাকেই ঘিরিতেছি এও সেই যীশু ক্রোড়গতা বাণী—আর কেহ নয়—নয়—নয়—

আমি কি নিজের সহিত বঞ্চনা করিতেছি? তাহা যদি হয় তাহা হইলে এ লেখা বন্ধ করাই ভাল। কিন্তু তিনি ত আর একদিনও আমায়

ডাকিলেন না, তিনি যে আর ইহা দেখিতে চাহিবেন তাহারও সম্ভাবনা কৈ? বাণীর মাথার শিয়র হইতে এই খাতাখানি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া আর ত কোনদিন ইহাকে তাঁহার মনে পড়ে নাই! তবে আর ভয় কি? যদি বাণীর কথা বলিতে গিয়া ভুলিয়া নিজের কথাও বলিয়া ফেলি, তাহাতে এতই কি অন্যায় হইবে? কৈ আজ কতদিন হইল তিনি ত আমায় ডাকিয়া পাঠান নাই—তাঁর বোবাকালার ইস্কুলে কতবার গিয়াছি, তাঁহার দাসদাসীর নিকট তাঁহার খবর লইয়া আসিয়াছি—তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া দিনের মধ্যে কতবার যাতায়াত করিতেছি, একবারও কি আমি তাঁহার চোখে পড়ি নাই—একবারও আমায় তাঁহার মনে পড়িল না!—থাম থাম—একি লিখিতেছি?

* * * *

সর্ব্বনাশ! একি দেখিয়া আসিলাম! তিনি কি হইয়া গিয়াছেন—এই মাস দুয়েকের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন! আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। নাই বা তিনি আমায় ডাকিলেন, তবু ত' আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। আর চুপ করিয়া থাকিলে সে বাঁচিবে না। বাণীর আত্মা যে আমায় শয়নে স্বপনে তিরস্কার করিতেছে। গতরাত্রেও সে যে আমার হাত ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়া গেল!

ওগো আমার মিষ্টিকথা, ওগো আমার দ্বিতীয় আত্মা, তুমি আমার সবটুকু অধিকার করিয়া এ কি অত্যাচার আরম্ভ করিলে? শয়নে স্বপনে এ কোন দিকে আমায় টানিতেছে কোন দিকে লইয়া চলিয়াছ? আমি গরীব ক্রিশ্চানের মেয়ে, আমায় এ কোন প্রলোভনের দিকে লইয়া চলিয়াছ? থাম—ওগো থাম।

* * * *

প্রলোভন! ইহাই কি সেই পেলেষ্টাইনের বিজন গহনের মহাপরীক্ষার চিরকালের নূতন সংস্করণ? তবে আর নয়—এইখানেই থামিতে হইবে? প্রলোভন—তারপর গভীর অতলে পতন—তারপর মহামৃত্যু—

* * * *

না—না—না, ইহা প্রলোভন নয়। যদি প্রলোভনই হইবে তবে এতখানি আত্মবিস্মৃতি দেখা দিল কেন। কেন আমি ক্রমাগতই আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছি। আমি যে তাহাকে দেখিলে, তাহার সেই স্তম্ভিতাশ্রু অন্ধকার, নির্ব্বাক মুখখানি দেখিলে সব ভুলিয়া যাই। কেন তখন আমার দেশ কাল পাত্র সমাজ কিছুই মনে থাকে না।

কে তুমি আমার অন্তরে বসিয়া আমায় সব ভুলাইতেছ! ওগো থাম। এমন করিয়া আমায় অধিকার করিও না। আমায় আপনাকে বুঝিতে দাও—দেখিবার অবসর দাও। আমায় এমন পাগলের মত ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইও না। এতখানি প্রচণ্ড চাঞ্চল্য আমার সহিতেছে না যে।

* * * *

প্রলোভন! কখনই নয়। কি তাহার আছে। সে দেখিতে সুন্দর নয়—সে বিধর্ম্মী। তাহার শিক্ষা দীক্ষা সবই আমার অপরিচিত। তবে কেন সে আমার এতখানি আপনার হইল! তাহাকে প্রথম যেদিন—সে আজ কতদিন হইল। কিন্তু সে দিনের সেই প্রথম মানুষ-মাত্র-দর্শন আজিও ভুলি নাই ত? সেই মূকবধির বিদ্যালয়ে বোবার মধ্যে বোবা হইয়া যে দয়ায় কোমল, স্নেহে অতল-কালো-সাগরের মত যে মুখখানা দেখিয়াছিলাম আজিও ত' সে মূর্ত্তি আমার নয়ন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আমিত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সেই কেবল মানুষটীকেই দেখিয়া আসিতেছি—তার

পর সেই স্বেচ্ছা মূক মূঢ় নারীর শিয়রাধিষ্ঠিত ধ্যানমগ্ন প্রেমিকের মুখেও আমার সেই প্রথম-দৃষ্ট মানুষটীকেই দেখিয়াছি; আর আজ আশ্রয়হারা পরম একক গৃহকোণগত মানুষটীর মুখেও সেই তাহাকেই দেখিতেছি। তবে ভুল আমার কোন খানে? নাই—নাই—ভুল কোথাও নাই, ভুল কখনো হয় নাই। ওরে ভীক ওরে সন্দেহী আর দ্বিধা করিস্ না। তোর প্রাণের ভিতকার মানুষের দৃষ্টি ভুল করে নাই, ভুল দেখে নাই। কারণ এ যে তোর দৃষ্টি নয়। এযে তারই দৃষ্টি যিনি সেই মুর্খ ফ্যারিসিদের উপর পরম করুণায় চাহিয়া চরম যন্ত্রণার সময়ও বলিয়াছিলেন; "পিতঃ ইহাদের ক্ষমা কর, আমাব এই বেদনা যেন ইহাদের শেষ প্রায়শ্চিত্ত হয়।" এ যে সেই দয়ালের দৃষ্টি! ওরে ভয় নাই, এই যে দর্শনের অনুভূতি তোর সারা প্রাণকে অধিকার করিয়াছে ইহা সেই জীবের হৃদয়বাসী দয়াল প্রভুর নয়ন সম্পাতের অনুভূতি।

*　　*　　*　　*

না আর স্থির থাকা নয়। আমার সেই দয়ার কালো সাগর, স্নেহের অতল সাগর যে জমিয়া কালো পাথরের মত হইয়া যাইতেছে। ইহাকে যে গলাইতেই হইবে। ধর্ম্মের বাধা কর্ম্মের বাধা সমাজের বাধা মানিব না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সামাজের নিয়ম ত' মানুষের জন্য হইয়াছে, মানুষ ত তাহাদের জন্য নয়। মানুষ যে সব নিয়মের উপরে। সব ছাড়াইয়া সব গণ্ডির উর্দ্ধেও যে মানুষের অনেকখানি আছে। আমার ক্ষমতা থাকিতে যদি চুপ করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অন্তরের দেবতা যে আবার ক্রুশ বিদ্ধ হইবেন। তাহাকে আবার আমার মধ্যে মরণ যন্ত্রণা সহিত দিব? না প্রভু না তা পারিব না। জাগো, প্রভু জাগো তুমি আমার মাঝে। তোমার পুনরুত্থান এই ক্ষুদ্র নারী হৃদয়ে আবার আমি দেখি।

সব বন্ধন সব বাধা চূর্ণ করিয়া ওগো মহাব্যথিত তোমার বেদনাকাতর পুনরুত্থিত মুখখানি আমার অন্তরে দেখাও। জাগো, নাথ, জাগো।

*　　*　　*　　*

ওরে নারী-অভিমান থাম—থাম। সে তোরে লইল না কিন্তু তারে তোর চাই। নহিলে জাগ্রত যীশুর ক্রন্দন থামিবে না কিছুতেই থামিবে না। তোর কিছুরই পাইবার আশা নাই—নাই বা থাকিল? কি পাইয়াছিলেন তিনি—যিনি আপনার হৃদয়ের রক্তে তৃষিত জগৎকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন? তোরও কিছুই পাইবার অধিকার নাই। না, তোকে কিছুতেই কিছু পাইতে দিব না—

*　　*　　*　　*

বহুদিন উঃ কতদিন পরে—আজ আমি একি পাইলাম? কি এ?—ওরে ভিখারী, ওরে কাঙ্গাল, তোর ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়াছে ত? পাথর গলিয়াছে, সে হাসিয়াছে,—আজিকার তার সেই হাসিটুকুই তোর পরম লাভ।

তুমি ধন্য প্রভু! এই যেটুকু দিয়া এই কাঙ্গালের ভিক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিলে তাহাতেই তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে। সব অভিমান সব অহংকার চূর্ণ করিয়া সেইটুকুকে পরম লাভ বলিয়া স্বীকার করিবে।

*　　*　　*　　*

ঐ যাঃ!—এ সব কি লিখিয়াছি। মাথামুণ্ডু এ সব কি? এ যে সবই আমার কথা! বোবার ডাইরীতে এ সব কার কলরব? আমি কি সেই হতভাগিনী বাণীর পূর্ণবাণী হইতে পারিয়াছি? কৈ না!

*　　*　　*　　*

না কেন? হাঁ—এ সব তারই কথা। সেই বাণীই আমার হৃদ্‌গত

হইয়া তাহার স্বামীকে ধীরে ধীরে সুস্থ করিতেছে। নাহলে আমার কি আছে? না আছে রূপ, না আছে গুণ। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা আমি যে ভিন্ন জগতের ভিন্ন আচারের ভিন্ন ধর্ম্মের মানুষ। কিন্তু তবু সে আমাকে পাইয়া ধীরে ধীরে আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে কেন? সে আমার মধ্যে কি দেখিতেছে—কাহাকে দেখিতেছে? সেও ত তাহার সমাজকে মানে নাই—সে ত তাহার গৃহ তাহার সময় তাহার সমস্তই এই রূপগুণহীনা ক্রিশ্চান নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইল—অন্তরঙ্গ করিয়া লইল। সেও তাহার আচার-ধর্ম্মের কঠিন বন্ধনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশাল মানব ধর্ম্মের উদার আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। সেও ত আমায় কেবল-মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তাহার সকল কর্ম্মের সকল চিন্তার সমান অংশ দিয়া সেও ত আমায় অতি মানুষের দেশে লইয়া গিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

বিবাহ? সেই চিরপুরাতন বাঁধাবাঁধি। সে কথা কেন আমার মনে উঠিতেছে? সেও ত' তাহা চাহে না। সে মাত্র আমাকে চায়—আমার সমাজ-ধর্ম্ম-আচার-নিয়ম-বদ্ধ এই দেহটাত সে চায় না। দেহ? দেহ ত' তাহার কাছে অতিতুচ্ছ! এই রক্তমাংসের জড়বস্তু? ছিঃ ছিঃ ইহা কি ঐ কেবল-মানুষটীকে কি নিবেদন করিবার যোগ্য? না না, সে তাহা কখনও চাহে নাই, আমিও তাহা কখনই তাহাকে নিবেদন করি নাই। আমি যেখানে তাহার সহিত মিলিয়াছি সেখানে দেহ নাই এবং দেহাধিকৃত ধর্ম্ম অর্থ কিছুই নাই। আমি যে এখন কেবল সেই স্বর্গগতার আত্মা—আমি যে সেই বাণীরই পরপারের বাণী। আমার এখন দেহ নাই, মন নাই, আশা নাই, ভিক্ষা নাই। আমি কি কাঙ্গাল? আমি

যে সেই রাজরাজেশ্বরের কন্যা! আমায় যে চাহিবে সে আমার এই অশুচি কুৎসিত দেহটাকে চাহিবে কেন?

* * * *

বহুদিন পরে—কত মাস কত বর্ষ পরে ঠিক মনে নাই আজ বাণীর এই স্বহস্ত রচিত কথার-মালাখানি সাহস করিয়া তাঁহার হস্তে দিতে চলিয়াছি। আর ভয় নাই। তুষার গিরি গলিয়া করুণার সাগরে পরিণত হইয়াছে। আমার জীবনের সাধনা সফল হইয়াছে। তিনি সুস্থ হইয়াছেন। আজ প্রভাতে তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখিলাম তিনি স্নান করিয়া যুক্তকরে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন—দর বিগলিত ধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতেছে। বুঝিলাম আবার তাঁহার মধ্যে চিরন্তন-মানুষ জাগিয়াছেন—আমার প্রভু তাঁহার হৃদয়ে আবার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বাণীর রচিত এবং আমার খচিত এই কথার হার তাঁহার গলে পরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। তিনি, কি জানি কেন, অসম্পূর্ণাবস্থায় ইহা আমার হাতে সম্পূর্ণ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। জানি না বাণীর মালা শেষ হইয়াছে কিনা—কিন্তু আমার যাহা কিছু ছিল—সবই ইহাতে গাঁথিয়াছি। ইহাতেও যদি ইহা পূর্ণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা পূর্ণ করা আমার সাধ্যাতীত।

এখন যাহার বস্তু, যাহার জন্য বাণী তাহার হৃদয়ের হৃদয় শোণিতের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত দিয়া এই কথার ফুলগুলি রাঙ্গাইয়া মালা গাঁথিয়াছিল, সেই মালাগাছি আমার হৃদয়ের পুষ্পে শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। এখন আমার একটী মাত্র প্রশ্ন,—ওগো আমার কেবল-মানুষ, তুমি বল, বাণীর এই মালা কি শেষ হইয়াছে? আমার এই সাধনা কি সিদ্ধ

তোমায় কথা কইতে দেখলেই যে আঁতকে উঠবেন—এই কথাটা মনে রাখনি কেন?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর একটা প্রচণ্ড অভিমানে আমি অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলাম, কথা কইব না। যেটুকু কথা কইবার শক্তি ছিল তাও চিরদিনের জন্য অন্তরে বন্ধ করে নির্ব্বাক কাঠের পুতুলের মত স্বামীর পিছনে ঘুরতে লাগলাম। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলে গেল—আমি কিন্তু আকার ইঙ্গিতেও নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা অন্য কোন রকম মনের ভাব কাউকে জানাইনি। সবারই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিজে খেটে মরতাম, আমার যে কি চাই তা কেউ জানতে পারত না।

* * * *

স্বামী লেখাপড়া শেখালেন। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার। একপক্ষ কতই না বকে যাচ্ছে—কত উপদেশ, কত অদ্ভুত গল্প, কত ইতিহাস, কত কাব্যকথা ঐ প্রকাণ্ড কালো মাথা থেকে বেরুতো তা কি সব মনে আছে? তাঁর অনর্গল বক্তৃতার স্রোতের মধ্যে পড়ে কত সময় হাবুডুবু খেয়েছি হাঁপিয়ে উঠেছি তবু নির্ব্বাক হয়ে বসে থাকতাম—কখনও তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতাম, কখনও বা ঢুলুনি আসত। তবু তিনি কখনো থামেন নি। যেন তিনি এই নির্ব্বাক শ্রোতাটি পেয়ে তাঁর অন্তরের গভীর জ্ঞানের সাগরের উচ্ছ্বাসটাকে উন্মুক্ত করবার সুবিধা পেতেন। বাইরে কেউ ঐ লোকটির কাছে বড় একটা ঘেঁসত না, কিন্তু যে দু'একজন ওঁর অন্তরের খবর টের পেয়েছিল তাদের কাছে উনি যে কত লোভনীয় ছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু হায়! সবই এই কাঠের পুতুলের কাছে ব্যর্থ হয়েছিল।

* * * *

কতদিনের কথা আজ মনে পড়ছে—শুয়ে শুয়ে ঐ বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে কত শত দিনের কথা বিদ্যুতের মত আমার এই মরণোন্মুখ প্রাণটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আমায় এই মরক্কো-বাঁধান খাতাখানি কতদিন আগে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি ত' কথা কইলে না—কখনো যে কইবে তারও আশা নেই। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, এরই পাতে দুটো তোমার মনের কথা লিখে রেখো—আমি তাতেই খুসী হব।"

হঠাৎ আজ কদিন আগে সেই কথাটা মনে পড়েছে। তাই ক'দিন হতে লিখে যাচ্ছি।—জানি না শেষ পর্য্যন্ত লিখতে পারব কি না কিন্তু প্রাণপণে লিখব। তাঁর সঙ্গে কথা না কওয়ার প্রতিজ্ঞা অগ্নি-সাক্ষী করে করেছিলাম—সে প্রতিজ্ঞা রেখেছি। কিন্তু জীবনে যা হলনা মরণের পর যেন তিনি আমার খাতাখানার দূতীগিরিতে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারেন তার উপায় করলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি সারা জীবন ধরে করে গেলাম—প্রাণ থাকতেও কাঠের পুতুল থাকার যন্ত্রণা সারা জীবন ভোগ করে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যেন মনে না করেন যে তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়নি। তিনি জয়ী হয়েছিলেন—তাঁর জয়পত্র এই আমি রেখে যাচ্ছি—এইটুকু আমার শেষ সান্ত্বনা।

* * * *

মনে পড়ে এমনি একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। স্বামী কোথা হতে একরাশ পাতাসুদ্ধ কদম-ফুল এনে বল্লেন "এরা তোমারি মত—দূর হতে যখন কালো পাতার মধ্যে ডালেডালে ঝুলছিল তখন কত কথাই বলছিল; কিন্তু পেড়ে যাই হাতে করেছি অমনি এদের সরু-সরু দলগুলি ঝরে যাচ্ছে—সমস্ত দেহটাই এদের কাদার মত হয়ে যাচ্ছে।" তিনি সেই পাতা-ডালসুদ্ধ কদম-ফুলগুলো ঘরের নানান স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে আমার

কাছে এসে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে দুহাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন,—"ডাক্তার বলছিল এমন করে থাকলে শুধু যে তুমি কথাকে হারাবে তা নয়—হয়ত' প্রাণও হারাবে। তুমি যদি বল তোমায় তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দি।" আমি কোন কথা না বলে উঠে গেলাম। তিনি আমার ইচ্ছার কোন-রকম ইঙ্গিত্ না পেয়ে সারাদিন কেবল গভীর দৃষ্টিতে আমার অন্তরের খোঁজ নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আজ তাঁর সেই দিনকার সেই কাতর দৃষ্টি কতকাল পরে এই বর্ষার বৃষ্টি-সাগর পার হয়ে আবার এসে উপস্থিত হয়েছে। যা সত্য তা যে কিছুতেই মরে না। সেই-দিনকার কথা মনে হয়েছে, তবু প্রাণপণে বলছি, যখন এতদিনই গিয়েছে তখন আর কেন? আর নয়—নয়—

ঐ যে স্তম্ভিতবর্ষণ মেঘের মত মানুষটি আমায় ঘিরে-ঘিরে মাঝে-মাঝে স্নিগ্ধ গম্ভীর-স্বরে কুশল-প্রশ্ন করছে, ওকেই কি আমি এতদিন ভয় করে এসেছি? শুধু ভয় কেন?—তার চাইতেও যা আরও ভয়ঙ্কর, স্বামীকে যা করলে অনন্ত নরক, সেই ঘৃণাই করে এসেছি? ঐ কি সেই মানুষ, যাকে মনে করতাম আমার জীবনের সূর্য্যকে এক প্রভাতে রাহুগ্রস্ত করে চির-জীবনের জন্য তাঁকে আমার জীবনাকাশ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে? কৈ আর ত' তা মনে হয় না? এখন যে কেবলই মনে হচ্চে, ঐ মানুষটি ত' আমার উষর জীবন-ক্ষেত্রের দিগন্তবিস্তৃত দগ্ধ তাম্র-আকাশের প্রথম মেঘসঞ্চার।

জানি না কি অশুভলগ্নে কি অশুভ-দৃষ্টিতে ঐ আমার শ্যামল মেঘকে প্রথম দেখেছিলাম। সেই দৃষ্টির ফল যে কিছুতেই আমায় ছাড়তে চাইল না। ঐ সজল জলদের বজ্রবিদ্যুৎঝঞ্ঝার সম্ভাবনাই বেশী ভয় দেখিয়েছিল।

তার শীতল বারিধারার সম্ভাবনার কথা মনেই উদয় হয়নি। কিন্তু যখন সেই বারিপাত অজস্রধারে আরম্ভ হল, তখন আমার অন্তর-গৃহের সমস্ত জানালা-কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ওগো গুরুগর্জ্জিত মেঘ, ওগো ঘন-গম্ভীর দুর্বোধ অন্ধকার, ওগো ঘনায়িত গূঢ় স্নেহ, তুমি আমার সেই রুদ্ধ দুয়ার ভাঙ্‌তে পারলে না কেন? কেন তোমার ততখানি শক্তি হল না? আমি বা কেন সেই স্নেহশক্তিকে ঠেলে রাখবার শক্তি পেয়েছিলাম! এখন সেই শক্তিই যে আমায় মরণের দিকে নিয়ে চল্ল।

*   *   *   *

সময় নেই, আর সময় নেই—আমার সব কথা যে কিছুতেই শেষ হবে না, সে কথা যে কেবলি ভুলে যাচ্ছি। যা লিখ্‌তে বসেছি তার আগা-গোড়া কিছুরই যে ঠিক থাকছে না। ধীরে ধীরে অচঞ্চল পদে শেষদিন এগিয়ে আসছে তা বেশ জানতে পারছি। তবু শেষকথা যে আর শেষ হতেই চায় না। সারা জীবনের রুদ্ধকথার স্রোত যে এই কলম বয়ে বর্ষার ঝরণার মত নেমে আস্‌তে চাইছে। একবার যখন কথার বাঁধ খুলেছে তখন আর কি করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখব? শেষ হবে না?—শেষ বলা হবে না? নাই বা হল। এই একখানা ছোট খাতায় আমার সমস্ত জীবনটা এঁটে যাবে? আমি এতই ছোট? না না—তা আমি নই। আমিই আজ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছি। আমি ত আর বোবা রোগাক্রান্ত বিশপঁচিশ বৎসরের ছোট মানুষ মাত্র নই—আমি যে লোকে লোকে কালে-কালে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমার নিজের স্পর্শ যে আমি চারিদিক থেকে পাচ্ছি। ঐ যে মেঘ থেমে থেমে আমারই মত রুদ্ধবাক্ হয়ে গুর-গুর করে গুমরুচ্ছে!—ঐ যে বিদ্যুৎ চমকে-চমকে

হইয়াছে?—তোমার বাণীর অর্দ্ধগ্রথিত মাল্য কি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি?

* * * *

৩

আমায় এই মালাখানি দান করিয়া, ওগো সুভাষিণি!—ওগো দয়াময়ি!—ওগো বাণীর পূর্ণ বাণী!—ওগো আমার চিরপ্রিয়ার প্রিয়ম্বদা! ওগো বাণীর মিষ্টিকথা, তুমি এই দীন দরিদ্রকে রাজা করিলে—আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিলে। তোমাকেও প্রণাম, তোমার মধ্যেও যিনি পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন—প্রেমমূর্ত্তি সেই নর-নারায়ণকে প্রণাম। সেই বিশ্বপ্রিয়া শ্রীবাক্‌রূপিণী নারায়ণীকে প্রণাম। আমি এই মালার শেষ ফুলটি নতশিরে লক্ষ প্রণামের সহিত ইহাতে যোগ করিয়া দিলাম!—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণ মুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

চাঁদের আলোর প্রাণী

ওপরে অগাধ কোমল নীলবর্ণের একখানি বিস্তৃত আসন পাতা রয়েছে, তার পশ্চিমের পাড়্‌টি উজ্জ্বল লাল। সেই লাল পা'ড়ের একটু ওপরে নীল আসন খানির এক প্রান্তে বাঁকানো চক্‌চকে রূপোর ফলার মত শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ।

নীচে পৃথিবীতে, দুটি সদ্যজীবনপ্রাপ্ত প্রাণী তাদের নূতন তৈরী বুকের নবজাগ্রত স্পন্দন নিয়ে প্রথম দৃষ্টিশক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আকাশপানে চেয়ে সেই চাঁদ টুকুকে দেখতে পেলে। অবাক হয়ে বিভোর হয়ে দুজনে একদৃষ্টে সেইদিকেই চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে, কিছুক্ষণ পরে যখন তাদের সেই তরুণ দৃষ্টিশক্তি ও চোখ্ দুটী ব্যথিত হয়ে বুজে এল, তখন তাদের হাতদুটী তাদের অজ্ঞাতেই যেন, নিজ-লব্ধশক্তির কাজ করতে প্রসারিত হবামাত্র পরস্পরের গায়ে ঠেকে স্পর্শানুভূতির দ্বারা জানিয়ে দিলে পাশে আর একজন কে আছে। অন্তরে জান্‌বার ইচ্ছা জন্মাবামাত্র কণ্ঠনালী সেই চেষ্টাকে জিহ্বার দিকে ঠেলে দিলে; একটী জিহ্বা তখন উচ্চারণ কর্‌লে—"কে তুমি ?" সেই রকমে উত্তরও এল "আমি আমি ! —তুমি কে ?" "আমিও আমি"। "তুমি ও আমি, কি আনন্দ ! ভাই ! আমি !" আমার কাছে আসবে ?" অপর জিহ্বাও উচ্চারণ কর্‌লে "আমিও যে তাই চাচ্চি ভাই"। দুজনে দুজনার স্পর্শ আর একটু বেশী করে পেতে ইচ্ছুক হ'য়ে একটু সচেষ্ট হতেই তাদের দেহ দুটী

দুজনায় কাছাকাছি হয়ে গেল। আকাশে তথন সেই রূপোর ফলার মত চাঁদ নীল আসনের শেষ প্রান্তের দিকে নেমে চলেচে এবং তার সেই লাল পা'ড়ের বাহারও কমে গিয়ে একটী পাঁশুটে রঙে ভরে উঠ্‌ছে। তারা দুজনে পরস্পরকে স্পর্শ করে ক্লান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরদিন যথন আবার তারা জাগ্‌ল, তথন নীল আকাশে আবার সেই চাঁদ, আরও একটু বড় এবং আরও একটু চক্‌চকে হয়ে তাদের চোথের সম্মুখে ভেসে যাচ্ছে, দুজনে সেইদিকে নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল "কি সুন্দর! ভাই আমি! তুমি কি সুন্দর!" তৃতীয়ার চাঁদ যথন অস্ত গেল তথন তারাও দুজনে দুজনার হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার পর দিন জেগে তাদের আনন্দের যেন সীমা রইল না। সেই চক্‌চকে সুন্দর জিনিষটে আজ আরও যেন বড় হ'য়ে একথানি সোনার নৌকার মত নীল সাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছে। চক্‌চকে পালিশ করা রূপার মত রংটা যেন আজ সোনার মত হয়ে সেই চক্‌চকে ভাবটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মুগ্ধ চোথে দুজনে চাঁদকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরস্পরকে বল্‌লে "ভাই আমি! ও সুন্দর জিনিষটি কি ভাই? ওর আলোর শরীর যে জুড়িয়ে দিচ্চে। কি আনন্দ ওকে দেখ্‌তে কি সুখ ওর আলোর স্পর্শে! ওগো কে তুমি? তুমি আমাদের আরও কাছে সরে এস, তোমার আলো আরও ভাল করে আমরা গায়ে মাথি! তুমি আরও বড় হও, আরও উজ্জ্বল হও, আমরা এমনি করে তোমাকে কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখি!"

পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী। চাঁদ যত পুরস্ত হয়, যত তার আলো বাড়ে, যতই নীল সাগরের ওপরে ফুটন্ত পদ্ম কলিটীর মত সে ক্রমে ক্রমে ফুট্‌তে থাকে, সন্ধ্যার সোণালি গোলাপি এবং গভীর রাত্রির সাদা সাদা

রঙের মেঘখণ্ড গুলির সঙ্গে ছুটোছুটি করে যত লুকোচুরী খেল্‌তে থাকে এবং যত দেরী ক'রে অস্তে যায়, ততই তাদের আনন্দ বাড়ে! তারাও কখনো দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে কত গল্প করে, কখনো বা ছুটোছুটি ক'রে খেলা করে। সেই চাঁদও পশ্চিমে ঢ'লে অস্তে যায় অমনি তারাও পরস্পরের বাহুতে মাথা দিয়ে সেই দিক পানে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

চাঁদের পূর্ণতার সঙ্গে তাদের জীবন দুটীও ক্রমে পূর্ণতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তাদের সে আনন্দ বোধও ক্রমে গভীর এবং অচঞ্চল হচ্ছিল। দ্বাদশী ত্রয়োদশী অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্দ্দশীর রাত্রে তারা তো এক রকম ঘুমুলই না। নীল সমুদ্রের সেই জ্যোতির বিকচ পদ্মটীকে দেখতে দেখতে চকোরের হিংসা ক'রে, দুজনে গান গেয়েই কাটিয়ে দিলে,—"ওগো কে তুমি আমাদের? কে তুমি সুন্দর কে তুমি মধুর! তোমার দর্শন সুখময়, স্পর্শ মোহময়! তোমার সোনার আলোর রেখা আমাদের ঘুমন্ত চোখের পাতাকে কি মধুর স্পর্শ দিয়ে তাদের সে জড়তা ভাঙায়। কি সুখে আমরা তখন জেগে উঠে তোমায় সম্মুখে দেখি! তোমার আলোয় স্নান ক'রে সেই আলো পান ক'রে—আমাদের যে তৃপ্তি হয় না। যত দেখি—যত পাই ততই আরো পেতে ইচ্ছে করে। তুমিও ততই বড় হ'য়ে ততই উজ্জ্বল হয়ে দিন দিন আমাদের কাছে বেশীক্ষণ ক'রে থাক্‌ছ, তুমিও আমাদের যে ভালবাস তা আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি! কে তুমি পরম সুন্দর পরম প্রেমস্বরূপ? তুমি কি আমাদের প্রাণ? আমরা তোমাকে কি বলে আমাদের এ ভালবাসা এ কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রব—তা আমাদের শিখিয়ে দাও! কি দেব তোমায়? কি চাইব তোমার কাছে? আমরা তোমার গান গাইব, তোমার পানে চেয়ে থাক্‌ব, তুমিও এমনি পূর্ণতররূপে সর্ব্বক্ষণ আমাদের চোখের সামনে

বিরাজ কর। আমাদের চোখে যেন ঘুম না আসে, এই আমরা তোমার কাছে চাই"।

পূর্ব্বদিকে যখন উষার ঈষৎ আভাসমাত্র জাগ্‌ছে, পশ্চিমে পাণ্ডু চন্দ্র অস্তোন্মুখ, তখন সারারাত্রি জাগরণ ক্লান্ত চোখ্‌ দুটিও তাদের অজ্ঞাতেই যেন ক্রমশঃ বুজে গেল। পরদিন পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ জ্যোৎস্না ডাকাডাকি ক'রে তাদের চোখের পাতা দুটী খুলে দিলে। তখন সেই পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের পানে চেয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দ বোধ শক্তির সম্পূর্ণতায় সে দিন তাদের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি বা অঙ্গ স্পন্দনের ক্ষমতাও যেন রইল না! চারিদিকে আলো,—অতি স্নিগ্ধ আলো! আকাশে রূপের অপরূপ পূর্ণমূর্ত্তি,—শূন্যে নিম্নে সেই রূপচ্ছুরিত জ্যোতি—আনন্দ তরল মূর্ত্ত্য রূপ গ্রহণ ক'রে সমস্ত চরাচর ভ'রে দিয়েছে! সেই আনন্দ সমুদ্রে জগৎ যেন ডুবে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। সুখের উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে সেই আনন্দ সমুদ্রে ঢেউ দিয়ে তাকে উতরোল আকুল করে দিচ্ছে! পৃথিবী সেদিন চাঁদকে তার আরও কি দেবে যেন ভেবে পাচ্ছে না! 'পিয়' 'পিয়' 'উহু উহু' 'পিঁউ কাঁহা' শব্দে পৃথিবীর সুখ বিবশ প্রাণীর আবেগ স্রোত নদীর মতই সে আলো সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,— সেই ঢেউয়ে তার বুকের কত মধুর গন্ধও ভেসে চলেছে। তারা দুজনে সেদিন বাক্যহীন বিবশভাবে পরস্পরের বুকে মাথা রেখে একবার চাঁদের পানে একবার সুখ ও শোভা মাখা প্রকৃতির পানে চাইছিল এবং অতি আনন্দ তাদের চোখের জলের আকারেই পুরে উঠেছিল! এত সুখ এত আলো এবং তার নীচে নিজেদের সেই "কানায়" "কানায়" পোরা পূর্ণতম জীবনের উদ্দাম উতরোল স্পন্দন এ যেন তারা সেদিন সহ্য কর্‌তে পারছিল না। তাই তারা দুজনার বুকের সেই আনন্দের অদম্য স্পন্দনকে

অংশ ক'রে পরস্পরকে দেবার জন্য আলিঙ্গন বদ্ধ হ'য়ে গভীর সুখের অশ্রু ত্যাগ করতে করতে সেই পূর্ণচন্দ্রের তলায় অতন্দ্র হ'য়ে সারারাত বসে রইল।

*　　　*　　　*　　　*

প্রতিপদের রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে তারা দেখলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পূবের নীল সাগর সোনার রশি দিয়ে মথন করে দিগ্‌বালারা যেন একটা প্রকাণ্ড কৌস্তুভমণিকে টেনে তুলছে। তার সাদা ধব্‌ধবে আলোয় চারিদিক একেবারে দিনের মত পরিপূর্ণ। সেই ঝক্‌ঝকে পরিস্কার আলোয় পৃথিবীর প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিষেরও আলাদা আলাদা চেহারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা এক একবার পরস্পরের পানে ও একটা নূতন রকম দৃষ্টিতে চাইছিল। হঠাৎ একজন আর একজনকে বলে উঠ্‌ল "ওগো তুমিতো আমি নই, আমিই আমি, তুমিই তুমি।" সে উত্তর দিল "তা কেন হবে! তুমিই তুমি, আমিই তো আমি"! তর্কের যদিও স্থির মীমাংসা কিছু হলনা তবু তারা মুখভার করে একটু সরে সরে বস্‌ল এবং আপনার আপনার সুখটুকুকেও সেদিন অন্যের কাছ থেকে যেন একটু স্বতন্ত্র করেই নিয়ে একা একা বসে তা ভোগ করতে লাগল্‌। কিছুক্ষণ পরে আবার একজন অপরকে সম্বোধন করে বল্লে "আচ্ছা তুমি কি আমারি মত ঐ আলোর জিনিষটিকে এমনি দেখ্‌তে পাচ্চ"? "বা আমি যেমন দেখ্‌ছি তেমন হয়ত তুমিই দেখ্‌তে পাচ্চনা"।

দ্বিগুণ মুখ ভার করে প্রশ্নকর্ত্তা বল্‌লে, "দেখ্‌তে যদিও বা পাও, এই আলোর বিষয় আমি দিন দিন যতখানি বুঝ্‌ছি এবং যা যা অনুভব কর্‌ছি তা তুমি কখনই আন্দাজ কর্‌তে পারনা!" "বটে! কেন বল দেখি? বরং আমিই ঠিক্‌ তোমায় ঐকথা বল্‌তে পারি, জান?"

ঊষার স্ফূট আলোক যখন পশ্চিম আকাশের প্রকাণ্ড চাঁদটাকে বিবর্ণ ক'রে দিচ্চে তখনো তারা এই রকম বাদ প্রতিবাদ কর্‌তে কর্‌তে নিজের নিজের বাহু মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

দ্বিতীয়া তৃতীয়া! আপনাদের পৃথক জ্ঞান এবং তা নিয়ে এই রকম বিবাদ ক্রমশঃই তাদের বেড়ে চলে। যে আনন্দে এত দিন তারা ডুবেছিল বুদ্ধি এসে তাদের যে সম্পূর্ণই সে স্থান হতে ভ্রষ্ট করে দিলে তা তারা বুঝ্‌তেই পার্‌লে না। ক্রমে তাদের দুজনার মধ্যে এমন ভাব এল যে কেউ আর কারোকে ডেকে ভাল করে কথাই বলে না।

চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী! রাত্রি বেড়ে চলে চাঁদ বিলম্বে ওঠে, সে পূর্ণাঙ্গও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত; আলোক ছটাও ক্রমে ক্রমে একটু ক'রে ম্লান। দণ্ড কয়েক রাত্র কেটে গেলে তবে চন্দ্রোদয় হয়, এবং তারাও তখন জেগে উঠে পরস্পরের যথাসাধ্য দূরে দূরে ব'সে সুখ বা দুঃখ যা পায় একা একাই উপভোগ করে। তারা এই রকমে তাদের জীবনের চেতনা কালটি একা একা নূতন নূতন জিনিষের উপলব্ধি ও তাদের আলোচনায় কাটিয়ে দিয়ে ঊষায় চেয়ে ছাখে চাঁদ অস্ত যাবার আগেই ম্লান হতজ্যোতি হ'য়ে পড়্‌ছে! তাকে তখন দেখা গেলেও সে হতশ্রী চাঁদের আলো এসে আর তখন তাদের চোখে লাগে না, তাদের জীবন সে আলোর সাড়া জাগিয়ে রাখতে পারে না। তাদের শরীরেও যেন ঈষৎ ক্লিষ্টতা পূর্ব্বে যেমন তাদের তারুণ্য দিন দিন সরলতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত, এখন এ পূর্ণতম যৌবন যেন সহসা সে বুদ্ধির গতি থামিয়েছে এবং যেন ঐ চাঁদের মতই সে পূর্ণশক্তি একটু ক্ষয় প্রাপ্তই হয়েছে, এ সন্দেহ কি সত্য! কেন এমন বোধ হচ্চে! ভাবতে ভাবতে দুজনেই তেমনি স্বতন্ত্র ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সপ্তমীর পর অষ্টমীও কেটে গেল! আর সন্দেহ মাত্র নাই! অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হ'য়ে যাওয়ার পর জাগরিত হ'য়ে তারা বিমূঢ়ভাবে একবার আকাশের চাঁদের পানে এবং এক একবার এদিক্ ওদিক্ চাইতে চাইতেই রাতটুকু চলে যায়। তাদের জীবন মূলের জীবনি রস সেই চাঁদের আলো ও এই চাঁদ দেখার সুখ, তাও যেন ঐ চাঁদের মতই দিন দিন নিস্তেজ হয়েছে। তারা এখন ভাবে "এতদিন কিসে এত আনন্দ পেয়েছি, এত:সুখ বোধ করেছি! জগতে সুখের বা আনন্দের কি এমন আছে"। তবু তাদের এক একবার মনে পড়ে একদিন ছিল তা। জীবনের সেই অপূর্ণতার দিনে ঐ আনন্দানুভব শক্তিটি তাদের অতি প্রবলভাবেই ছিল। সেই ক্রম-পূর্ণতর চাঁদের আলোয় দুজনে দুজনকে নিজ হ'তে অভেদজ্ঞানে যে আনন্দ তারা উপভোগ করেছে একদিন সেই অজ্ঞানের আনন্দে তাদের সে সুখ কি তীব্রই ছিল। আজ জ্ঞান এসে তাদের সে বুদ্ধির অভাবকে সংশোধন করলেও প্রাণের এ অভাব তো সে ঘোচাতে পারছে না। প্রাণদুটি যে পরস্পরে কেবলি ভাবছে কোথায় গেল সেদিন? কোথায় তাকে আবার খুঁজে পাব।—এই রকমে তাদের কৃষ্ণা একাদশী পর্য্যন্ত কাট্‌ল। তারা বুঝতে পার্‌ছিল, ফুরিয়ে আসছে, এ আলোক জাত জীবন স্পন্দন তাদের ক্রমেই কমে আস্‌ছে। এখন কোথায় সে আনন্দ, এই জীবন স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গেই যা এমনি ক্ষীণ চাঁদের আলোয় স্ফূরিত হ'য়েছিল! পূর্ণতার দিনে যা আপনা হতে কেবলি তারা পেয়েছিল আজ তা আবার দিনে দিনে এমন ক'রে নিভ্‌ছে কেন? ওগো দাও, তাদের জীবনের জ্ঞান বুদ্ধি যত যা কিছু সব নিয়ে কেবল সেই আনন্দটি তাদের ফিরে দাও, তাহলে আর তারা কিছু চাইবে না। সেই টুকু বুকে নিয়ে এই ক্রমবর্দ্ধিত অন্ধকারময় ঘুমে তারা চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে

পড়্‌বে! এই শ্রান্ত অবসন্ন চোখ এই দুদণ্ডের জন্ম আর তারা খুল্‌তে চায় না।

দ্বাদশী ত্রয়োদশী। ফুরিয়ে এল! ঐ যে পূর্ব্ব আকাশের কোণে কলাদুই মাত্র অবশিষ্ট চাঁদ! এই দণ্ড দুয়েক মাত্র জীবনের সংজ্ঞাকাল আর কি তাকে তারা খুঁজে চিনে নিতে পার্‌বে? সেই শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রের কথা স্মরণ ক'রে আজ এই দুই দণ্ড জাগরিত প্রাণ তাদের আর্ত্ত মুমূর্ষু কণ্ঠে গাইলে "কোথায় গেলে তুমি পরম সুন্দর? কেন তোমায় আমরা হারালাম? তোমার আলোর সে আনন্দ জ্যোতি কেন দিন দিন এমন হ'য়ে নিভে গেল? সেই আনন্দালোকের অভাবে আজ আমরাও মুমূর্ষু। এ দেহ আর বইতে পারছি না, এচোখ আর খুলতেই চাচ্চে না! ওগো দাও, আজ তবে আমাদের এই গতপ্রায় জীবনকে আমাদের সেই আনন্দেভরা প্রথম জীবনের দিনের মত একবার উজ্জ্বল ক'রে দাও, একবার সেই আনন্দানুভব শক্তি ও সেই সুখকে ফিরে পেতে দাও, আমাদের কাছে এনে দাও তাকে, তাহলে আর আমাদের কোন অভাব থাক্‌বে না, নিশ্চিন্ত প্রাণে আমরা এই আগত অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়্‌ব।

রাত্রি প্রভাতকল্পা, পাণ্ডুমুখী ঊষার অস্ফুট আলোর সঙ্গে চতুর্দ্দশীর কলামাত্র অবশিষ্ট ক্ষীণতম চাঁদ যখন তাদের চোখের সম্মুখে এসে তাদের একবার একটু খানিমাত্র জাগালে তখন তারা চেয়ে দেখলে জগতের স্বাতন্ত্র্য রেখা নিঃশেষে মুছে গিয়েছে, সব—সব একাকার এবং তারা দুজনেও আগের মতই খুব কাছা কাছি হ'য়ে রয়েছে। সেই মৃদু প্রাণ স্পন্দনের সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে তারা দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে বল্লে "ভাই আমি,

আমি ভাই!" চতুর্দ্দশীর এককলা চাঁদ পূর্ব্ব আকাশের কানায়ই মিলিয়ে গেল।

অমাবস্যা প্রতিপদের গভীর অন্ধকারে পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ ভেদ-জ্ঞান হীন তারা যে গভীর সুখে ঘুমিয়েছিল তা থেকে মুহূর্ত্তমাত্রও জাগাবার জন্য চাঁদ সে দুদিন আকাশে উঠ্‌তেই সাহস করেনি।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

অগ্নিশুদ্ধি।

(১)

ব্রজগোপাল দাস জাতিতে চর্ম্মকার। কলিকাতায় বড় এক জুতার কারবার করিয়া সে বিস্তর টাকা রোজকার করিয়াছে। তাহার কারখানায় ও আফিসে এখন স্বজাতীয় বিজাতীয় এমন কি উচ্চজাতীয় বহুতব লোক খাটিতেছে। কিন্তু টাকা হইলেই কিছু সকল রকম সুখ আসে না। ব্রজগোপালেরও একটা বহুদিনকার পোষিত আশা কিছুতেই সফল হইতেছে না। "বি, জি, দাস এণ্ড কোং" এই নামটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সে কিছুতেই "বি, জি, দাস এণ্ড সন্স" এই নামে পরিণত করিতে পারিল না। অর্থাৎ মা লক্ষ্মী তাহাকে যতখানি কৃপা করিলেন মা ষষ্ঠী ততখানি করিলেন না। 'কোং' কিছুতেই 'সন্স' বা অন্ততঃপক্ষে 'সন্' এ পরিণত হইল না।

ব্রজগোপালের স্ত্রীও ধনী চর্ম্মকারের কন্যা। সে পিতৃগৃহ হইতে লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়কেই ব্রজগোপালের গৃহে লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু আনিতে পারে নাই কেবল পুত্রভাগ্য। উপরন্তু তাহার পিতৃগৃহের শিক্ষার গুণে এবং পতি-গৃহের সাহেবিয়ানায় পিতৃপিতামহের ঠাকুর দেবতার পূজা মানসাদি পরম অবজ্ঞায় দূর করিয়া দিয়াছিল। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে কখনও কালীঘাটে পূজাও পাঠায় নাই বা কোন ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার জন্যও যায় নাই। তাহাদের গৃহে সাহেব মেমের গতিবিধি ছিল বটে কিন্তু সে কেবল সন্ধ্যার সময় পরিপাটী আহারের বিষয় উপদেশ

দিবার জন্য। ব্রজগোপাল কোন ধর্ম্মই মানিত না, তাই সকল স্থানেই তার সমান অধিকার সকলের উপরই তার সাম্যভাব ছিল। সেই জন্য তার স্ত্রীও ঠিক সেই সাম্যভাবটিই বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিল। ইংরাজি খানা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা পুঁইশাক পর্য্যন্ত সমস্ত খাদ্যে তাহার সমান রুচী, বাংলা সাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শী সাড়ী মোগলাই পায়জামা এমন কি ইংরাজি গাউন কিছুতেই তাহার বাধিত না।

যাহাই হউক ব্রজগোপালের স্ত্রী বিদ্যাময়ী সবই পারিয়াছিল—পারে নাই কেবল একটী পুত্র প্রসব করিতে। তাই সে তাহার স্বামীর কাছে অনেকটা কুণ্ঠিত ভাবেই থাকিত। অবশেষে ষষ্ঠীর দয়াও পাওয়া গেল কিন্তু একটু পরিবর্ত্তিতাকারে অর্থাৎ পুত্র না হইয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। পিতা তখন "বি, জি, দাস এণ্ড ডটার" এই নূতন নাম দিলে তাহার কারবারের নামটা কিরূপ শুনায় অনেক প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাবিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই উহা 'এণ্ড সন্‌সের' মত ভাল শুনাইল না। কাজেই কারবার পূর্ব্ব নামেই চলিতে লাগিল।

কারবারের নাম পরিবর্ত্তিত করিতে পারুক আর নাই পারুক এই কন্যাটি তাহার পিতামাতার কাছে 'আকাল ফলের' মত উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের জীবনের মধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন এমন একটা নবতর আনন্দ নবতর উৎসাহ জাগাইয়া তুলিল যে, তাহারা ইহাকে লইয়া কি যে করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। কারখানার প্রধান কারিগর রামদীন বলিল, "আমি খুকির জন্য সোনার জুতা তৈরি করে দেব।" সাধু খানসামা বলিল, "সোনার জুতোয় খুকির লাগবে না? এমন জিনিষের জুতো চাই যা আলোর মত ঝকমক করবে অথচ তুলোর মত নরম হবে। আমি সাহেববাড়ী বরাত দিয়েছি।" রামদীন চটিয়া বলিল,

"কি ? এত বড় নামজাদা কারখানার লোক হয়ে তুমি বাইরে জুতো গড়াতে দিলে। আমি তিন দিনের মধ্যে উট পাখীর পালকে এমন জুতো তৈরি করব যা সাহেববাড়ীর বাবাও কখনও দেখেনি।"

এদিকে কন্যার পোষাক আশাক সম্বন্ধে কুঠী হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন ব্যবস্থা হইতে লাগিল এবং খাওয়া দাওয়া শোয়া বসার ব্যাপারে এই নবজাত কন্যা একেবারে এমনভাবে লালিত পালিত হইতে লাগিল যেন সে কোন রাজকন্যা বিধাতার হাত ফসকাইয়া এই চর্ম্মকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

মেয়েটী ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল—কিন্তু আদরের চাপেই হউক বা অতিমাত্র দৃষ্টির তাপেই হউক কিছুতেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারিল না। পাঁচ বৎসর ছ বৎসরের মধ্যে সে ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যত স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল সমস্তই ঘোড়দৌড় করিয়া বেড়াইয়া কেবল ক্লান্তি কেবল অবসন্নতাকেই সঙ্গে করিয়া আনিল। ভারতের সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাসের একীভূত স্বাস্থ্য তাহার উপর সর্দ্দী কাশীও বিরক্তিরূপে চাপিয়া বসিল এবং ১০।১২ বৎসর যাইতে না যাইতে এই ক্ষুদ্র বালিকাটী একটি পরম বিরক্তা অকালপক্ক নারীতে পরিণত হইল।

মেয়েটীর নাম রাখা হইয়াছিল লীলা—এবং নামের সহিত কার্য্যের সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত। যখন তাহার খেলিবার কথা তখন সে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিত, যখন তাহার পড়িবার কথা তখন সে 'কুঠি' হইতে বাহির হইয়া দাসীর সঙ্গে তাহার পিতার জুতার কারখানায় যাইয়া কারিগর, শিক্ষানবিস বালক যুবক বৃদ্ধসকলকেই এটা কি ওটা কেন ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। এমন কি সময়

সময় কতকগুলা প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ বর্ণমালা ইত্যাদি পুস্তক কিনিয়া শিক্ষানবিস বালক বা যুবক চর্ম্মকারগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া বানান মুখস্থ করাইবার জন্য মহাধুমধাম বসাইয়া দিত। ইহাতে এমন হইল যে প্রধান কারিগর রামদীন ভীত হইয়া হুকুমজারি করিল যে খুকিদিদির জন্য আগে হইতেই সকলকেই একটু আদটু পড়া করিয়া রাখিতে হইবে।

খাওয়া দাওয়ার বিষয়েও লীলার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম খাটিত না —তাহার যখন ইচ্ছা এবং যাহা ইচ্ছা খাইত এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হইলেই সেদিন অনেকের ভাগ্যেই অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

পিতা তাহার কার্য্যাবলি দেখিয়া হাসিতেন, মাতা শাসন করিতে গিয়া শাসিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। এই ইচ্ছাময়ী গম্ভীর প্রকৃতি মেয়েটী এই ব্যবসায়ীর গৃহের জমাখরচের মধ্যে একদম মূর্ত্তিমান গরমিল রূপে বাড়িতে লাগিল। কোন নিয়ম মানে না, কোন কার্য্যে আসে না, অথচ ইহাকে না হইলেও চলে না, এবং সে সর্ব্বদা বাঁকিয়াই রহিয়া যায়। তাহাকে সর্ব্বদা ঠিকের তলে রাখা চাই অথচ প্রত্যেক ঠিকটি তার নিজের ইচ্ছাধীন। তাই সে জমার ঘরেও নয় খরচের ঘরেও নয়।

এইভাবে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

২

সেদিন বৈকালে রামদীন মিস্ত্রী তাহার কারখানার প্রত্যেক কামরা ঘুরিয়া কারিগরগণের কার্য্য দেখিয়া লইতেছিল। কয়েকটী বালক শিক্ষানবিসের কার্য্যের তীব্র সমালোচনার সহিত তাহার হস্তও কাহারও

পৃষ্ঠে কাহারও কর্ণের উপর ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছিল, এমন সময় লীলা প্রবেশ করিয়া বলিল, "রামদীন আবার তুমি এমনি করে মারধর করছ? আমি তোমায় অত করে বুঝিয়ে দিলাম তবু বুঝবে না যে"—রামদীন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দিদিমণী আমি ত' বুঝি কিন্তু এরা বোঝে কৈ? এরা যে কেবল চড় চাপড় কানুটাই বোঝে।" দিদিমণী গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা দেখি কেমন না বোঝে; চলত তোমরা ঐ হলে।" রামদীন বিনীতস্বরে বলিল, "দিদিমণী, কাজগুলো বুঝে নিই, তার পর যা হয় করো।" লীলা শুনিল না—আর বালকেরা মৃদু মৃদু হাসিয়া তাহাদের হাতের কাজগুলা হত-বুদ্ধি রামদীনের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া লীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিল।

রামদীন তখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তাহার পার্শ্বস্থ আর একজনকে বলিল "না এমন করলে আর চলে না দেখ্‌ছি—বড় সাহেবও কিছু বলবেন না দিদিমণীও এই সব জায়গায় এসে গোল পাকাবে।"

রামদীন সে দিনের মত তাহার বাক্‌স বন্ধ করিয়া উঠিতেছে এমন সময় দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত আকৃতির মানুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামদীনের চক্ষু প্রথমেই যাহার উপর পতিত হইল তাহার বেশ বিন্যাস ও আকৃতি সমস্তই এই জুতার কারখানার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। সুন্দর সুগৌর মধ্যমাকৃতি গায়ে একখানা চাদর, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া চটী। সর্ব্বোপরি তাহার চক্ষু দুটী মুখের উপর এমনভাবে বসান যে শরীরের অন্য স্থানে দৃষ্টি পড়িবার পূর্ব্বে সেই দুইটা যন্ত্রই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। সেই অদ্ভুত বিস্তৃত চক্ষু দুটার মাঝখানে উঁচু একটা নাক এবং সেই নাকের বেঁকান ডগাটার পার্শ্বে পাতলা পাতলা নাকের পাতা দুইটা মাঝে মাঝে স্পন্দিত হইয়া মুখ খানার উপর একটা প্রচণ্ড

জাগ্রতভাবকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। মুখের উপর এক সঙ্গে যৌবনের পূর্ণাভাস অথচ বাল্যের তরুণতা প্রকাশমান। সূক্ষ্ম চাদরখানা যেন তাহার দেহের নগ্নকান্তিকে ঢাকিতে পারে নাই তেমনি দীন বেশে প্রবেশ করিয়া এই তরুণ মানুষটী তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যকেও লুকাইতে পারে নাই।

ইহার পশ্চাতে যে প্রবেশ করিল সে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দোহারা লম্বা শরীর, রংটী একেবারে কালো না হইলেও ময়লা। মাথায় হাল ফাসানের চুল কাটা, পায়ে এক জোড়া চিনাবাড়ীর জুতা, পরণে একখানা কাল পেড়ে ধূতি, গায়ে একটা সুতীর কালকোট—সর্ব্বোপরি এমন একটা কুণ্ঠিত লজ্জিত ভাব তাহার সর্ব্বশরীরে জড়ানো যাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে আশ্রয়প্রার্থী।

রামদীন মিস্ত্রি উভয়কে দেখিয়া লইয়া বলিল "কি চাই" ? প্রথমাগত যুবক বলিল "চাকরি।" রামদীন অবাক হইয়া গেল। চাকরি! এই লোক চাকরি করিবে? তথাপি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাকরি?"

"আমরা জুতো তৈরি শিখ্‌ব।"

"তোমরা দুজনেই?"

"হাঁ—আমরা দুজনেই।"

"তাহ'লে তোমরা এপ্রেন্‌টিসি চাও?"

যুবক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "যাই হোক আমরা এই কারখানায় কাজ করব,—রাস্তার ওপারের ঐ কারখানার লোকে আমাদের ব'লে দিলে এখানে কাজ শেখায় তাই এসেছি।" রামদীন উহাদের আপাদ-মস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তোমায় বাপু ভদ্র ঘরের

ছেলে ব'লে বোধ হচ্ছে, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে মুচীর কাজে আস্‌তে চাচ্ছ কেন ?"

"যে জন্যেই হোক কাজ পাব কি ?"

"সব কথা না বল্লে কি করে লোক রাখা যায় ?"

"কি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে কর ?"

"তোমার নাম কি ?"

"ভবতারণ"

"ভবতারণ কি"

"উপাধি জিজ্ঞাসা করছ ? উপাধি আমি বলব না।"

"কেন ? সে কি ?"

"আর কিছুই নয়, সে সব কথা বল্‌বার ইচ্ছা নেই। কাজ করব, যদি পছন্দ না হয় রেখো না। জাত গোত্র দিয়ে ত' আমি কাজ করব না—কাজ করব হাত দিয়ে।"

রামদীনের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে এমন কথা শুনে নাই। সে অবাক হইয়া একবার ভবতারণের দিকে চাহিয়া তারপর পার্শ্বস্থ কারিগর সর্ব্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "না বাপু নামধাম না বল্লে অচেনা লোককে কারখানায় জায়গা দেওয়া হয় না।"

ভবতারণ তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটা উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "সামান্য জুতো তৈরি কাজেও এত বাঁধাবাঁধি! যাক, তোমরা কাজ না দিতে পার কোথায় গেলে কাজ হতে পারে বলে দিতে পার ?"

রামদীন হাসিয়া বলিল, "অচেনা লোককে কেউ চিনিয়ে না দিলে কোনো জায়গায় তোমাদের কাজ হবে না। তোমরা কি এটুকু বুঝতে পার না ? তোমরা কোথাথেকে আসছ, কেউ তোমাদের এখানে চেনে

কি না, তোমাদের নামধাম জাত এসব যদি বল তাহ'লে হয়তো এখানেও কাজ হতে পারে।"

রামদীন এত কথা বলিত না—কিন্তু যুবকের অপূর্ব্ব চেহারাটাই তাহার সবচাইতে বড় পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া কাজের লোক রামদীনের মনটা তাহার দিকে একটু হেলিয়াছিল। ভবতারণ বলিল, "আমার নামধাম কিছুই বলব না কিন্তু এই জগবন্ধুর নামধাম যদি জানতে চাও ত' এ বোধ হয় বলতে পারে।" এইবার দ্বিতীয় যুবকটী অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার নাম জগবন্ধু দাস, জাতে চর্ম্মকার, বাড়ী আমার '—পুর' শান্তিপুরের কাছে। আমার বাবার নাম ৺নিতাই চরণ দাস। তিনি চামড়ার ব্যবসা করিতেন।"

রামদীন তাহার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি এর পূর্ব্বে জুতোর কাজ করেছ?"

"সামান্য সামান্য করিছি। কিন্তু এর আগে আমি যাত্রার দলে ঢুকে ছিলাম, সেইখান থেকে ছাড়িয়ে দিলে ব'লে এর সঙ্গে কলকাতায় এসিছি।"

"কেন?"

"জাত ব্যবসা শিখতে—যাত্রার দল আমার পোষাল না।"

"কেন?"

"সকলে মুচী চামার বলে ঠাট্টা করত—কষ্ট দিত।"

"তোমায় এখানে কেউ চেনে?"

"কে চিনিবে? বলিছি ত', আমরা এখানে নতুন এসিছি।"

রামদীন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু আজ যাও, কাল যা হয় বল্‌ব। কিন্তু ভবতারণ তোমার বিষয় কিছু বল্‌তে পারব না।"

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "ওর কাজ না হ'লে আমিও ত' থাকৃতে পার্‌ব না।"

"তবে তোমাদের কাজ হবে না!"

ভবতারণ ও জগবন্ধু ফিরিতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পশ্চাৎ হইতে বামাস্বরে কে বলিল "দাঁড়াও তোমরা।" উভয়েই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। রামদীন ব্যস্ত হইয়া বলিল "একি দিদিমণী, তুমি এখনও যাওনি।"

"না আমি দরজার পাশ থেকে এদের কথা শুন্‌ছিলাম, তুমি এদের কাজ দিলে না কেন?"

রামদীন প্রমাদ গণিল—লীলা যখন এই প্রশ্ন করিয়াছে, তখনই সে বুঝিয়াছে, যে অপরিচিত যুবকদ্বয়কে স্থান দিতে সে বাধ্য। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "অচেনা লোক।"

"কিন্তু গরীব লোক—ভারী ত' জুতা তৈরির কাজ, এতে এত বাঁধাবাঁধি কেন? তুমি ওদের চাকরী দাও।" "বড় সাহেব শুন্‌লে—" "কিছু বল্‌বে না,—এ সব ত' তুমিই কর। এ খবর তাঁর কাছে পৌছুবেই না, তুমি কেবল এদের সন্দেহ কর্‌ছ বলে মিছে ভয় পাচ্ছ।"

"আচ্ছা তা হ'লে কাল্‌কে যা হয় করা যাবে! আজ—"

"আজ সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে, এরা এখানে নতুন এসেছে, রাতে কোথায় যাবে?"

"এখানেও ত' জায়গা নাই।"

এইবার ভবতারণ অগ্রসর হইয়া বলিল "আমরা এই চৌকি থানায় শুয়ে থাকৃব।" রামদীন বিরক্ত হইয়া বলিল, "কারাখনার মধ্যে লোককে শুতে দেওয়া হয় না"

ভবতারণ ফিরিয়া বলিল "চল জগুদা আমরা গিয়ে ইষ্টিসনে শুয়ে

থাকি গে।" লীলা রাগিয়া বলিল "দুটো লোকের শোবার জায়গা, বাবার এই এত বড় কারখানায় নেই? চল তোমরা কুঠিতে চল।" ভবতারণ হাসিয়া বলিল "কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? আমাদের সব রকম অভ্যেস আছে।"

"না তা কিছুতেই হবে না।"

"না হয় ভালই, চল জগুদা।"

তিনজনে বাহির হইয়া গেল। রামদীন মাথা চুলকাইয়া সর্ব্বেশ্বরকে বলিল "এসব কি হতে চল্ল?" সর্ব্বেশ্বর বিজ্ঞের মত বলিল "ভগবান জানেন।"

৩

কাজে লাগার পর হইতে প্রায় একবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ভবতারণ বিশেষতঃ জগবন্ধু তাহার পরিপাটি কার্য্যের দ্বারা রামদীন ও অন্যান্য কারিগরের মন পাইয়াছে। কিন্তু ভবতারণ তাহার অখণ্ড মনোযোগ লইয়া কার্য্য করে বটে কিন্তু কার্য্য তেমন হয় না। অথচ তাহাকে ভাল করিয়া বকিবারও জো নাই, কারণ বকিলে সে কোন কথার উত্তর দেয় না, নীরবে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া লয় ও বকুনি খায়। তারপর তিরস্কার শেষ হইলে এমনভাবে তিরস্কর্ত্তার দিকে চাহিয়া থাকে যাহাতে তাহার আর কোন কথা ভবতারণকে বলিবার থাকে না।

সমস্তদিন এইভাবে কাটে কিন্তু রাত্রি হইলে সমস্ত ছোকরার দল কারিগরের দল যখন যে যার স্থানে চলিয়া যায়, তখন ভবতারণ ও জগবন্ধু সেই কারখানা হাতার মধ্যে কুঠুরির সাম্‌নে বসিয়া মনের সাধে যাত্রার দলের গান সুরু করিয়া দেয়। ভবতারণ রন্ধনেও যেমন পটু বাঁশী

বাজাইতেও তেমনি; তাই ঘরের এক কোণে তাহাদের ছোট হাঁড়ীটায় রন্ধন চড়াইয়া আসিয়া কারখানার একটি পুরাতন কলের ভাঙ্গা চাকার উপর বসিয়া তারপর জগবন্ধু তাহার হাজার বার গাওয়া গান গুলা বন্ধুর কাণে ঢালিয়ে দিতে থাকে।

তাহাদের এই গান গাওয়ার দুর্ণাম কারখানায় প্রবেশ করা অবধি রটিয়াছিল। কারখানার হাতায় আরও দুএকটা কর্ম্মকার-নন্দন বাসা পাইয়াছিল। যাহাদের বাসা কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নয় তাহাদের জন্য কোম্পানী ঐ হাতার মধ্যেই ছোট ছোট কুঠারি করিয়া দিয়াছিল। সেই সব কুঠারির অধিবাসিগণ এই দুই বন্ধুর নৈশ সঙ্গীতের অধিবেশনে অবসরক্রমে আসিয়া যোগ দিত বটে কিন্তু প্রভাত হইলে তাহাদের নামে অভিযোগ করিতেও ছাড়িত না।

একটা ল্যাম্প জ্বালিয়া ভাতের হাঁড়ীটা চড়াইয়া দিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে ভবতারণ বলিল "জগা দা রোজ ভাবি এতটাই পারিলাম আর তোমার হাতে ভাত খেতে পারব না? কিন্তু কিছুতেই তা' পেরে উঠছি না কেন বলত?" জগবন্ধু একটা ছোট ল্যাম্পের সম্মুখে পাটী পাড়িয়া বসিয়া কি একখানা বই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। সে মুখ না তুলিয়া বলিল, "সব পার্‌ব কিন্তু আমিত ঐটিই পার্‌ব না। ঐটী যে দিন কর্‌ব সে দিন আমার পাপের ভরা পূর্ণ হবে, আমি নরকে যেতে পাব্‌ব না।" ভবতারণ ভাত চড়াইয়া দিয়া জগবন্ধুর নিকটে আসিয়া বলিল, "আঃ রোজই তোমার Kite rises to the sky আর শুন্‌তে পারি না। জুতো সেলাই করতে এসে আবার চণ্ডিপাঠ কেন? আচ্ছা বিপদে পড়া গিয়েছে। রাখ তোমার বই।" জগবন্ধু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না ভাই আজ পড়া বল্‌তে পারিনি, দিদিমণি বড় বকেছেন।" "তুমি

যেমন বোকা তাই গাল খাও, কৈ আমার কাছে ত' কিছু ও বল্‌তে পারে না? পড়ব না বাস্, আমায় জুতো শেলাই করতে হবে, তাই করব। পড়াশুনা করতে ত' এখানে আসিনি? নাও, বই রাখ; তোমার kite বয়ের মধ্যেই থাক্‌বে, ও আকাশে উড়বে না। গান গাও দেখবে এখুনি দুজনেই আকাশে উড়বো। তামাক ধরিয়াছি দুটান দিয়ে গান ধর।"

ভবতারণ তাহার হুঁকাটা বাহিরে আনিয়া ধরান কলিকায় টান দিতে দিতে গান ধরিল। জগবন্ধু কিন্তু তথাপি গুণ গুণ স্বরে কে—আই—টি—ই, কাইট; কে—আই—টি—ই, কাইট, আবৃত্তি করিয়া চলিল।

এই বন্ধু দুইটি‚র পূর্ব্ব জীবনের কথা কিছু বলার দরকার। ভবতারণ ব্রাহ্মণের ছেলে। তাহার পিতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—শুধু নিষ্ঠাবান বলিলে তাঁহার বিষয় কিছুই বলা হয় না, তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। গ্রামের এক ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর তেজারতির তিনি মালিক। তাঁহার ভয়ে বাঘে গরুতে নাকি এক ঘাটে জল খায় এবং ইহার ওপর তিনি নিকট সমস্ত গ্রামের সমাজখানি মুঠার মধ্যে রাখিয়া গ্রামের নৈতিক চরিত্রটাকে এমন কড়া পাহারায় রাখিয়াছেন যে গ্রাম্য রূপসীদের ঘাটে বসিয়া গল্প করিবার মত একটা কথাও গ্রামের জীবনে দেখা দেয় না। গ্রামের মাতব্বরেরা পাশায় বসিয়া 'কচেবারো' 'পোয়া বারো' ছাড়া অন্য কোন আলোচ্য বিষয় খুঁজিয়া পান না।

এহেন লোকের ছেলে হইয়া ভবতারণ কিন্তু সমস্তই উল্টারকমের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। পড়াশুনা যে সে করিত না তাহা নহে কিন্তু তাহার সময় এবং অবসর সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। কেহ জোর করিয়া তাহাকে কার্য্য করাইতে পারিত না। তাহার পিতা যত তাহাকে নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন সে ততই দুষ্ট

এঁড়ের মত বিপথে চলিত। পূজা অর্চ্চনায় তাহার মন একেবারেই বসিত না—তাহার পিতা জোর করিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে ঠাকুরের নৈবিদ্যাদি সমস্তই আহার করিয়া ফেলিয়া পাঁচিল টপকাইয়া গ্রামের ত্রিপণ্ড ছেলেদের আখডায় গিয়া সারারাত্রি মাতামাতি করিত। পিতা মারধর করিলে চুপ করিয়া থাকিত, তারপর বাহিরে যাইয়া গান ধরিয়া দিত।

বর্ষায় গ্রামখানি ডুবিয়া গিয়াছে, চলা ফিরা বন্ধ। কিন্ত সকাল সন্ধ্যায় দেখা যাইত, একখানা মাডে চড়িয়া ভবতারণ একটা বাঁশের বাঁশী লইয়া গ্রামের প্রধান বাদ্যকর নিতাই দাসের বাড়ী অভিমুখে চলিয়াছে। সেখানে নাকি নিতাই তাহার জন্য নূতন একটা ঢোল তৈরি করিয়াছে।

গ্রামের যাত্রার দলের সে একজন প্রধান উদ্যোগী। আবার নবীন দাস কীর্ত্তনীয়া নাকি বলে যে ভবতারণের মত দোহার মেলা ভার। নিতাই মুচীর ছেলে জগবন্ধুর সঙ্গে সমানভাবে গাহিতে কেবল ভবতারণই পারে। বৈষ্ণবদের 'মচ্ছবে' ভবতারণ না আসিলে না গাহিলে না নাচিলে তাদের মহোৎসব তেমন জমে না। সমস্ত গ্রামখানার সমস্ত ছোট বড় কাজে ভবতারণের হাত থাকিবেই থাকিবে।

বাহিরে কাহারও সঙ্গে তাহার বিবাদ নাই, যত গোলমাল তাহার বাটীতে। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই ভবতারণের জন্য যতই তাহার পিতার কাছে অনুযোগের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন, তিনি ততই পুত্রকে নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া শেষে একদিন বলিলেন, "তুই যদি এমন করে নীচ চামার বৈষ্ণবদের সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবি তাহ'লে আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে না।" ভবতারণ হাসিতে হাসিতে নবীন বৈরাগীর বাটীতে গিয়া বলিল "নবীন কাকা, বাবা আমায় তাড়িয়ে দিল, তুমি আমায় জায়গা

দেবে ?” নবীন ব্যস্ত হইয়া বলিল, “সেকি, তুমি বামুনের ছেলে, তোমায় কোথায় জায়গা দেব ?—তাহ’লে কি আমার একখানা ইঁটও থাকবে ?”

“তাহ’লে কোথায় যাব ?”

“তোমার বাবার কাছেই যাও।”

ভবতারণ আবার তাহার পিতার নিকট চলিয়া গেল। তাহার মাতার বহুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছিল। গৃহে ছিলেন এক পিসীমা। তিনি তাঁহার দাদার ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন! তিনি লুকাইয়া তাহাকে আহার করাইয়া বলিলেন, “ভব তুই ঘরের মধ্যে চুপ করে থাক, অন্ততঃ আজকের দিনটা কোথাও যাস নে।” কে শোনে? আহারাদি সারিয়াই সে জগবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “জগাদা চল ঐ গ্রামে বাবুদের বাড়ী যে যাত্রা হচ্চে তাই শুনে আসি।” জগবন্ধুও সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। জগবন্ধু ও ভবতারণ যাইয়া আসরে যে দিকে নীচজাতীয় লোকেরা বসিয়া তন্ময়-ভাবে যাত্রা শুনিতেছিল তাহাদের মধ্যেই আসন গ্রহণ করিল। কিন্তু ভবতারণের পিতা সেই আসরে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়া ‘বাবু’দের দ্বারা সুপূজিত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। বাবুদের বাড়ীর সকলেই ভব-তারণকে চিনিত। তাহারা পিতা পুত্রকে একই আসরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বসিতে দেখিয়া কানাকানি করিতে লাগিল। ভবতারণের পিতার তীক্ষ্ণ চক্ষে কিছুই এড়াইল না। তিনি সেই আসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন “ভবতারণ।”

ভবতারণও হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “কি।”

বজ্র গম্ভীরস্বরে পিতা বলিলেন, “আজ হ’তে তুই আমার ত্যাজ্য পুত্র। হারামজাদা, মুচীর ছেলের সঙ্গে জুটে তুই চামার হয়ে গিয়েছিস্। আর

ঠাকুর বাড়ীতে উঠ্‌বার মত তোর শক্তি নেই। তুই পৈতা ফেলে দে—দে এখুনি।" ভবতারণ একবার বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া তারপর গায়ের চাদরখানা খুলিয়া ফেলিল। তারপর সর্ব্বজন সমক্ষে পৈতাখানা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মুখর সভা ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছিল। বাবুরা ব্রহ্মশাপের ভয়ে আর এই ভীষণ ঘটনায় অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিলেন। যাত্রার দলের লোকেরা উঠিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ভবতারণের পিতা জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "খবরদার, যাত্রা ভেঙ্গো না, গান চলুক। ওটাকে বের করে দাও।"

ভবতারণকে বাহির করিয়া দিতে হইল না। সে জগবন্ধুর হস্ত ধরিয়া বলিল "এস জগু দা আমি তোমাদের জাত হয়ে গিয়েছি। আর ভয় নেই।" জগবন্ধু ভয়ে কাঁপিতেছিল। কিন্তু ভবতারণ নির্ভীকভাবে তাহার পিতার দিকে চাহিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জগবন্ধুর পিতাও বৎসর খানেক পূর্ব্বে মরিয়াছিল তাহারও গৃহে কোনো বন্ধন ছিল না। সে তল্পি তল্পা গুটাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সম্বল ছিল সুকণ্ঠ। সেই সুকণ্ঠের জোরে সে শীঘ্রই এক যাত্রার দলে ঢুকিয়া পড়িল। ভবতারণও সেই সঙ্গে সেই দলে ভিড়িল। কিন্তু কোন এক স্থানে টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ জগবন্ধু যখন তাহার নীচ জাতীয়ত্বের দরুণ লাঞ্ছিত হইত তখন সে সিংহের মত তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিত। এরূপ অবস্থায় কোথাও তাহার স্থান হইল না। শেষে একদিন জগবন্ধুকে বলিল, "জগু দা কিছু ত' শেখনি, চল তোমার জাত ব্যবসা শিখবে। তাতে ত' কেউ তোমায় অপমান করতে পারবে না। চামার হলেই যে সে সকলের হেয়

একথা সত্য নয়—সকলের পা ছুঁতে হয় বলে সবাই তোমায় লাথি মারবে এ আমার সহ্য হয় না। আমি বামুনের ছেলে, আমি তোমার সঙ্গে জুতো তৈরি করে বুঝিয়ে দেব পায়ে হাত দিলেই মাথাটাকেও যে সবারই পায়ে লুটিয়ে দিতে হয় তা নয়।”

তার পর দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। কেবল, কি জানি কেন, ভবতারণ তাহার বন্ধুকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে ভবতারণের কোন পরিচয় কোথাও সে প্রকাশ করিবে না। আভিজাত্যের ঐটুকু অভিমান কিছুতেই যেন যাইতে চাহিল না।

৪

সে দিন বড়সাহেবের মেয়ে লীলাবতীর জন্মদিন। সর্দ্দার মিস্ত্রী রামদীন হুকুম দিয়াছিল যে, কারখানা হইতে তাঁহার জন্য একজোড়া অতি চমৎকার জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া তিনি সকলকে নিজে আসিয়া পড়াইয়া যান বলিয়া যে যাহা পারে তাঁহাকে কিছু কিছু উপহার দিতে হইবে। জগবন্ধু সারারাত্র জাগিয়া নানা প্রকার ফুলের কামদার একজোড়া জুতা প্রস্তুত করিয়াছে। কিন্তু ভবতারণ কিছুই করে নাই। তাহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বলিল, “আমি ওঁর কাছে কিছু শিখিনি, আমি আবার কি দেব?” কোন সহযোগী তাহাতে উত্তর করিয়াছিল “ভব একটা গান শুনিয়ে দিও।” ভবতারণ হাসিয়া বলিয়াছিল “আমার গান যে সে লোকে বুঝ্‌তে পারে না।”

বেলা ১১টার সময় অফিসের সমস্ত লোকদিগের সহিত দেখা করিয়া B. G. Das কোম্পানির বড় সাহেব তাঁহার কন্যা লীলার সহিত হাস্যমুখে কারখানায় প্রবেশ করিলেন। তারপর সমবেত সমস্ত কারিগর,

ছোকরা, মিস্ত্রী ইত্যাদির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। লীলাবতী হাসিতে হাসিতে সকলের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ ভৃত্যের চুপ্‌ড়িতে দিতেছিলেন এবং সকলকেই ছোট ছোট ফুলের তোড়া বিতরণ করিতেছিলেন। জগবন্ধু কুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়া তাহার জুতা জোড়া লইয়া লীলার পায়ের নিকট বসিল, ইচ্ছা স্বহস্তে উহা পরাইয়া দেয়। লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "থাক, থাক, আমায় দাও আমি বাড়ী গিয়ে পরব।" জগবন্ধু কাতরভাবে একবার উর্দ্ধ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "দয়া করে একবার দেখতে দেন ঠিক হয়েছে কিনা।" লীলা লজ্জিত হইয়া একখানা টুলে বসিয়া নিজের জুতা জোড়া খুলিয়া জগবন্ধুর জুতা পরিল। তারপর হাসিয়া বলিল, "আজ আমাদের কুঠিতে তোমাদের নেমন্তন্ন—যেও।" জগবন্ধু আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিল।

ভবতারণ দূর হইতে সমস্তই দেখিতেছিল। লীলা ও তাহার পিতা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে তাড়াতাড়ি একটা লাষ্টের উপর বাটালি ঠুকিতে লাগিল। ব্রজগোপাল তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি হে তুমি কছু দিলে না?" ভবতারণ মুখ না তুলিয়া বলিল, "আমিত' কিছুই শিখিনি।" ব্রজগোপাল বুঝিতে না পারিয়া, রামদীনকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"একে কি নতুন বাহাল করেছ?"

"আজ্ঞে না—এ ত প্রায় বছরখানেক হল এখানে ঢুকেছে।"

"তবে যে বলছে কিছুই শেখেনি?"

"না না বেশ জুতো তৈরি করে।"

ভবতারণ নিজেই বুঝাইয়া বলিল, "যে জন্যে সবাই উপহার দিচ্ছে তারই কথা বল্‌ছি।"

ব্রজগোপাল সাশ্চর্য্যে বলিল, "কি জন্যে সবাই উপহার দিচ্ছে।"

"উনি এদের লেখাপড়া শিখুতে আসেন, তাই।"

"তুমি লেখাপড়া শেখনা কেন?"

"জুতো তৈরিতে লেখাপড়ার কি দরকার?"

"দরকার নেই বটে কিন্তু শিখ্‌লে হানি কি?"

"লেখাপড়া শিখ্‌লে জুতো তৈরি কর্‌তে মন চাইবে কেন?"

ব্রজগোপাল হাসিয়া চারিদিকে চাহিলেন তারপর বলিলেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

"ভবতারণ"

"ভবতারণ কি?"

"তা বলব না।"

"কেন? সে কথা লুকুচ্ছ কেন?

লীলা এইবার কথা কহিল। "বাবা সেদিন যার কথা বলছিলাম এ সেই। আমার সন্দেহ হয় এ কোন ভদ্রলোকের ছেলে"। ভবতারণ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন আপনারা বৃথা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? আমি ভদ্রলোকই হই—আর যেই হই —চোর ডাকাত নই। আমায় সন্দেহ করবার বা আমার জাত নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করবার, কারু কোন অধিকার নেই।"

লীলা বিস্মিত সরিয়া আসিল। ব্রজগোপাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি রকম জানোয়ার! রামদীন—" রামদীন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হুজুর ঐ এক রকমের লোক! ওকে জাতের কথা জিজ্ঞাসা করলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেই ও ঐ রকম করে। নৈলে আর সব ভাল।" ব্রজগোপাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চল্ লীলা, নেমন্তন্ন করা ত

হয়েছে।” লীলা বিষন্নমুখে বলিল, “সবাইকে হয়েছে একেই কেবল—”

“থাক্, ওকে আর নেমন্তন্ন করতে হবে না।”

লীলা একবার কাতর দৃষ্টিতে ভবতারণের দিকে চাহিয়া পিতাকে বলিল, “আজকের দিনে রাগ করে কি হবে?” জগবন্ধু নিকটেই ছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, “ওকে নেমন্তন্ন করবেন না—ও অন্য কারও হাতে খায় না। নিজে রেঁধে খায়।” ভবতারণ কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “আপনার নেমন্তন্ন নিলাম। আমারও একটা জিনিষ দেবার আছে তাই আপনাকে দিয়ে আসব।” লীলা জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল। ভবতারণ বলিল “আমি একটু গান করতে পারি—থিয়েটারের মত ভাল নয় আর জগদার মতও নয়, তবু আমার নিজের ঐ টুকুই সর্ব্বস্ব, তাই আপনাকে শুনিয়ে আসব। ভাল লাগে শুনবেন—নইলে—”

ব্রজগোপাল বাবু এইবার হাসিয়া উঠিয়া রামদীনকে বলিলেন “ছেলেটা একটু পাগলা ধরণের। বেশ বাপু তাই যেও, আজকের দিন আমাদের ওপর রেগে থেকো না।” লীলাও আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু এই ব্যাপারে লীলা ও তাহার মাতার সহিত এমন কি ব্রজ-গোপাল দাসের সহিতও ভবতারণের আলাপ জমিয়া উঠিল। লীলার মাতা এই অপূর্ব্ব দর্শন যুবককে দেখিয়া কেমন মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এবং লীলাও তাহার মাধ্যাহ্নিক লোকশিক্ষার কার্য্যে অধিকতর মনোযোগের সহিত লাগিয়া গেল। এমন কি একদিন সে প্রস্তাব করিয়া বসিল, যে, ভবতারণকে কারখানা হইতে ছাড়াইয়া কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক। ভবতারণ এই প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সে

রাত্রে তাহার খাটিয়ায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল। জগবন্ধু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—

"তা এতে হাসবার এত কি আছে?"

"কি ভয়ঙ্কর! তবে হাসব কোন কথায়?"

"উনি তোমার ভালইত' চাইছেন।"

"এ ভাল ত বাড়ীতে বাবার কাছে থাকলেও অভাব হত না। আমি যে তোমার সঙ্গে এখানে এলাম তা কি পড়াশুনা শিখতে? তার চাইতে এক কাজ বলি শোনো—আমি কাল দিদিমণিকে বলব, যে, তোমায় তিনি ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন। তারপর, পড়াশুনা শিখে তুমি বড়লোক হতে পারবে।"

"আর তুমি?"

"আমার কথা আমি ভাবব অথন, তুমি তোমার কথা ভাব।"

জগবন্ধু চুপ করিয়া রহিল। ভবতারণ মুখের কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "জগাদা—তুমি ক'দিন কেমন যেন হয়ে গিয়েছ। সে হবে না ভাই, এই সব নতুন লোক ঢুকে তোমায় যে আমার পর করে দেবে তা হবে না। তুমি গান ধর—আমরা যেমন ছিলাম তাই থাকব। ও বড়লোক টড়লোক হওয়া আমাদের হবে না।"

ভবতারণ উঠিয়া আলো জ্বালিয়া তাহার বাঁশী বাহির করিল। তারপর অতি করুণসুরে ঝিঁঝিটে তান ধরিল।

বাজাইতে বাজাইতে ভবতারণ হঠাৎ অনুভব করিল জগবন্ধু কাঁদিতেছে। সে তাড়াতাড়ি বাঁশীটি রাখিয়া দিয়া জগবন্ধুর খাটিয়ায় আসিয়া বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কেউ বিচ্ছেদ করতে পারবে না। যাত্রার দলের ছোকরার

মত আমরা এক গান একসঙ্গে গেয়ে আসছি, তাই আমরা চিরদিন গাইব। তুমি ছাড়লে আমি তান ধরব, আমি ছাড়লে তুমি ধরবে, কেমন ?”

জগবন্ধু এসব কথা বুঝিতে পারিল কিনা বলিতে পারিনা কিন্তু সে শান্ত হইল না। ভবতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

“তোমার কি হল জগুদা ? কাঁদছ কেন ?”

জগবন্ধু কিন্তু কিছুই বলিল না। ভবতারণ তখন বিরক্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার মনে একটা গভীর সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। তাই সে সেই দিন হইতে প্রতিদিন জগবন্ধুর মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। লীলার সম্মুখে জগবন্ধু যেন কেমন এক রকম হইয়া যায়। তাহার চক্ষু দিয়া এমন একটা গভীর পূজার ভাব লীলার প্রতি পদক্ষেপের উপর গিয়া পড়ে যাহা আর লুকান অসম্ভব। ভবতারণ তাহা লক্ষ্য করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। ভবতারণ হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া সেদিন তাহার একটু জ্বরের মতও হইয়াছিল। জগবন্ধু একটা ছাতামাথায় দিয়া কুঠির দিকে ঔষধ আনিতে যাইতেছে। ভবতারণ বারণ করিল, কিন্তু জগবন্ধু বলিল, “আজ সাত দিন থেকে তোমার সর্দ্দি সারছে না—দিদিমণি বলে দিয়েছেন ওষুধ আনতে।”

“সারাদিন আর সময় হল না এই সন্ধ্যের সময় চল্লে। জগাদা, ঐ লোকটা আমাদের মধ্যে এসে না পড়লে তুমি ত এমন হতে না।” জগবন্ধু কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। এমন সন্ধ্যায় কুঠিতে বসিয়া গান শুনাইবার লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না।

ভবতারণ একা সেই সেঁৎসেতে ঘরে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার মনে হইতেছিল সেই ছেলেবেলার কথা, যখন তাহার মাতা বাঁচিয়াছিলেন। তারপর কতদিন কতভাবে চলিয়া গিয়াছে। তারপর এই এক অদ্ভুত জীবনকে সে স্বয়ং বরণ করিয়া লইয়াছে।—ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত কিছুই সে ভাবিয়া দেখে নাই; শুধু ভালবাসিয়া শুধু জোর করিয়া সে এই নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র যুবককে আপনার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য একটু যাহা তাহার স্নেহের ভাণ্ডারে জমা হইয়াছে তাহাও থাকিতে চাহিতেছে না। তাহাও পরে কাড়িয়া লইতেছে। জগবন্ধু এখন আর পূর্ণভাবে তাহার নাই। যাহাকে অন্যায়, হীনতা ও অপমানের দ্বারা পীড়িত দেখিয়া সে নিজে সেই হীনতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই জগবন্ধুই আবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মোহে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! হায়!

ভবতারণের আর হাঁড়িতে চাউল ছাড়া হইল না। কম্পিতদেহে সে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু পিঠের তলে কি একটা শক্ত বস্তু অনুভব করিয়া সে তুলিয়া দেখিল সেটা তাহার বাঁশী। তখন পরম দুঃখে সেই পরম বন্ধুটীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। বাহিরে বৃষ্টি পতনের শব্দের মধ্যে সেই কাতর বংশীধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

৫

অপরিচ্ছন্নতার ও নীচকার্য্যের এবং সর্ব্বোপরি অস্বাস্থ্যকর স্থানের সমস্ত অস্বাস্থ্য ভবতারণের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহাকে শয্যায় শুয়াইল।

রামদীন সর্দার যতই হাঁকডাক করুক এই নবীন কারিগরটার উপর তাহার মমতা বসিয়া গিয়াছিল। তাই সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভবতারণ, তুমি হয় বাড়ী যাও, না হয় চল হাঁসপাতালে রেখে আসি। তুমিত' কিছুতেই কুঠিতে যাবে না, নইলে দিদিমণি কত করে বলে গেলেন।" ভবতারণ জগবন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "জগাদা আমায় হাঁসপাতালে নিয়ে চল।" জগবন্ধু সাশ্রুনয়নে বলিল, "তোমার সব থাকতে তুমি আমার জন্যে কাঙ্গাল হলে।" ভবতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিল "চুপ চুপ—তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে।" জগবন্ধু চুপ করিল বটে কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "চল হাঁসপাতালে যাই।" ভবতারণ অতি সাবধানে গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিল। তারপর গাড়ীখানা ধীরে ধীরে ব্রজগোপালের কুঠির গাড়ী-বারান্দার মধ্যে গিয়া থামিল। ভবতারণ মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল,—

"একি! এখানে আন্‌লে কেন?"

"এখানে যদি না আনতাম তাহ'লে আমি আর এখানে মুখ দেখাতে পারতাম না। ঐ দেখ উনি নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন।" ভবতারণের রুগ্ন মুখে হাসি দেখা দিল। সে অতিকষ্টে নামিতে নামিতে বলিল, "আপনাদের ব্যস্ত করবার ইচ্ছে আমার ছিল না।" লীলাবতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—জগবন্ধু তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে উপরে তুলিয়া একটা ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিল। ভবতারণ শয়ন করিয়া বলিল, "আমায় ত' এখানে আন্‌লেন এখন উপায়?" লীলাবতী কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন বলুন কে আপনার আছেন তাদের খবর দিয়ে আনাব, না হয় সেখানে পাঠিয়ে দেব।"

"আমার যিনি সব চাইতে আপনার তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন, কারণ আমার জাত গিয়েছে। তিনি আস্‌বেন না—কেউ আস্‌বেন না। আর আমার আপনার কেউ নাই।"

"তা হ'লে কে আপনার শুশ্রূষা কর্‌বে?"

"এই জগাদাই কর্‌বে। কতদিন ওর হাতে খাবার চেষ্টা করিছি, পারিনি, আজ অনুপায় হয়ে পারতেই হবে। কিন্তু আর কারু হাতে কিছু খাব না। আমি—" ভবতারণ চুপ করিল। লীলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "বলুন—"। ভবতারণ হাসিয়া বলিল, "আমি আপনার জুতোর কারখানার কারিগর—আমায় কেন 'আপনি' আজ্ঞে করেন?"

লীলার সমস্ত মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে যে অনেকদিন হইতেই বুঝিয়াছে, যে, ভবতারণ যাহা করিতেছে যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে উহার সে কত অনুপযুক্ত। তারপর ক্রমশঃ কতক জগবন্ধুর নিকট শুনিয়া কতক বা অনুভব করিয়া এই অপরিচিতের কতখানি পরিচয় যে সে প্রাণে প্রাণে অনুভব ও অনুমান করিয়াছিল তাহা ভবতারণ কি বুঝিবে। তাই সে কতবার ভবতারণকে ঐ হীন কার্য্য হইতে সরাইয়া আনিয়া ভাল কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পাছে তাহার পিতামাতা কি মনে করেন তাই জোর করিয়া কিছু করিতে পারে নাই। তাহার পিতামাতা ভবতারণকে চর্ম্মকারের ছেলে বলিয়া জানেন। কিন্তু কি জানি কেন লীলার কিছুতেই তাহা বিশ্বাস হইত না। তাহার কল্পনাপ্রবণ তরুণ মনের মধ্যে এই অপূর্ব্ব চরিত্রের যুবকটী কত না অপূর্ব্ব মায়া-লোক সৃষ্টি করিত। কোন দেশের কোন স্নেহের সংসার হইতে এই পলাতক প্রাণীটী লুকাইয়া চলিয়া আসিয়া এখানে গুপ্তভাবে আছে। হয়তো তাহার জন্য কতনা বুকফাটা অশ্রু,

কত ফিরিয়া-আসিবার-জন্য-সাধাসাধি জমা হইয়া রহিয়াছে। লীলা এই সব কথা ভাবিত, আর সময় অসময়ে যখন তখন নানা উপায়ে ভবতারণের খোঁজ লইয়া তাহার কষ্টের অসুবিধার লাঘব করিবার চেষ্টা কবিত। ক্রমশঃ এই অপূর্ব্ব যুবকের অদ্ভুত ধরণ ধারণ তাহার তরুণ হৃদয়টীকে এমন একটা মোহজালে ছাইয়া ফেলিতেছিল যে তাঁহার অন্ধ ভক্ত জগবন্ধুও যেন ক্রমশঃ তাহা টের পাইতেছিল। তাই ভবতারণ যখন প্রবলভাবে জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিল তখন লীলার অন্তরের গভীর কাতরতা তাহাব মুখের চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া জগবন্ধুকে বুঝাইয়া দিল যে ভবতারণকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে।

লীলার মাতা সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "তা বেশ করেছ লীলা, বেচারির মা বাপ নেই, আমাদেরই ত' স্বজাত, সেবা কর্‌লে শেষে ভালও হতে পারে, তারপর বাবুকে বলে একটা ভাল কাজ দিইয়ে দেব। তুমি ভেবোনা ভবতারণ তোমার ভালই হবে।"

ভবতারণের ত' সেই ভাবনায় ঘুম হইতেছিল না! সে কোন কথা বলিল না, কেবল একটু হাসিল। লীলা সে হাসির মর্ম্ম বুঝিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু সেও কোন কথা বলিল না।

কিছুদিন পরে লীলা হঠাৎ বলিয়া বসিল, তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে সে পুরী বেড়াইতে যাইবে। ব্রজগোপাল বলিলেন "সে বেশ কথা,—যাও।"

"কিন্তু আমি একা যাবনা—সেইত' আমার জন্য খরচ হবেই; এই বেচারিরও একটু ভাল হবে আপনি এরও যাবার বন্দোবস্ত করুন।"

"সে কি? তা কেমন করে হবে? গরীবের ছেলের তুমি এমন

করে মাথা খাচ্ছ কেন? না—না তাতে কাজ নেই। লোকে কি বলবে?"

"লোকে কিছু বলবে না। আপনার কত টাকা কতদিকে বাজে খরচ হচ্ছে এর জন্যে দু একশ'য় কিছু যাবে আস্‌বে না।—না হয় আমার নতুন পোষাকটা এবার নেবনা। আপনি ঠিকঠাক করে দেন বাবা।"

"এই মার্চ্চে সতীশ আস্‌ছে যে? সে বিলেত থেকে আস্‌বে আর তুমি এখানে থাক্‌বে না?"

কন্যার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই সতীশকে তাহার পিতাই খরচ দিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, এবং বিলাত হইতে ফিরিলেই কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার বড সাধের বি, জি, দাস এণ্ড কোং এর কো শব্দটা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্ততঃ Son-in-law করিবার উপায় করিবেন। দেশের স্বজাতীয়গণের মধ্যে তাঁহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন লীলা মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"মার্চ্চের পূর্ব্বে ফিরতেও ত' পারি?"

স্নেহ দুর্ব্বল পিতা কন্যাকে কখনও পারেন নাই, আজিও পারিলেন না। কিন্তু ভবতারণ সেই কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "এতটা দয়া সহ্য হবেনা আমাব, কেন আপনি এই গরীব কারিগরের মাথা খাচ্চেন?" লীলা ম্লান মুখে বলিল,—

"আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? আমার জন্যে যখন খরচ হচ্ছে তখন না হয়, আর একটু খরচা হলই।"

ভবতারণ গম্ভীরভাবে বলিল, "কেনই বা তা হবে? এই যে রাজার আদরে শুয়ে শুয়ে সেবা নিচ্ছি তাই বা কে পরের জন্যে করে? এই

কি আমার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়? আবার তার ওপর অত কেন? লোকে কি বলবে? সত্যি করে বলুন কেন এত করছেন? আমায় যা মনে করছেন সত্যি বলছি, আমি তা নই; আমি জগবন্ধুর মতই দীন দরিদ্র চামার হয়ে গিয়েছি। আমি আগে যা ছিলাম তা আর নেই! জগবন্ধুর জন্যে যেটুকু পারেন তার চাইতে বেশী করলে লোকে আপনাকে দুষবে,—আমিও তা নিতে পারব না। আমি কোন রাজপুত্র নই—নাম লুকিয়ে আপনার আশ্রয়ে এসে পড়িনি। আমার এত স্নে[illegible] লাভ করলে শেষে কোন পরমার্থ লাভ হবে না—আমি যা তাই [illegible]।”

“তবু আপনি ভদ্রলোকের ছেলে এটা ত' সত্যি? এসব কাজ আপনার সইবে কেন? তাই, যদি আপনার সেবা ক'রে আমরা একটু সুখ পাই তাতে আপনার এত কষ্ট হচ্চে কেন? সত্যি বলছি—এতে আমাদের যে কত আনন্দ হচ্চে তা আপনি বুঝতে পারছেন না।”

ভবতারণ বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “আমার মত কত গরিবের ছেলে আপনাদের কারখানায় খাটছে, কৈ তাদের জন্য ত আপনি কিছু করছেন না? আমার গায়ে একটু ভদ্রলোকের গন্ধ পেয়ে আপনাদের দয়ার সাগর উথলে উঠল, আর ঐ যে জগবন্ধু যে আপনাদের স্বজাত, যে আপনার একটু হাসি মুখ দেখলে প্রাণ দিতে পারে কৈ তার জন্য ত' কিছু করতে দেখিনে? সে তো যে জুতোবরদার সেই জুতো-বরদারই রয়ে গেল? তার দিকে কৈ ফিরে ত' কেউ চায় না—আর একটা সন্দেহ, একটা 'হলেও হতে পারে' এরই জন্য আমি রাজপুত্রের মত আদর পাচ্ছি। আপনি জানেন না, এই অন্যায়ের জন্যেই আমি ঘর দুয়ার বাপ মা আত্মীয় স্বজন সব ছেড়েছি। আবার এখানে এসে যদি তাই হয়, যদি সেই অন্যায় অবিচার দেখি তা হ'লে তা সইব কেন?”

ভবতারণ মনে করিতেছিল যে এই সব কড়া কথায় লীলার রাগ হইবে, এবং হয় তাহাকে আবার কারখানায় পাঠাইয়া দিবে, না হয় জগবন্ধুর উপর অনুরূপ ব্যবহার করিবে, কিন্তু ফলে হইল উল্টা। ভবতারণের উপর ভক্তিতে লীলার সমস্ত তরুণ মন ভরিয়া উঠিল। সে অশ্রুসিক্ত চক্ষে অবনত মুখে বসিয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভবতারণ হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল, তুমি আমার জন্যে য জগবন্ধুর জন্যেও তা কর্‌তে পার্‌তে ?"

িয়া বিলা ‿তারণের দীপ্ত চক্ষের সম্মুখে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কে যেন জোর করিয়া বলাইল "না, সে আমার কে ?"

"সে তোমার কেউ নয় ? আমিই বা তোমার কে ? চিরদিন সব জায়গাতেই এই অবিচার ? বাড়ীতে যখন ছিলাম তখনও দেখতাম সুধু জাতের খাতিরে, বংশের খাতিরে, নামের খাতিরে, লোকে মান্য পেয়ে আস্‌ছে, আর জগবন্ধু নিতাই চামারের ছেলে হ'য়ে জন্মেছে বলে, কুকুর বেড়ালের মত লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। এখানে এই স্বজাতের মধ্যেও তাই, কেন ? তোমরা কি তাকে তোমাদের সমান করে নিতে পার না। কিসে তোমরা তার চেয়ে বড় হলে ? দু খানা বৈ পড়েছ বলে ? দু চার লাখ টাকা জমিয়েছ বলে ? ভদ্রতা ত' দুদিন চেষ্টা করিলেই আসে। জগবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছ ? সেকি রাস্তার ছোট লোকের মত নীচ ? সেকি ভদ্রলোকের মত কথা বল্‌তে জানে না ? আমাদের গ্রামের পণ্ডিতের মুখে শুনেছি জগবন্ধুর মত বুদ্ধি কারু নাই, সে তার সমবয়সী সবারই চাইতে বেশী শিখেছিল। তোমরা চেষ্টা করলে সে কি তোমাদের মত ঐ পুঁথি পড়া বিদ্যে শিখতে পারত না ? তবু তোমরা তাকে বিনা মাইনের চাকরেরও অধম করে রেখেছ ? কেন না সে

গরীব চামারের ছেলে, তার সব সইবে। আর আমি? আমার গায়ে কোথা হ'তে জানিনে ভদ্রলোকের একটু গন্ধ পেয়েছ, অমনি তোমাদের আদর যত্নের ধুম লেগে গিয়েছে। কেন তোমরা এত এক চোখো? যে চায় না তাকে এত দিচ্ছ, আর যে এর এতটুকু পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যাবে তাকে একটুও দিচ্ছ না? তবে কেন আমি এ হলাম? এই নীচ চামারের বৃত্তি নিয়ে আমার কি হ'ল? সবাই যখন নিজের ওপর দিকেই তাকাবে অন্য দিকে তাকাবে না তখন এ বৃত্তি নিয়ে আমার কি লাভ হ'ল? না আর তা হবে না আমি তোমাদের সেবা আর নেব না, আমায় বিদায় দাও।"

লীলা চুপ করিয়া সব শুনিল। এতগুলা নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িল বটে, কিন্তু একটী কথাও বলিতে পারিল না। শেষে উঠিয়া যাইবার সময় বলিল, "জগবন্ধুকে যদি তার উপযুক্ত সম্মান দেখাই তা হলে কি আপনি আমাদের সেবা নেবেন?"

"তা বল্‌তে পারিনে, সে কি বলে শুনি।" কিন্তু জগবন্ধু আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভবতারণ শেষে কি ভাবিয়া বলিল, "তোমার যদি এতে এত আনন্দ হয় তবে তাই হোক, আমি যাব।" তাহাই হইল—এক দৃষ্টি ভবতারণ অন্যকোন দিকে না চাহিয়া লীলার কার্য্যের নিজের মনের মত অর্থ ধরিয়া পুরী চলিয়া গেল। লীলার মনে যে অন্যকোন ভাব থাকিতে পারে, চামারের মেয়ে যে তাহার মত ব্রাহ্মণের ছেলেকেও নিজের সমান মনে করিয়া তাহাকে পাইবার আশা করিতে পারে এ কথা সে যেন জোর করিয়াই বুঝিল না। সেই কেবল দয়া করিয়া ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্বোন্নত অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া চামারের ছেলে জগবন্ধুকে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু আর কেহ যে নীচ চামারের কন্যা হইয়া তাহাকে পাইবার

আশা করিতে পারে এ ধারণা তাহার কিছুতেই হইল না। সে বুঝিল না, বা বুঝিতে চাহিল না, যে সে নিজের বাহাদুরীটাকেই বড় করিয়া দেখিতেছে, নিজেকে বাহ্যতঃ জোর করিয়া যতই নীচে নামাইয়া আনুক তাহার অন্তরের সেই গর্ব্বিত আভিজাত্য কিছুতেই অবনমিত হইতেছে না—অন্তরে অন্তরে সে আপনার জাত্যাভিমানের উন্নত শিখরেই সে বসিয়া আছে। যদি বাস্তবিক বিনীত সাম্যভাব তাহার অন্তরে পূর্ণভাবে জাগিত তাহা হইলে কি এই চর্ম্মকার বালিকার এতখানি সেবার প্রকৃত অর্থ সে করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তাহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিদ্যমান—তাই সে কাহারও হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিতে এখনও অপারগ, তাই সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না, যে চামারের মেয়ে তাহাকে ভালবাসিতে পারে। সে জোর করিয়া বাহিরের অশুচিকে বরণ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার অন্তরের মানুষটা তাহার অজ্ঞাতে তেমনি গর্ব্বিত উন্নত এবং স্বতন্ত্র হইয়াই বসিয়াছিল।

যাহাই হউক লীলা ও তাহার মাতার সঙ্গে, ভবতারণ ও জগবন্ধু পুরী চলিয়া গেল।

৬

পুরীর সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যার সময় ভবতারণ একা বালির উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে সুদূর প্রসারিত নীলাম্বুরাশি—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ তট-ভূমির উপর লাফাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—আবার তখনি ফিরিয়া যাইতেছে। পশ্চাতে একখানা মাঝারি ধরণের বাঙ্গলা। জগবন্ধু কি একটা কাজে বাজারে গিয়াছে তখনও ফিরে নাই। লীলা ও তাহার

মাতা সাজিয়া গুজিয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক ভবতারণ বড় একটা কোথাও বাহির হইত না, হয় তাহার ছোট ঘরটীতে শুইয়া থাকিত, না হয় সমুদ্রের ধারে একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। লীলা তাহাকে কিছুতেই বেড়াইতে লইয়া যাইতে পারিত না ;—অধিক অনুরোধ করিলে বলিত, "আপনি আমার জন্য অনেক কর্‌ছেন, আর ব্যস্ত হবেন না—আমি ভালই আছি।" সমুদ্রের ধারে বসিয়া বসিয়াই তাহার শরীর ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া লীলাও তাহাকে বেশী বিরক্ত করিত না, বিশেষতঃ তাহাকে লইয়া অধিক ব্যস্ত হইলে তাহার মাতা বিরক্ত হন, দেখিয়া সেও কিছু বলিতে পারিত না।

ভবতারণ বসিয়া বসিয়া হঠাৎ সমুদ্রের তরঙ্গের অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। সাগরের ঢেউ আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার পদতল ভিজাইয়া ফেনপুঞ্জ দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। সেও মাঝে মাঝে হস্ত দ্বারা বারিস্পর্শ করিয়া সেই তরঙ্গের আনন্দকে নিজের প্রাণের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় জগবন্ধু আসিয়া বলিল "ওকি করছ?"

"কিছু না—তোমার চাকরির কাজ হ'ল?"

জগবন্ধু হাসিয়া বলিল, "চাকরির কাজ না করলে তুমি এখানে থাকতে কি করে? যাদের খাচ্চ তাদের কাজ না করলে তারা কেন থাকতে দেবে?"

"নাই বা দিলে। জগুদা, ঢের ত' হ'ল এখন চল পালাই।"

"তুমি এখনও সারো নি যে?"

ভবতারণ দূর সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক করে বল দিখি,

একি কেবল আমার জন্যেই? আমার জন্যে যদি এত তাহ'লে বলছি—আর দরকার নেই, এইবার চল।"

জগবন্ধু লজ্জিত হইয়া বলিল "তবে কার জন্য?"

"যার জন্য, তাকি আমি জানিনে? কিন্তু যেখানে কোনো আশা নেই, যেখানে তুমি দীন দরিদ্র ভিখারী—যেখানে তুমি চাকর বাকরেরও অধম, সেখানে তোমার এত কষ্ট করা কেন? ঐ সমুদ্রের মত তুমি নিষ্ফল চেষ্টায় তার বুকের কিনারায় আঘাত করছ। কিন্তু হবেনা জগাদা—তুমি যে চাকর সেই চাকরই থেকে যাবে।"

জগবন্ধু বিবর্ণমুখে অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিল। ভবতারণ হঠাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "না—না—আর এ চলবেনা—মানুষের অপমান, এতখানি ভক্তির, এতখানি পূজার এত অপমান আমি সইতে পারব না। আমার বাবার যা সইতে পারিনি, এই গর্ব্বিত মেয়েমানুষের তা আমি সইতে পারব না। তোমার জন্যেই আমি এখানে আসতে স্বীকার করেছিলাম নইলে এ অপমান বামুনের-ছেলে হয়ে আমি সইতাম না। তুমি আমায় ত্যাগ করেছ, তা আমার সয়েছিল জগবন্ধু, কিন্তু যার জন্য আমি সব ছাড়লাম সেই তোমার এ অপমান আমি সইব না। তোমার মধ্যে আমি যা দেখিছি তা কেউ দেখবে না—তা তুমি রোজ জুতোই ঝাড় আর তার পা-ই মুছিয়ে দাও, তুমি তার কাছে যে জগা সেই জগাই থাকবে। চল এখান থেকে, আর নয় ত' বল—"

ভবতারণের মূর্ত্তি দেখিয়া জগবন্ধু একটু ভয় পাইয়া গেল। সে বলিল, "আর দু'দিন চুপ করে থাকলে ভাল হয়; তারপর একদিন বলে কয়ে চলে যাওয়া যাবে। তা'হলে কেউ কিছু মনে করতে পারবে না।"

"আর একদিনও নয়—জান কে আসছে? তোমার দেবীর যিনি

দেবতা তিনি, তাঁর ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য এখানে হাওয়া খেতে আসছেন। সইতে পারবে তাকে ?"

জগবন্ধু নতবদনে বলিল "সবই আমার সইবে।"

"তোমার সইতে পারে আমার সইবে না, আমি আজই যাব।" এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে লীলা আসিয়া বলিল, "একি এখনো তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে ? ঠাণ্ডা লাগবে যে তোমার ? চল এখনি—"

ভবতারণ তীরবৎ ফিরিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল ! লীলা পিছাইয়া গিয়া ভীত ভাবে জগবন্ধুর দিকে চাহিল। জগবন্ধু ব্যস্ত হইয়া বলিল "না না চলুন আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।" ভবতারণ লীলার নিকটস্থ হইয়া বলিল "ক্ষমা কর, জগবন্ধুকে কিছু ব'ল না। আমার আর এখানে মন টিকছে না, আমাদের আজই কলকাতা যাবার বন্দোবস্ত করে দাও।"

লীলা সজল চক্ষে বলিল, "আর দু'দিন থেকে—"

"না—আর একদিনও নয়, আর আমি সইতে পারছি না।"

অভিমানিনী লীলা এইবার ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "উপকারের প্রত্যুপকার যে এই ভাবে দিতে হয় তা জানতাম না। আর আমার কোন কথা বলবার নেই তোমাদের যা ইচ্ছে কর।" লীলা চলিয়া যায় দেখিয়া হঠাৎ জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, ওর ওপর রাগ করবেন না—ও চিরদিনই পাগল। আর, আমি ত' কিছুই করিনি—" লীলা আর তাহাকে কোন কথা বলবার অবসর দিল না—ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। ভবতারণ সে দৃষ্টি দেখিয়া জগবন্ধুর নিকটে আসিয়া বলিল, "ঠিক হয়েছে, ভগবান তোমার ঠিক শাস্তিই করেছেন। বুঝলে ত,' যে, মানুষ যতই শিখুক আর যতই টাকার ওপরে বসে থাকুক সে যা তাই থাকে ? তোমার এতখানি

ভক্তি কি কাজে এল? ছি ছি জগবন্ধু, কেন তুমি নিজেকে এত অপমান করছ? কিসে ও তোমার এত ওপরে? কতকগুলো টাকা আছে বলে? কতকগুলো বৈ পড়েছে বলে? ওর জন্যে বিলেত থেকে সাহেব আসছে বলে? তুমি যা, এই গর্ব্বিত মানুষটীও তাই—তবে কেন ওর জন্যে এত? তোমাকে একটু ভালবাসলে তোমাকে একটু টেনে তুল্‌লে ওর কোন ক্ষতি হ'ত না। আর আমি তোমার জন্য সব ছাড়লাম—নিজে বামুনের ছেলে সমাজের সব ওপরের ধাপে ছিলাম, সেখান থেকে নেমে এলাম, কিন্তু কি জন্যে? তোমার মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁর খবর পেয়েছিলাম বলেই ত'? কিন্তু তুমি দিনে দিনে এ কিসের মোহে সেই দেবতার অপমান করছ? না—আর তোমার কাছে আমি থাকতে পারব না। তুমি মানের কাছে টাকার কাছে লোভের কাছে নিজেকে বিক্রি করেছ—তবে কি জন্য আর আমি তোমার কাছে থাকব? কি জন্যে——"

জগবন্ধু আর শুনিতে পারিল না, বালির উপর বসিয়া পড়িল। ভবতারণ বলিল, "ওঠ চল—তোমার চাকরির সময় বয়ে যাচ্ছে।" জগবন্ধু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "তুমিও আমায় ত্যাগ করলে, ভবতারণ?"

"আমি ত্যাগ করিনি, তুমিই করেছ।"

"আর আমি তোমার কাছ ছাড়ব না, চল তুমি যেখানে যাবে সেইখানেই যাব।"

"তবে চল আজই গুছিয়ে নাও।"

"কিন্তু আমার কাছে যে একটীও টাকা নেই, কি করে যাব আমরা?"

"ভিখারীর আবার মান অপমান কি, টাকা চেয়ে নাও।"

"না তা পারব না।"

"তাহ'লে হেঁটেই যাব—ভিক্ষা করতে করতে যাব।"

জগবন্ধু উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তারপর যে ঘরটায় উভয়ে শয়ন করিত সেই ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল! ভবতারণ তাহা দেখিয়া সরিয়া বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

হলের মধ্যে লীলার মাতা একা বসিয়া কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার চাকরদের ঘরে আহারাদির জোগাড়ে সকলেই ব্যস্ত। শুক্লা দশমীর চন্দ্রকর সম্মুখস্থ সমুদ্রের তরঙ্গের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছিল। ভবতারণ একটু নির্জ্জনে গিয়া বসিবার জন্য আবার বাহির হইল কিন্তু বাহিরে ভয়ানক হাওয়া বলিয়া বাঙ্গলার পশ্চাৎ দিকে যে শিশু গাছের কেয়ারী করা বাঁধান রাস্তা ছিল সেই রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে বাহির রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু গেটের কাছে যাইতে না যাইতেই দেখিল, লীলা একটা গাছের তলে একটা বেঞ্চের হাতলে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। অতর্কিতে একেবারে তাহার নিকটে যাইয়া পড়ায় উভয়েই চমকিত হইল। এমন অবস্থায় এমন স্থানে এমন মুখামুখী ভাবে তাহারা কখনও দাঁড়ায় নাই।

লীলা উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ভবতারণ বলিল, "আমার একটা কথা আছে শুনবে?" লীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। "আমার একটা কথার উত্তর দাও, তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি। আমার সেই সন্দেহটা দূর করে দাও, বল তুমি কি কেবল নিঃস্বার্থ-ভাবে গরীবের উপকারের জন্য আমার মত সামান্য লোকের এতখানি যত্ন করেছ, না আর কিছু? আমার মনে হচ্চে, আমার যেন কোথায় একটা মস্ত ভুল হয়েছে—"

হঠাৎ লীলা মস্তক উন্নত করিয়া বলিল, "তোমার সব কথা কি আমায় কখনও বলেছ? তুমি যখন নিজের গোপন কথা আমায় বিশ্বাস করে বল নি, উপরন্তু সময়-অসময়ে অকারণে আঘাত করেছ আমিই বা তোমায় সব কথা বলব কেন?"

"আমার গোপন কথা আমার নিজের জন্য গোপন করিনি, আমার এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা আমায় আপনার বলে অস্বীকার করলেও আমি কিছুতেই তাঁদের প্রাণে প্রাণে অস্বীকার করতে পারিনি। তাঁদের প্রতি মান্য দেখিয়ে আমি আমার জাতের কথা সামাজিক অবস্থার কথা লুকিয়ে কেবল মানুষ হ'য়ে জাতধর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে মুচি হয়েছি। কিন্তু আজ শেষদিন তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি—আমার যা দেখেছ আমি তা নই। আমি বামুনের ছেলে—কিন্তু এক মুচির ছেলেকে ভালবাসতাম বলে তাকে আমার সমান ভাবতাম বলে, আর বামুনের যা কাজ তা করতাম না বলে বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন। আমিই দোষী—যা আমার চির-দিনের হক তাকে অস্বীকার করে যা নই তাই হবার চেষ্টা করেছি। মনে করতে চেষ্টা করতাম যে আমি খুব মস্ত একটা বাহাদুরি করেছি, দয়া করে নীচজাতের লোকেদের সঙ্গে সমানভাবে মিশে আমি বুঝি তাদের খুব দয়া করেছি; কিন্তু এখন বুঝেছি ভগবান সে অহঙ্কার আমার সইবেন কেন? বাইরে যতই চেষ্টা করি আমি কিছুতেই প্রাণে প্রাণে জগবন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারি নি। এটা আমার তত দোষ নয়—দোষ জগবন্ধুর নিজের। সে যে চাকর বাকরের জাত সেই চাকরের জাতই থেকে গিয়েছে; উপরন্তু যা তার পাবার নয় তারই আশায় নিজেও ঘুরে মরছে আমাকেও ঘোরাচ্চে। সে এত ভালবাসতে পারে তবু আমার মর্য্যাদা বুঝলে না—আমায় ত্যাগ করে সে যার চাইতে বাস্তবিক উঁচু

তারই পায়ের জুতোর তলে আপনার মনুষ্যত্বকে লুটিয়ে দিলে। এ আমারই অপমান—এ অপমান বামুনের ছেলে সইবে কেন? তুমি হয়তো না জেনেই তাকে অবজ্ঞা করছ তেমনি আমাকেও অপমান করছ, তবু, বল এ অপমান আমি সইব?"

লীলা একমনে সমস্তই শুনিল, তারপর গম্ভীর ভাবে বলিল, "এত মান অপমান জ্ঞান যদি তোমার থাকে তা'হলে বামুনের ছেলে হয়ে মুচি হতে এলে কেন?"

"সেইটেই আমার ভুল হয়েছিল—জানতাম না মুচি হওয়ার চাইতেও অধম অবস্থা আছে।"

"আছে বৈ কি, সেটা হচ্চে নিষ্ঠুর হওয়া। কি আমি করিছি যে তুমি নিজের মান অপমান দিয়ে আমায় আঘাত করছ?"

ভবতারণ বাধা দিয়া বলিল—

"তুমি কেন জগবন্ধুর পূজাকে অপমান করছ? সে কি অপরাধ করেছে যে, তাকে এত হীন মনে কর? সে তোমায় প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসে, কেন সে ভালবাসা তুমি নেবে না? তুমিও যা সেও তাই; তবু সে কেন তোমার দুয়ারে এমন কুকুরের মত পড়ে থাকে? তুমি তার স্বজাত হয়ে সুধু নিজের অবস্থার জন্য তাকে গরীব বলে ঘৃণা করছ—কুকুরের মত ব্যবহার করছ—"

"নিজেকে যে কুকুর মনে করে, যে নিজেকে কুকুর করে তোলে সে কুকুর না ত' কি হবে?"

"আর আমি? আমিত কিছু চাইনি তবু কেন আমার এত যত্ন করলে? বল?"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি? তুমি বাঘ ভালুকের চাইতেও

ভয়ানক, অন্ততঃ আমার পক্ষে তাই। তোমার দারিদ্র্যের ভান তোমার ভদ্রতার ভান, তোমার বড় থেকে ছোট হওয়ার ভান, সব ভানই তোমায় হিংস্র করেছে। তুমি কাউকে ভালবাস না, ভালবাস কেবল নিজের অহঙ্কারকে—তোমার নিজের বাহাদুরিকে। ব্রাহ্মণ—তুমি মনে করেছ, তোমার জাত্যাভিমান ত্যাগ করেছ, কিন্তু বাইরে পৈতে ফেলে দিলে মনের পৈতে তোমায় আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। তোমার দয়া নেই, মায়া নেই—আছে কেবল একটা মস্ত 'আমি'। তোমার যেখানে ইচ্ছে, যাও, তোমার ঐ দেবতার মত দেহের আবরণে যে হিংস্র জন্তু লুকিয়ে রেখেছ তারই দংশন সহ্য করগে। আমরা নীচ মুচি আমাদের নিয়ে খেলা করতে আর এস না।"

"কি সর্ব্বনাশ! থাম, যেও না, তুমি যা বল্লে যদি সত্য হয় তা হলে আমার এতদিনকার সব চেষ্টা বিফল হয়েছে! এর প্রায়শ্চিত্ত আমি করব—কিন্তু তুমি যা করেছ তার জন্য কি কিছু করবে না? ঐ যে হতভাগা মানুষটাকে তুমি এমন করে পোষা কুকুর করেছ তার কি মুক্তির কোন উপায় করবে না!"

"মুক্তি নিজের হাতে; কেউ কাউকে বাঁধেনা, আপনা হতে বাঁধা না পড়লে কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। নিষ্ঠুর, এতদিনকার এত চেষ্টায় তোমায় আমি বাঁধতে পেরেছি? তুমি আমায় গর্ব্বিত মনে করেছ, কিন্তু নিজে কি তা একবার ভেবে দেখেছ? মুচির মেয়ে কি মানুষ নয়? সে কি বামুনের চক্ষে এতই হেয়? তার প্রাণটা কিছুই নয়, আর তুমি যাকে দয়া করে একটু ভালবেসেছ সে মুচি হয়েও এত বড়। তোমার ঐ মুচি বন্ধুর জন্যে তুমি এতখানি ভাবছ আর আমি—"

লীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল।

ভবতারণ স্তম্ভিত হইয়া ভীত ভাবে সেই অন্ধকারে বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িল। সে একি করিয়া বসিয়াছে! লীলার উপর একি অত্যাচার করিয়াছে! তাহার এই অপরাধের ত' ক্ষমা নাই! সে তো কিছুতেই লীলাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহাদের সে যতই ভালবাসুক যতই আপনাকে ইহাদের সমান করিয়া ফেলুক তথাপি তাহার মন যে একেবারে আভিজাত্যে পরিপূর্ণ। জগবন্ধুকে সে যতই ভালবাসুক তবু সে প্রাণে প্রাণে জানে যে ইহার নাম ভালবাসা নয়—দয়া। সামান্য কারণে শুধু জেদের জন্য পিতার উপর, সমাজের উপর রাগ করিয়া সে এই দয়াটাকেই জোর করিয়া ভালবাসায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিপদেই সে বুঝিয়াছে যে ভিতরকার আভিজাত্য কিছুতেই যাইবার নয়। এই লীলার পিতা মাতা যখন কতকগুলা টাকার উপর বসিয়া অর্থের আভিজাত্যে তাহার স্বজাতীয়দের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে, তখন যে পুরুষানুক্রমিক আভিজাত্য তাহার শিরায় শিরায় বহিতেছে তাহাকে সে এক নিমেষে জোর করিয়া ত্যাগ করিবে কিরূপে? তাহার ত' সমস্তই বৃথা হইয়াছে—তাহার দৃষ্টান্তে ত' লীলা আর্থিক অবস্থার উচ্চতা হইতে নামিয়া জগবন্ধুকে ভালবাসিবে না, সমান বলিয়া মান্য করিবে না। আর জগবন্ধু! সেও ত' ভবতারণের মন্ত্রে মুগ্ধ হইল না—সেও ত' একটা স্ত্রীলোকের জন্য ব্রাহ্মণসন্তানের ভালবাসাকে উপেক্ষা করিল। তবে আর কেন? এ সমস্তই মিথ্যা—যে বড় হইয়াছে সে ছোট হইতে চায় না, আর যে চিরদিন উঁচুতেই আছে সে নামিয়া আসিলে তাহাকে কেহ আপনার করিয়া লইতে পারে না। তাহার জন্মের বিভিন্নতা তাহাকে চিরদিনই অপরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। নহিলে এই যাহা না চাহিয়া ভবতারণ পাইতেছে,

তাহাকে কৈ সে তো আদর করিয়া লইতে পারিতেছে না। সে তো মনে প্রাণে লীলার বা জগবন্ধুর সমান হইতে পারে নাই।

ভবতারণ ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাহার উপরে যে এই ক্রোধ তাহার ঠিকানা নাই, তবু সে ক্রুদ্ধ হইল। সে এই ক্রোধের তাড়নে তাহার পিতার নিকট হইতে তাহার ব্রাহ্মণ্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল।—আবার সেই যুক্তিহীন বিচারহীন প্রচণ্ড অভিমানই তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গেল।

জগবন্ধু অনেকক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া খোঁজা খুঁজি আরম্ভ করিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লীলার অভিমান তখন ভয়ে পরিণত হইয়াছে, সে ব্যস্ত হইয়া তাহার মাকে বলিল "কি হবে মা?"

"কি আবার হবে? সহরের মধ্যে কোথাও বেড়াচ্ছে বোধ হয়, তুই ব্যস্ত হ'স কেন? কোথাকার এক হতভাগাকে নিয়ে ভারী জ্বালাতনে পড়া গিয়েছে দেখছি।"

লীলা ভয়ে ভয়ে তাহার কক্ষে গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া বসিয়া রহিল—চাকরেরা সহর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল "কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।" জগবন্ধু তখন কাঁদিতে কাঁদিতে লীলার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "মা ওর কাছে যে একটীও পয়সা নেই, গায়ের কাপড়ও যে নিয়ে বেরোয় নি।" লীলার মাতা এইবার সত্য সত্যই চিন্তিত হইলেন, কারণ তিনি মনে মনে এই সুন্দর সুঠাম অসহায় যুবককে অনেকখানি স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার আগ্রহাতিশয্যে তিনিও ভবতারণকে কতকটা সন্তানের মতই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

লীলা যখন শুনিল যে রিক্তহস্তে প্রায় অনাবৃত দেহে ভবতারণ চলিয়া গিয়াছে তখন সে রাত্রের মত অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রভাতে উঠিয়াই স্বয়ং একটা ভৃত্য সঙ্গে লইয়া সহরে বাহির হইল। কিন্তু সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সংবাদ মিলিল না।

তারপর যখন সে গৃহে ফিরিল তখন দেখিল মিষ্টার সতীশচন্দ্র হাস্যমুখে তাহার জন্য বাঙ্গলার সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে।

৭

কি এক অজ্ঞাত কারণে সতীশের সহিত লীলার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ রাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং লীলার মাতাও একজন দাসী ও দারোয়ানকে পুরীতে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। লীলাই কেবল একক সমুদ্রতটে কাহার আশায় বসিয়া রহিল! কিন্তু মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল কেহই আসিল না। হঠাৎ লীলা একখানা পত্র পাইল,—পত্রখানা জগবন্ধু তাহাদের গ্রাম হইতে লিখিতেছে এবং সেই পত্র কলিকাতা হইতে ঠিকানা বদলি হইয়া পুরী পৌছিয়াছে।

জগবন্ধু লিখিয়াছে যে, "ভবতারণ সেই রাত্রে বাহির হইয়া পথে পথে কলিকাতার দিকেই আসিতেছিল। পথে জ্বরাক্রান্ত হইয়া ভুবনেশ্বরে পড়িয়াছিল। সেইখানে তাহার গ্রামের কোন তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হয়। তিনি উহাকে গ্রামে লইয়া আসিয়াছেন।

গ্রামে আসিয়া তাহার নিষ্ঠুর পিতা তাহাকে গৃহে লন নাই—তাহার থাকিবার জন্য গ্রামের দেবমন্দিরের দ্বারে একখানা ঘর করিয়া দিয়া একটা লোক ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহার পিতা তাহার তুষানলের

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, সে তাহাতেই স্বীকৃত ছিল, কিন্তু কয়েকজন ধরিয়া পড়িয়া তাহা হইতে তাহাকে বাঁচাইয়াছে।

আর তাহার জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। সে বাঁচিয়া আছে, তবে তুষানল করিতে পায় নাই বলিয়া সে তাহার শরীরের নানাস্থান পুড়াইয়া ক্ষত করিয়াছে। এত বড় জেদী অভিমানীর কপালে আরও যে কি দুঃখ আছে কে জানে?"

পত্র পড়িয়া লীলা অনেকক্ষণ টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিল। তার পর সেই দিনই পুরী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া সতীশের সহিত দেখা করিয়া বলিল, "আর আমার কোন আপত্তি নাই, বিয়ে হ'ক।" সতীশ বলিল "না।" লীলা বলিল, "কেন?" "যে ইচ্ছা করে এমন একটা পবিত্র বন্ধন ছিঁড়তে পারে, জুড়তে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। আমি তোমায় বিয়ে করতে পারব না।"

লীলা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বাঁচলাম।" তার পর দু'দিন পরে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একজন ঝি ও দারোয়ান সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর তীরভূমি জ্বলিতেছিল। জগবন্ধুদের গ্রামের ঘাটে সেদিন একখানা নূতন নৌকা আসিয়া লাগিল। তাহার আরোহী একটী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী নামিয়া দেখিল ঘাটে কয়েকজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। স্ত্রীলোকটী তাহাদের নিকটে গিয়া কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেই, একজন প্রৌঢ়া বলিল, "ঐ যে গো মন্দির দেখতে পাচ্ছ না, ঐ যে বাঁধান ঘাট।"

স্ত্রীলোকটী আবার নৌকায় উঠিল এবং নৌকা গিয়া সেই বাঁধা ঘাটে

লাগিল। স্ত্রীলোকটী ঘাটে নামিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বারে পৌছিয়া দেখিল মন্দিরের উঠানে বহুলোক আহারাদি করিতেছে। আজ যেন কি একটা মহোৎসব। তাহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মন্দিরের একজন দাসী নিকটে আসিয়া বলিল, "কে গা তুমি ?"

"অতিথি।"

"অতিথি ? এস এস বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

"আমি নীচ জাত, মুচির মেয়ে।"

"না বাছা ঠাট্টা করছ, তুমি কেন মুচির মেয়ে হতে যাবে ?"

"না মা আমি মুচির মেয়ে।"

"হলেই বা মুচির মেয়ে, উঠনে এস না। ওখানে ত' ছত্রিশ জাত মায়ের প্রসাদ পাচ্ছে।"

"আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাঁকে যদি ডেকে দাও—"

"কার সঙ্গে ?"

"ভবতারণ।"

"আ আমার কপাল—তাকে দেখতে এসেছ ? সে কি আর আছে !"

স্ত্রীলোকটী কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়াল ঠেস দিয়া দাড়াইয়া বলিল "কি হয়েছিল তাঁর ?"

"কিছু হয় নি বাছা সে বেঁচেই আছে—তবে বেঁচে মরা। বাবার আমাদের সব ভাল কিন্তু ছেলের ওপর কেন যে এত নির্দ্দয় কে জানে। তা এস বাছা তার কাছে চল।"

লীলা সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পার হইয়া আবার একটী দেউড়ী পার হইয়া বাহিরের একটা বাগানে উপস্থিত হইল। সেই

বাগানের একপার্শ্বে একটা ছোট চালাঘর দেখা যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটী তাহাই দেখাইয়া দিয়া বলিল, "যাও বাছা ঐখানে সে আছে আমার অনেক কাজ তুমি নিজে গিয়ে দেখা কর গে। তোমার খাওয়া দাওয়া ত হয় নি, আমি এখুনি প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে হয় তো হোম করছে, দূরে গিয়ে বস।" লীলাবতী অতি সন্তর্পণে নিকটে গিয়া দেখিল একখানা কুশাসনের উপর বসিয়া গেরুয়াবস্ত্রধারী ভবতারণ কি একখানা পুঁথি খুলিয়া মৃদুস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেছে। সম্মুখে একটা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত, সে একটা তাম্রকুণ্ড হইতে ঘৃত লইয়া হোম করিতেছে। লীলা স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ভবতারণ কোন কথা বলিল না কেবল একবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে বসিতে বলিল। লীলা সে ভূম্যাসনেই উপবেশন করিল।

ভবতারণ আপন মনে মন্ত্র পাঠ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে সঘৃত বিল্বপত্রাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার দেহের স্থানে স্থানে এখনও ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান—পৃষ্ঠদেশে, বক্ষে, করপুটে, বাহুতে, নানাস্থান এখনও তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আবৃত। লীলা নির্ণিমেষ লোচনে এই কৃচ্ছ্র ক্ষীণ ব্রাহ্মণ তনয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কখন্ ইঁহার যজ্ঞ শেষ হইবে কখন্ ইনি কথা কহিবেন।

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকটী আহার্য্য বস্তু লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "তুমি ত' বাছা ওখানে খেতে পাবে না—উঠনের এই কোণটায় বসে খেয়ে এঁটোটা গোবর দিয়ে ফেলো। আমি এখানে ঢেকে রেখে দিলাম—তুমি হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস—আর তোমার নৌকায় যদি কেউ থাকে তাকেও পাঠিয়ে দিও।" স্ত্রীলোকটী ভাত রাখিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইতেই লীলা বলিল "নৌকায় যারা আছে তারা নৌকাতেই রেঁধে খাবে।" স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে হোম শেষ করিয়া ভবতারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণের হোম বোধ হয় অন্য জাতকে দেখতে নেই, কিন্তু এখনও ত' আমি ব্রাহ্মণ হতে পারিনি, বাবা তাই সবারই সামনে প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোম করতে আদেশ দিয়েছেন। তাই তোমায় বসতে বলেছিলাম। যাক তুমি স্নান আহার কর—মায়ের প্রসাদ অমন করে ফেলে রাখতে নেই।" লীলা প্রণাম করিয়া বলিল, "মায়ের উঠানে এত লোক প্রসাদ পাচ্ছে আর তুমি এখনও অভুক্ত কেন?"

ভবতারণ হাসিল—কি মর্ম্মভেদী সেই হাসি! ভবতারণ বলিল "কি জান, আমার হয়েছে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা—আমি স্বর্গেও নেই মর্ত্তেও নেই। যত পাপ করেছি তাতে মায়ের উঠানেও আমার জায়গা নেই নিজের বাড়ীতেও নেই। তাই এই বাইরে পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমায় ব্রাহ্মণ হতেই হবে। ওসব কথা হবে, আগে তুমি স্নানাহার করে ঐ গাছতলাটায় ব'স। আমিও যা হয় কিছু মুখে দিই।"

"লীলা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমার দু'টো কথা ছিল।"

"সে কথা পরে হবে—আগে অতিথি সৎকার হ'ক।"

"তোমায় আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে ছিলাম"—

"তা না করলে কি আমার আর রক্ষে ছিল। তোমাদের আমি যে কষ্ট দিয়েছি তোমাদের ওপর আমি যে সব অন্যায় করেছি তারই জন্যে ত শাস্তি ভোগ করছি। জগবন্ধু এখনি আসবে, তুমি আহারাদি সেরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে ব'স। ভয় নেই—এখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। আমি সংসারের

পরিত্যক্ত। যে বড় অবস্থা থেকে পতিত তাকে ছোটরাও স্থান দেয় না। আমার কাছে আসে না। যখন আমি মনে করেছিলাম, যে, সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে একেবারে নাম গোত্রহীন কেবল-মানুষ হয়ে সবারই হয়ে যাব, তখন কত বড় যে ভুল করেছিলাম তা তোমায় বুঝুতে পারব না। একেবারে মুক্ত পুরুষ হওয়া বহু সাধনার বহু ভাগ্যের ফল—কি এত পুণ্য করেছি যে তা আমার ভাগ্যে হবে! তাই যা হারিয়েছি সেই সামাজিক অবস্থাটাকেই আবার কেঁদে কেটে চেয়ে নিতে হচ্চে। বাবা বলেছেন, নিত্য হোম করে একবেলা শুধু এক মুঠো চাল বেলপাতা আর ঘি দিয়ে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমিও তারই চেষ্টা করছি। নাও আর বেশী কথায় কাজ নেই, আমি ঐ কুঁড়েতে গিয়ে নিজের জোগাড় করে নিচ্ছি, তুমি মায়ের প্রসাদ পাও।"

ভবতারণ হাসিতে হাসিতে কুটীরে প্রবেশ করিল। লীলাও নদীতে নামিয়া স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল।

কুটীরের পার্শ্বে একটী বেলগাছ ছিল। তার তলাটী বেশ পরিষ্কৃত এবং গোময়লিপ্ত। তাহারি এক ধারে একখানা মাদুর ছিল। ভবতারণ বলিল, "ঐখান পেড়ে ব'স। লীলা তাহা করিল না—অমনই বসিল। ভবতারণ গম্ভীর ভাবে বলিল "অতিথিকে অতটা অপমান করতে পারিনে, তুমি যদি না ব'স তাহ'লে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" অগত্যা লীলা পাটীখানা টানিয়া লইল। ভবতারণ জিজ্ঞাসা করিল "আবার এলে কেন?"

লীলা একথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় জগবন্ধু কোথা হইতে এক বোঝা বেলের কাট স্কন্ধে লইয়া আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ভবতারণ বলিল, "জগু দা অমন করে

দাঁড়ালে যে, ওগুলো রেখে দিয়ে এস।" জগবন্ধু বোঝাটা এক পাশে ফেলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। ভবতারণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন অতিথি এসেছে, কি অভ্যর্থনা করবে কর ?"

"আবার কেন ?"

"তা আমি কি করে জানব ?"

লীলা নত-বদনে বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন আপনাদের এই ক্ষমাটুকুর জন্য আমি এসিছি। বুঝতে পেরেছি—এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ, তবু—"

লীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভবতারণ তাহার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া বৃথা, কারণ আমার তেমন কোন ক্ষতি তুমি করনি, তোমারই আমি ক্ষতি করিছি। আমার যেটুকু ক্ষতি হয়েছে তা আমি নিজের জীবন দিয়ে পুরিয়ে নেব—নিতেই হবে। তবে তুমি যার ক্ষতি করেছ, যদি তার ক্ষমা চেয়ে নিতে পার তা হ'লে বুঝব তুমি দেবতা। সব চাইতে জয় করা শক্ত আপনাকে—আমি তারই চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। আজ তোমাদের দুজনার সাক্ষাতেই বলছি আমার মনেও পাপ ঢুকেছে। যেদিন লীলা তোমায় পুরীতে এই আমার মত অধমের জন্য লুটিয়ে পড়তে দেখলাম, সেইদিন আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। আমি সব দিতে পেরেছিলাম কিন্তু তোমাদের পায়ে আমার অন্তরাত্মাকেই দিতে পারিনি। কিন্তু যেই তুমি সেটাকে চাইলে অমনি আমার চিরদিনের সংস্কার, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। কারণ এতদিন কেবল বাইরের জিনিষটাই বিলিয়ে আসছিলাম। নিজের ভিতরকার মানুষটাকে ত' কখন বিলিয়ে দিইনি। জগবন্ধুকে ভালবাসতাম, কিন্তু সে ভালবাসা আমার অহঙ্কারকে, আমার

বাহাদুরীকেই ভালবাসা। কিন্তু তুমি যখন আমায় চাইলে তখনই বুঝলাম কি দিতে হবে—কোন্ দান প্রকৃত দান, কোন্ বস্তু বিলুতে পারলে তবে আমি ঠিক নাম গোত্রহীন কেবল-মানুষ হতে পারব। তখন মনে হ'ল যে, না তা' ত' পারব না, আমি ত চামারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না,—করলে পাপ হবে, কারণ মনে মনে জাতের আর জন্মের অভিমান নিয়ে কি তোমায় পুরোপুরি ভালবাসতে পারব, এক হয়ে যেতে পারব? যখন তা পারব না, তখন এই যে আমার মন টলেছে, এতে পাপই হয়েছে অন্যায়ই হয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছি। আর তুমি যে আমার মনকে টলিয়েছিলে লীলা, তার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তোমায় যে দুঃখ দিয়েছি তার, আর যা আমার দ্বারা হবে না হতে পারে না তাকে মনে মনে চেয়ে যে পাপ অর্জ্জন করিছি তার শাস্তিও এই দেখ সমস্ত দেহে ধারণ করিছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর, দয়া করে আমায় ভুলে যাও। জাতি গোত্রকে ছাড়িয়ে কেবল-মানুষ যখন হতে পারলাম না তখন ব্রাহ্মণই আমায় হতে হবে। যখন সম্পূর্ণ নিজেকে ভুলে পরমহংসের মত হতে পারব না তখন বামুন হওয়া যে কি জিনিষ তা আমার মনকে বেশ করে বুঝতে হবে। ভিতরের ব্রাহ্মণ-অহঙ্কার যখন যায়নি তখন সত্যিকার ব্রাহ্মণ হওয়া যে কি তাই আমার অন্তরাত্মাকে শিখিয়ে দেব। চালাকি করে নামে বামুন থেকে তার বড় বাড় বেড়েছে—তাকে যত রকমে পারি আঘাত করে শিখিয়ে দেব বামুন হওয়া কি জিনিষ।"

লীলার চক্ষু হইতে ধারায় ধারায় মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছিল। ভবতারণ এই যেটুকু স্বীকার করিল তাহার জন্য সে মনে মনে ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া বলিল, "আমার চাওয়ার অধিক পাওয়া

হয়েছে।” তারপর জগবন্ধুর নিকট গিয়া বলিল, “আপনি যা চান আমি ততখানি দিতে পারব না—কিন্তু তা ছাড়া যদি অকৃত্রিম স্নেহের কোন মূল্য থাকে তাহ'লে আমার কাছ থেকে তা পাবেন। এখানে আপনারও স্থান নেই বুঝতে পারছেন ; তবে আর কেন এখানে রয়েছেন? আসুন আমার সঙ্গে, একদিন যেখানে আপনি অপমানিত হয়েছিলেন সেইখানে আপনাকে আদর করে ডেকে নিচ্ছি। উনি হারাণ' ব্রাহ্মণত্বের জন্ম তপস্যা করুন—আপনার ত' সে রকম কিছু হারায় নি? আপনি কেন বসে থাকবেন?”

জগবন্ধু একবার তাহার আজন্মের সাথীটীর দিকে চাহিল, তারপর তৃষিতভাবে লীলার দিকে চাহিয়া, নীরবে মাথা নাড়িল। ভবতারণ গম্ভীরভাবে বলিল, “যাও—সংসারে অনর্থক বসে থাকবার জন্ম কেউ আসে নি। আমি যখন তোমায় ত্যাগ করিছি তুমিই বা কেন আমায় ত্যাগ করছ না! আমারও কর্ত্তব্য আছে তোমারও কর্ত্তব্য আছে। তোমাকেও বড় হতে হবে—যাও ওঁর সঙ্গে। আর যদি কখনও আবার খাঁটী ব্রাহ্মণ হতে পারি তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে সুখী হব। এখন সকলে যেমন ত্যাগ করেছে তেমনি এই বিদ্রোহীকে তোমরাও ত্যাগ কর। যাও—তুমি।”

জগবন্ধু চলিয়া গেল। লীলা আর একবার ভবতারণকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া বলিল “ব্রাহ্মণ, প্রণাম কর্‌লাম, আশীর্ব্বাদ করলে না?”

“আশীর্ব্বাদ করি তোমার যেন কোন দুঃখ না থাকে।”

“দুঃখ ত' আর নেই ঠাকুর।”

“তবে আর কি আশীর্ব্বাদ করব?”

“আশীর্ব্বাদ কর পরজন্মে যেন তোমায় পাই”।

"দয়া কর লীলা।"

লীলার মুখ হাস্যে ও অশ্রুতে ভরিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে মন্দিরের উঠানে প্রবেশ করিয়া গড় হইয়া দেবী প্রণাম করিল। তারপর নৌকায় গিয়া উঠিল।

আর ভবতারণ তাড়াতাড়ি তাহার চুল্লি হইতে একখানা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া মুঠা করিয়া ধরিল। তারপর কিছুক্ষণ পরে তাহা ছাড়িয়া দিল। নদীর পরপারে যেখানে সূর্য্যদেব রক্ত-বদনে অস্ত যাইতেছিলেন সেই দিকে চাহিয়া বলিল :—

'পুনাতু মাম্ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং'

প্রত্যর্পণ

১

অতি সুন্দর উদ্যান। প্রস্ফুটিত পুষ্পের বর্ণচ্ছটায়—দৃশ্যে ও গন্ধে, কৃত্রিম নির্ঝরনিঃসৃত নীরধারার মৃদু ঝর্ঝর শব্দে এবং জলকণবাহী পুষ্প-সৌরভপূর্ণ বায়ুর স্পর্শে উদ্যানখানি গ্রীষ্মের প্রদোষে অতীব রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুবিন্যস্ত সুচারুদর্শন পুষ্পবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর পুত্তলিকা, বিশ্রামাসন ও লতামণ্ডপগুলির শোভাও অতুলনীয়। কিন্তু তিনটি সচল ও সজীব পুত্তলিকাই উদ্যানটির সর্ব্ব শোভার আধার ও প্রাণস্বরূপ হইয়া তাহার বক্ষে খেলা করিয়া তাহাকে মর্ত্ত্যে নন্দনের সৌন্দর্য্য দান করিতেছে। এই তিনটি জীবন্ত ভাস্কর্য্য চিত্র উদ্যানের বুকে এক সঙ্গে এক কালে প্রভাত অরুণের তরুণ দ্যুতি, চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় শুভ্র কিরণ এবং সন্ধ্যার ধূসর কান্তির উপরে অস্তগত তপনের ম্লান বিষাদারক্ত রশ্মিটুকুর শোভাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল।

উদ্যানখানি জমীদার রাধাকান্ত বাবুর। চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত বালিকাটি তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্য উত্তরাধিকারিণী—একমাত্র কন্যা কমলা। তরুণ অরুণসদৃশ কিশোর যুবকটি তাঁহার পালিত এবং ভাবী জামাতৃপদে মনোনীত অরুণকুমার এবং সান্ধ্য জ্যোতির সঙ্গে তুলনীয়া বালিকা নীহার রাধাকান্ত বাবুর আশ্রিতা আত্মীয়কন্যা।

কমলা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নীহার ও ছায়ার ন্যায়

তাহার ইচ্ছানুসারে চালিত হইতেছে। কমলা প্রস্তাব করিল, উভয়ে বাজী ধরিয়া ফুল তুলিতে আরম্ভ করা যাউক্, দেখা যাউক্ কাহার বেশী হয়। নীহার নীরবে তাহার কার্য্যের অনুসরণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ের চয়িত পুষ্পগুলি লইয়া তুলনার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কমলারই বেশী হইয়াছে। নীহার ক্ষীণ হাস্যের সহিত বলিল, "তোমারি জিৎ, দিদি!" কমলা নিজের আঁচলখানি তাহার আঁচলের উপরে উপুড় করিয়া সব ফুলগুলি নীহারের অঞ্চলে ঢালিয়া ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, "তোর জিৎ, সব ফুলগুলোই তোর! আয় এইবার দু'জনে যে কয়টা পারি মালা গাঁথি।" নীহার তাহার দুর্ব্বলপ্রকৃতিজাত ক্ষীণ ও বৈরাগ্য মাখা স্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে ত আমি পার্‌ব না, ভাই।"

"আমার যেটা বেশী হবে সেটা তোর।"

কমলা একাগ্রমনে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সহসা মুখ তুলিয়া দেখিল অরুণ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে, তাহার হস্তে একটা প্রকাণ্ড ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ। অরুণ এতক্ষণ একটা বেঞ্চে বসিয়া একখানা বহি পড়িতেছিল, কখন যে সে উঠিয়া ফুল তুলিয়া তাহা-দের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কমলা জানিতেও পারে নাই। চোখে চোখে একটা নীরব আনন্দের আদান প্রদান হইয়া গেল এবং কমলা তখন মুখের হাসিটুকুকে লুকাইবার জন্য ত্রস্তে মুখ নামাইল। কেহই কথা কহে না দেখিয়া অরুণ বলিল—"ইস্! একটা কথা কইবারও সময় নেই দেখ্‌ছি যে!" কমলা মুখ তুলিল না, কথাও কহিল না। নীহার হাসিমুখে চাহিল। সন্ধ্যার মলিন শ্রীতে একটা ক্ষীণ গোলাপী আলো যেন সহসা আকাশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চকিতে রাঙ্গাইয়া তুলিল। সে বলিল, "অরুণ দাদা কখন এলে? বোস।"

অরুণ কমলার পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পড়িয়া আদরমাখা কণ্ঠে বলিল, “দেখি, কেমন মালা হ’ল ?”

কমলা চাহিল না।

অরুণ বলিল, “দেখ, আমি কত বড় একটা গোলাপ এনেছি।”

নীহার সাগ্রহে বলিল “উঃ কত মস্ত ! কা’র জন্য এনেছ অরুণ দাদা ? কা’কে দেবে ?”

কমলা এবার মুখ তুলিয়া চাহিল, অরুণ দেখিল, তাহার হস্তস্থিত গোলাপের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মধুর সৌন্দর্য্য সেই মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মুগ্ধ অরুণ বলিল, “কা’কে দেব বল দেখি ?”

“দিদিকেই দেবে বোধ হয়।” বালিকার ক্ষীণ নৈরাশ্যপূর্ণ ক্লিষ্ট স্বরে সহসা আহত হইয়া অরুণ তাহার পানে চাহিল; দেখিল তাহার সদা মলিন মুখখানি আরও মলিন হইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি মাটীতে নিবদ্ধ ! ব্যথিত এবং ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অরুণ ফুলটি তাহার নিকটে ধরিয়া বলিল, “না, নীহার, তোমাকেই দেব। এই লও।”

নীহার অপ্রত্যাশিত আনন্দে আত্মদমন করিতে পারিল না, সাগ্রহে ফুলটি লইয়া উজ্জ্বল মুখে কম্পিত স্বরে বলিল, “কত বড়, কত সুন্দর ফুলটা উঃ ! আমি মাকে দেখিয়ে আসি !” নীহার আনন্দে অধীরা হইয়া তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ চাঞ্চল্যের সহিত ছুটিয়া চলিয়া গেল। অরুণ দেখিল, কমলার মুখ আবার নত হইয়া পড়িতেছে। সে সাদরে তাহার হস্ত ধরিয়া ডাকিল “কমলা !”

কমলা সজোরে নিজের হস্ত টানিয়া লইল। অরুণ ব্যথিত স্বরে বলিল “কমলা, কমলা, রাগ কর্‌লে তুমি ?” কমলা ততক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ছি ছি, কমলা, তুমি কি এটুকুও বুঝ্‌তে পার না, যে এ ক্ষেত্রে তাকে—"

"আমি বুঝ্‌তে চাইনে! পথ ছাড় আমার।"

"শোন শোন কর্ত্তা আজ কি বলেছেন।"

"আমি শুন্‌ব না! পথ ছাড়।"

"এই শ্রাবণ মাসেই আমাদের বিয়ে।"

"আমি শুন্‌ব না; বিয়ে কব্‌ব না আমি।"

"একটু স্থির হয়ে শোন কমলা। সব সময়ে ছেলে মানুষী করে না; এখন ত অনেকটা বড় হয়েছ, একটু জ্ঞান বুদ্ধি ধরতে হবে। শোন আমার কথা। আমি বুঝ্‌তে পারি, আমি সব সময়ে ঠিক তোমার মনের মতন কায কব্‌তে পারি না। তুমি এমনি অনেক সময়ই আমার কাযে কথায় আন্তরিক বিরক্ত হও; এমনি রেগে ওঠো দেখ্‌তে পাই। যদিও তুমি ছেলে মানুষ ছিলে বলে এতদিন সে সব অগ্রাহ্য করেছি, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে একটু কথাবার্ত্তা বা বোঝাপড়া হওয়া উচিত। কমলা, ভ্রমেও মনে কর না যে তোমার মনকে—তোমার হৃদয়ের উচ্চতাকে আমি চিনি না। বেশ চিনি। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, আমাকে তুমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পার না। আমার যেখানে যেটা অবশ্যকর্ত্তব্য সেখানে কেন তুমি এমন হয়ে ওঠো? এই ভাব চির দিনই থাক্‌বে? কখনো কি তুমি আমায় বুঝ্‌বে না? তা যদি হয়, কমলা, তা হলে এ বিবাহে ত তুমি সুখী হবে না! সময় থাক্‌তে এর প্রতিবিধান করা দরকার। তোমার বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারেন যে, আমি তোমার মনোমত কায কর্‌তে পারি না, তোমার মনোমত নই, তা হলে তিনি কখনই—"

কমলা এতক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া অরুণের কথা শুনিতেছিল ; এই-বার তাহার পাশ কাটাইয়া অতি দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। কিছুই বুঝিতে বা স্থির করিতে না পারিয়া অরুণও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ষণপরে সে উদ্যান ত্যাগ করিল।

পরদিন প্রভাতে অরুণ কমলার সন্ধানে উদ্যানে আসিল। সে যে সকালে বিকালে সেই স্থানেই থাকে তাহা অরুণ জানিত। অনেক অনুসন্ধানের পর সে উদ্যানের এক কোণে বকুলতলায় কমলা ও নীহারকে দেখিতে পাইল। দুই জনে ফুল কুড়ান শেষ করিয়া কদলীর সূত্রে ফুল পরাইয়া মালা গাঁথিতেছে। নীহারকে সঙ্গে দেখিয়া অরুণ তাহাদিগকে দেখা দিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইতে লাগিল ; কেন না চোখোচোখি হইলেই বোধ হয় কমলা এবারও পলাইবে। নিকটস্থ হইয়া সে শুনিল, নীহার বলিতেছে, "শ্রাবণ মাসেই তোমার বিয়ে হবে নাকি, দিদি? তখন যে বৃষ্টি পড়ে! যদি বিয়ের সময় বৃষ্টি হয়?"

মৃদু হাস্যে কমলার ওষ্ঠ চুনির মত জ্বলিতে লাগিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "তুই এত বোকা কেন, নীহার? বৃষ্টিতে কি কর্‌তে পারে? এত বড় বাড়ী, সামিয়ানা, তাঁবু তবে মানুষ তৈ'রী করে কেন?" "তাইত" বলিয়া নীহার চুপ করিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "অরুণ দাদার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে ; না?" কমলা সম্মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, অন্য কেহ সে স্থানে উপস্থিত নাই, প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল কমলের মত মুখখানি নামাইয়া সে সলজ্জকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, "তা কি জানিস্ না?" "কিন্তু তোমার ত তা'তে শ্বশুরবাড়ী হ'বে না, দিদি! অরুণ দাদার ত নিজের বাড়ী নেই, বাপ মাও নেই, পাল্কী চড়ে ঘোম্‌টা দিয়ে বৌ হয়ে শ্বশুরবাড়ী তুমি একদিনও যেতে পাবে না।"

"নাইবা পেলাম, সেত আরও ভাল! শ্বশুরবাড়ী যেতে বিনো কত কাঁদে দেখিস্ নি? আমাদের এই বাড়ীইত তারও বাড়ী; আমার বাবা তো তারও বাবা। আমার এক জায়গাতেই বাপেরবাড়ী শ্বশুরবাড়ী হবে, সেইত সব চেয়ে মজা! তবে মা তা'রও নেই, আমারও নেই। সে দুজনারই অদৃষ্ট! ও কথা থাক্। আয় এই মালা গাছটা তোর খোঁপায় দিয়ে দি।"

"না থাক্" বলিয়া নীহার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা অরুণকে দেখিয়া চমকিত ও বিবর্ণমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিগতসন্দেহ হাস্যোজ্জ্বলমুখ অরুণ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ফুল ও মালা ফেলিয়া কমলা বিদ্যুতের মত অন্তর্হিতা হইল। অরুণ মালাটি তুলিয়া লইয়া কমলার দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে উদ্যানের অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই যে অভিমানভরা আপাতজটিল স্বভাবের মধ্যে অগাধ প্রেম ও স্নেহ-মাখা একখানি অতি উন্নত হৃদয়, এই হৃদয়টির পরিচয় যেন আবার আজ তাহার কাছে নূতন করিয়া প্রতিভাত হইল। অপরিসীম সুখে তাহার তরুণ হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়স্থ আনন্দজ্যোতিঃ মুহুর্মুহু তাহার সুন্দর মুখের উপর ঘন রক্তিম বর্ণের তুলী ফিরাইতেছিল।

কমলা ও অরুণ চলিয়া গেলে নীহার নিঃশব্দে সেই স্থানে আবার বসিয়া পড়িল।

২

কমলা ও অরুণের বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং বৃদ্ধ রাধাকান্তও এক বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। কমলাই এখন তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী।

জগতে যাহাকে সুখ বলে কমলার ও অরুণের তাহা অফুরন্ত। কান্তি

তাঁহাদের অতুলনীয়—স্বাস্থ্য অনিন্দ্য—বিত্ত অপর্য্যাপ্ত। ইহা ছাড়া আশা আনন্দ ও পরস্পরের প্রতি প্রেমে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। বিদ্যা-খ্যাতি সুনাম, সুযশ, অরুণের ত প্রচুর। প্রবীণ রাধাকান্ত অনেক দেখিয়া শুনিয়াই তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন। কমলাও শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী, দয়া দাক্ষিণ্য এবং সহৃদয়তার জন্য বাল্যকাল হইতেই সকলে তাঁহার প্রশংসা কবিয়া থাকে। "লক্ষ্মী-শ্রী একেই বলে" তাহার সম্বন্ধে গ্রামের ইহা অভ্রান্ত মত। এক কথায় অরুণ ও কমলার মত সর্ব্ববিষয়ে অনাবিল সুখী দম্পতী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সবই যদি সুখ আনন্দ ও হাসি, তাহা হইলে বিধির সৃষ্ট দুঃখ কোথায় যায়? জগৎ বৃক্ষের সংসার নামক পত্রটির সুখ ও দুঃখ নামে দুই দিক, পাতাটির একটি পিঠ তো কোন মতেই লওয়া চলে না, সুখ লইলে দুঃখটিও অপরিহার্য্য। অপরিসীম সৌভাগ্যবশে কেহ যদি জীবনের দুঃখকে দেখিতে না পায় তাহা হইলে কোন প্রকারেই হউক সে তাহাকে খুঁজিয়া টানিয়া বাহির না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। শিল্পী স্বহস্তে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজের পায়ে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে। মানবের স্বস্তি নাই—আনন্দে তৃপ্তি নাই—তাই সাধ করিয়া নিজের হাতে বুকে কণ্টক বিঁধাইয়া সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। কোন মেয়েলী ব্রত কথায় আছে, একজন সৌভাগ্যবতীর জগতে দুঃখ যাহাকে বলে তাহার সহিত জীবনে সাক্ষাৎ হয় নাই; দুঃখ কি এবং রোদন কিরূপ তাহা সে জানিত না, তাই কাঁদিবার জন্য তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছুতানাতা করিয়া কাঁদিয়া—মৃত জীবজন্তু ধরিয়া চীৎকার করিয়া সে শোক দুঃখের অভিনয় করিতে করিতে শেষে ভাগ্য-দেবতার রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া দুঃখের অতল সাগরে নিমগ্ন হইল। এই তুচ্ছ কথাটির মধ্যে

জাগতিক অতি গভীর সত্য নিহিত আছে! অভাব না হইলে সুখের মূল্য কেহ বুঝে না, এবং অবিচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে মানব বাস করিতেও পারে না। বিধির এমনই অলঙ্ঘ্য বিধান কৌশল।

তাই অতুল সুখসৌভাগ্যের মধ্যেও কমলার হৃদয়ে কিছু দিন হইতে কিসের যেন একটা ছায়াপাত হইতেছে। কেমন একটা অস্বস্তি—অশান্তি কিছু দিন হইতে তাহার মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া তাহার পূর্ণ সুখের মধ্যেও একটা দাগ টানিয়া দিতেছে। একটা অজানা দুঃখে অজানিত বেদনায় ক্রোধে--বিরক্তিতে মাঝে মাঝে সে অধীর হইয়া উঠে। ব্যথা কোথায়—কিসের এ অভাববোধ—কেন এ অশান্তি অস্বস্তির জন্ম তাহা সে ঠিক ধরিতে পারে না; কিন্তু কাঁটা যে কোথাও আছে তাহা স্থির নিশ্চিত। নহিলে মাঝে মাঝে এ বেদনা—এ "খচ্ খচ্" কিসের?

অতি শৈশবেই সে মাতৃহারা, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র নয়নমণি, ভবিষ্যতে সেই বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সে যাহা চাইয়াছে বা বলিয়াছে, শত বাধা—শত ক্ষতি স্বত্বেও তাহা কখনও অপূর্ণ থাকে নাই। তাহার শৈশবস্মৃতির মধ্যেও অভাব বলিয়া কোন বস্তুর সহিত যে তাহার কখনও পরিচয় হইয়াছিল ইহা তাহার মনে পড়ে না। তাহার সামান্য বিরক্তি—ভ্রুকুটী দেখিলেই তাহার খেলার সঙ্গীরা বালিকা কমলারাণীর নিকট হইতে সভয়ে শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়াছে, আবার তাহার সানুগ্রহ আহ্বানে সাহস পাইয়া নিকটে আসিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যটিতে শিশুকাল হইতে সে একচ্ছত্রা অধীশ্বরী। আত্মীয়স্বজনেরা পর্য্যন্ত কমলার শিশুকাল হইতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায করিতে সাহস পান্ না। তাঁহারা জানেন যে, অভিমানিনী তাহা হইলে অভিমানে ফুলিয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে শেষে অনর্থপাত হইবে। এই দুরন্ত অভিমান

ছাড়া তাহার চরিত্রে নানা সদ্‌গুণের এত আধিক্য ছিল যে, সকলে তাহার এ অভিমানকে কেবল ভয় করিত মাত্র, তাহাতে বিরক্ত হইত না। সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং এইরূপ সুখ সৌভাগ্য-বর্দ্ধিতার সে অভিমানকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিত। শিশুকাল হইতে মাতার শাসন না পাইয়া কমলার চরিত্রে এই অভিমানটা একটু অধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে ত এতদিন কোন অশান্তি জাগে নাই। অরুণ কমলাকে শৈশব হইতে খুব ভাল করিয়াই জানিয়াছে এবং তাহার এ অভিমানকে ফুলের মালার মত করিয়া বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছে। (এ অভিমানের ধাক্কা বিবাহের পর অরুণের উপরই সম্পূর্ণভাবে পড়িয়াছে আত্মীয় স্বজনেরা এখন নিরুপদ্রব।) কিন্তু অরুণের এখন মাঝে মাঝে যেন সেই ফুলের মালাকে কঠিন এবং ভার বলিয়া মনে হয়। যে অভিমানের রক্তিম সুখোষ্ণ কিরণ তাহাদের প্রেমকে কেবল সুখের আতপে সুতপ্ত এবং সুরক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিত সেই অভিমান যেন সময়ে সময়ে উভয়কে এখন কঠিন শীতল এবং বিবর্ণ করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে কমলা রাগ করিয়া কখনও পাঁচ মিনিটের বেশী মুখ ফিরাইয়া কথা না কহিয়া থাকে নাই; কিন্তু এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কখনও অর্দ্ধ দিন সময় পর্য্যন্ত —সে অরুণের সঙ্গে কথা না কহিয়া বা গম্ভীর উদাসীন ভাবে দুই একটা ছাড়া ছাড়া কথা কহিয়া কাটাইয়া দিয়া থাকে। কমলার মুখের এই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারভাব এবং উদাসীনতা অরুণকে অধিকতর পীড়িত করে। এই ভাবই যে তাহার অভিমানের গাঢ় অবস্থা তাহা অরুণ জানে; তাই সে এখন সময়ে সময়ে যেন অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসহিষ্ণু ভাবও প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাহাতে কমলা অধিকতর গম্ভীর ভাবে উঠিয়া চলিয়া

যায়। অরুণও ভাবে এ কি অন্যায়, কিন্তু কমলার সঙ্গে কলহ করিয়া তাহার যে বেশীক্ষণ থাকিবারই উপায় নাই! দুই এক ঘণ্টা রাগে রাগে কাটাইয়া দিয়া অরুণই শেষে আবার অগ্রসর হইয়া তাহার অভিমানী হৃদয়কে শান্ত করে। কিন্তু ইহার মূলসূত্র বুঝাইতে হইলে কয়েক মাস পূর্ব্বের ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

নীহার এখনও কমলার আশ্রয়েই আছে। তাহার বিবাহের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। তাহার চিররুগ্না মাতার অনুরোধে রাধাকান্ত বাবু যে কয় দিন নীহারের মাতা জীবিতা থাকেন সেই কয় দিন নীহারকে তাহার মাতার নিকটে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই রুগ্না আত্মীয়ার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘড়ী বাজিয়া উঠিল। তিনি অগত্যা উইলে কৃতবিদ্য এবং ভদ্রবংশীয় সর্ব্ব বিষয়ে সুপাত্র বরে নীহারের বিবাহ দিতে যে কয় সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহা তাহার মাতা কমলা ও অরুণের নিকট পাইবেন এইরূপ আদেশ দিয়া গেলেন। রাধাকান্ত বাবুর মৃত্যুর পর প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসে; নীহারের মাতা এক দিন কমলাকে বলিবেন মনে করিলেন, "আমার কপালে যা' আছে হইবে। মা, তুমি নীহারের জন্য পাত্র দেখিতে অরুণকে বল।" ইতোমধ্যে সহসা তাঁহারও পীড়া বাড়িয়া উঠিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া যে মৃত্যুর তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সেই মৃত্যু এবার আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিল না। অতি শীঘ্রই তিনি রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

শৈশবের খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া কমলা জীবনের চির নবীন প্রেমের খেলা খেলিতে অরুণের সহিত নব পরিচয়ে মিলিতা হইল, তখন নীহারও খেলাঘর ত্যাগ করিয়া মাতার রুগ্নশয্যার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। সে স্থান

হইতে সে একবারও নড়িত না, বাহিরের লোকের সহিত আর তাহার কোন সংযোগ বা সম্বন্ধই যেন ছিল না। তাহার অত্যাশ্চর্য্য মাতৃভক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। তাহার মাতার বা ক্বচিৎ কখনও কমলার অনুরোধও তাহাকে বাহিরে আনিতে পারে নাই। কিন্তু দুই মাস হইল নীহারের মাতার মৃত্যু হওয়ায় কমলাকে কর্ত্তব্যবোধে নীহারকে নিজের নিকটে আনিয়া সর্ব্বক্ষণের সঙ্গ দান করিতে হইতেছে। নীহার প্রথমে মৃতা মাতার কক্ষ ত্যাগ করিতে চাহে নাই; কিন্তু কমলার অনু-রোধে তাহার নিকটে আসিয়া এই দুই মাসেই সে যেন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বদ্ধ গৃহে অবিরত রোগীর সঙ্গে এবং তাঁহার যন্ত্রণা দর্শনে ও খেদোক্তি শ্রবণে তাহার তরুণ জীবনও যেন অবসাদগ্রস্ত—ক্ষীণ—দুর্ব্বল—চিররুগ্নের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হইয়াছে তাহা নীহারকে দেখিলে এত দিন বুঝা যাইত না; কিন্তু এই দুই মাসেই নীহারের ভগ্ন স্বাস্থ্য যেন নব লাবণ্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল। কমলার সর্ব্বদা সহৃদয় ব্যবহার এবং সস্নেহ বাক্য, অরুণের আনন্দময় সঙ্গ, সেই বাল্যকালের মত অরুণের অটুট করুণার স্বর্ণকিরণ নীহারের জীবনের অন্ধকারকে—নিরাশার তমকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া একটি ক্ষুদ্র বন ফুলের মত তাহাকে স্বাস্থ্যে—সুগন্ধে—সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। অরুণের সঙ্গ তাহার পক্ষে এমনই সুখময়—আনন্দময় এবং লোভনীয় হইয়া উঠিয়া-ছিল যে, নীহার সব সময়ে সে সুখ উপভোগ করিবার নির্দ্দিষ্ট মাপকেও ঠিক রাখিতে পারিত না। নিজের পড়াশুনা এবং বিষয়কর্ম্ম পরিদর্শনের জন্য অরুণকে অনেক সময়ই বহির্ব্বাটীতে থাকিতে হইত। সে অন্দরে আসিয়াছে জানিতে পারিলেই নীহার আর অন্য কোথাও তিষ্ঠিতে পারিত না, আরব্ধ কার্য্য অমনই পড়িয়া থাকিত, অসমাপ্ত কোন বাধাই সে সময়ে

তাহাকে বাঁধিতে পারিত না। পুরস্ত্রীরা কেহ কেহ যে ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, "এ যে বিষম বাড়াবাড়ি!" সে বক্র কটাক্ষ ও চাপা সুরটুকু কমলার কাণে গিয়া প্রথমে তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু সহসা এক দিন যেন এ কথার সত্যতা তাহারও মনে প্রতিভাত হইল। অরুণের যে সময়টি চিরদিন কেবল কমলার জন্যই নির্দ্দিষ্ট, নীহার ক্রমে যেন এখন সে সময়টুকুতেও তাহাদের সঙ্গী হইয়া তাহাদের একান্ত সঙ্গের বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিল। এক দিন কি একটা কারণে কমলা সন্ধ্যার পর নীহারকে তাহার কক্ষে ডাকিয়াছিল। সেই দিন হইতে নীহার প্রত্যহ সেই সময়ে সে কক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে তাহাদের সে সময়ের বিশ্রম্ভালাপের বিঘ্ন হওয়ায় কমলাও ক্রমশঃ নীহারের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিল। গল্পে গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়; অরুণ সোফা বা চেয়ারে বসিয়া একই ভাবে হাস্য, মধুর, করুণ নানা রসসম্বলিত গল্প করিতে থাকে, উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার দেবোপম কান্তি অধিকতর সৌন্দর্য্যময় বোধ হইতে থাকে; পার্শ্বে সাক্ষাৎ কমলা সদৃশী কমলা; আর ঘরের মেঝেয় বসিয়া নীহার উর্দ্ধমুখে নিস্পন্দনয়নে একমনে সেই বাক্যরস পান করিতে থাকে। সে সময়ে তাহার স্থান, কাল, পাত্র জ্ঞানও থাকে না। কমলা দুই চার দিন সানন্দ মনেই গল্পে যোগ দিত; কিন্তু ক্রমে তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল; অস্বস্তি হইতে অশান্তির, অশান্তি হইতে বিরক্তির জন্ম। কমলা ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া এই সভা ভঙ্গ করিবার জন্য কার্য্যের ছল করিয়া উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নির্ব্বোধ নীহার তথাপি নড়িত না, এবং অরুণও তাহার আগ্রহে এবং চক্ষুর মিনতিপূর্ণ ব্যাকুল ভাব দেখিয়া উঠিতে পারিত না; কেবল কমলাকেই পুনঃপুনঃ আহ্বান করিত এবং

সে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সানুনয়ে বাধা দিত। ইহাতে কিন্তু বিপরীত ফল হইল, কমলার বিরক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইয়া সে ক্রোধ পূর্ণ মাত্রায় অরুণের উপরই পতিত হইল। অরুণ ইচ্ছা করিলেই ত এ বাধা দুই দিনে সারিয়া যায়! নীহারের সেই প্যানপেনে নাকীসুরের "আর একটু বস্‌বেন না?" "আর একটু থাক্‌বেন না?" "কি এত কায আপনার বাহিরে? না উঠতে পাবেন না এখনি" ইত্যাদি কথায় জল হইয়া না গিয়া অরুণ যদি কমলার উঠার পরই বাহিরে চলিয়া যায়, কিম্বা অন্যত্র সরিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ধাড়ী খুকিও ত উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু অরুণের সে বিষয়ে মনোযোগই নাই, সে একটি একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রোতা পাইয়া গল্পের আনন্দেই বিভোর, তাহাকে অতিরিক্ত দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে গিয়া নিজেদের কতখানি ক্ষতি হয় সেদিকে অরুণের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই! চিরদিনই তাহার এই রকম স্বভাব। কমলাই কেবল চিরদিন এইরূপে তাহার সঙ্গের জন্য অন্তরে বাহিরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে। কমলা অরুণকে যতটা ভালবাসে অরুণ যদি তাহার অর্দ্ধেকটাও বাসিত, তাহা হইলে সে কখনই এমন নিশ্চিন্ত মুখে হাসি গল্প করিয়া সময় কাটাইতে পারিত না। ক্রোধের পার্শ্বে দুরন্ত অভিমান আসিয়া ক্রমে কমলার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। রাত্রিতে শয়নের সময় বা অন্য যে কোন সময়ে অরুণের সহিত সে একত্র হইত, তখন তাহার সে অভিমান অধিকতর দুর্দ্দাম হইয়া পড়িত। চিরমানিনী সে স্বামীকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার লজ্জা বা অপমানও কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার কাছে ইহা নিজের অপমান বলিয়াই সে মনে করিত। স্বামী যাহার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নহেন—কিন্তু সে তাঁহার জন্য লালায়িত এ কমলার পক্ষে বড় লজ্জার, বড় ব্যথাভরা বেদনার কথা।

নীহারকে কৃপা করিয়া সঙ্গদানের জন্য সে-ই নিজেদের মধ্যে আনিয়াছে, সেই কৃপাপাত্রীর সহিত স্বামী একটু অধিক মাত্রায় কথা কহেন ইহাতে আবার কমলা বিরক্তও হইতেছে, এ কথা প্রকাশ হইলে তাহার বড় অপমান। স্বামিস্ত্রীর একাত্মবোধহেতু পরস্পরের প্রতি যে নির্ভর ও বিশ্বাসভাব জন্মে স্বভাবের বৈষম্য এবং বয়সের তারুণ্যের জন্য তাহাদের মধ্যে তাহা বড় বেশী দৃঢ় হয় নাই। স্বামিস্ত্রী অপেক্ষা প্রণয়িপ্রণয়িনী ভাব অরুণ ও কমলার মধ্যে অধিকভাবে পরিস্ফুট, তাই মানঅপমানবোধ লজ্জা-সঙ্কোচ অভিমানের গণ্ডী এখন তাহারা ছাড়াইতে পারে নাই। তাই আসল কথা ফুটিতে না পারিয়া কমলা কোন একটা তুচ্ছ কারণে বা কথার ছুতায় মুখ অন্ধকার করিয়া ভার হইয়া থাকে, কখনও বা অরুণের সহিত বাক্যালাপই বন্ধ করিয়া দেয়। বিস্মিত অরুণ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া এবং যখন তখন এইরূপ বিনাদোষে গুরু দণ্ড হইতে দেখিয়া ক্রমে বিরক্তও হইয়া উঠে। এক দিন কি কথায় অরুণ মধুর ক্রোধের ভাবেই বলিল, "আবার বুঝি বুড়ো বয়সে সেই ছোট বেলার রোগে পেয়ে বস্‌ছে?" অরুণ তাহার বর্দ্ধিত অভিমানকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিয়াছিল; কিন্তু কমলার মনে হইল, তাহার বাল্যকালের নীহার সম্বন্ধীয় ছোটখাটো মানঅভিমানগুলাকে লক্ষ্য করিয়াই অরুণ এটি খোঁটা স্বরূপে ব্যবহার করিল। কমলা মুখ দ্বিগুণ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

৩

সেদিন সন্ধ্যার পর গল্পের আসরের মধ্য হইতে উঠিয়া কমলা একবার কর্ম্মান্তর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সহসা অতি তীব্র স্বরে বলিল, "এই রকম গল্প করে দিন কাটালে কি চল্‌বে? একটা পাত্রটাত্র খুঁজ্‌তে হবে না?

এর পর কি আর ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া যা'বে? পাত্রীটির যে বয়স এইবার পনের ডিঙ্গুতে চল্‌ল! বিয়েটিয়ের দরকার নেই কি?"

অরুণ সহসা কমলার এরূপ উচ্চ ও তীব্র স্বর কণ্ঠে একটু থতমত খাইয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "বাঃ তা কি আমাকে কোন দিন বলেছ? এইত প্রথম বল্‌ছ। তাতে একেবারেই সপ্তম সুরে যুদ্ধ ঘোষণা কেন? ঠাণ্ডা মুখে বলা যায় না?"

কমলা দ্বিগুণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "সপ্তম সুর কি সাধে বেরোয়।"

"সাধে না ত কি? এইত মাসখানেক আ'গের কথা—দেওয়ানজী পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তেই তুমি রেগে উঠলে যে, বেচারার মা মারা যাওয়ার এখনও ছ'মাস হয় নি; এখনি বিয়ে! আর কিছুদিন যা'ক্; আবার হঠাৎ এর ভিতরে মত বদ্‌লে ফেলেছ তা কি করে জান্‌ব? অন্তর্যামী নই ত।"

"অন্তর্যামী না হয়েও সাধারণ বুদ্ধিতেও এটুকু নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, দেওয়ানজীর অন্য মত্‌লব ছিল। তাঁ'র সেই গোমূর্খ নাতিটির সঙ্গে বিয়েটা ঘটিয়ে বাবার দেওয়া টাকাগুলি হস্তগত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমি ওরকম মতলব্‌বাজের কথায় কাণ দিই না।"

অরুণ বিস্মিত ভাবে বলিল "তাই নাকি?" তাহার পরে সে প্রফুল্ল সহাস্য মুখে বলিল "আঃ—কমল! আমার যে সাধারণ বুদ্ধিটুকুও নেই তা' এমন করে প্রকাশ্য সভায় কাণ ধরে প্রমাণ করে দেওয়াটা কি তোমার উচিত হ'ল; না তোমারি এতে খুব মান বাড়্‌ল? আড়ালে নিয়ে গিয়ে আমার লম্বা কাণটায় হাত দিলে দুজনেরই যে মর্য্যাদা থাকত! কি বল, নীহার?"

নীহার এতক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া ছিল—এইবার একটু হাসিয়া মুখ নীচু করিল। আড়ালে লইয়া গিয়া কথা বলার প্রস্তাব স্বামীর মুখে রহস্যচ্ছলে শুনিয়াও কমলার অভিমানদিগ্ধ হৃদয় দ্বিগুণ অভিমানে ব্যথিত হইয়া পড়িল। তাহার ব্যথাপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া অরুণ সাদরে হস্ত প্রসারিত করিয়া কমলার "হাত ধরিল! বলিল আবার মুখ অমন হ'ল কেন?—তাই হবে কমল!—আমি পাত্রের চেষ্টা দেখ্‌ব,—কিন্তু সাম্‌নে আমার একজামিন্‌! এত দিন যখন গেল, তখন আর মাস তিনেকে তোমার বোনের এত বেশী বয়স বাড়্‌বে না। দেরী হলে যদি নিতান্তই পাত্র না পাওয়া যায়—দেওয়ানজীর নাতি ত উপস্থিতই আছে। তার চেহারাটি অন্ততঃ তোমার স্বামীর চেহারার চেয়ে অনেক ভাল। সেইজন্যই বুঝি তা'কে তোমার এত অপছন্দ হয়—না কমল?"

কমলাকে রাগাইবার জন্য অরুণের এই আয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদনা ভুলিয়া গিয়া মধুর কোপে মুখখানি রাঙ্গা করিয়া কমলা বলিল, পোড়ার দশা আর কি! সাত জন্মে বিয়ে না হয় সেও ভাল তবু অমন অগা-পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে নেই।"

অরুণ এইবার একটু হাসিয়া বলিল, "যা'র উপর বিরক্ত হও তা'র উপর একটু অন্যায় বিচারও কর, কমল তুমি। এত বেশী বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

"নয়ত কি? ধেড়ে বয়সে এত দিনে এণ্ট্রেন্স পাশ কর্‌লে। বাবা কি অমনই পাত্রে নীহারের বিয়ে দিতে অত টাকা দিয়ে গেছেন? আর আমিই একা বাড়িয়ে বলি; না? রূপের তুলনা হচ্ছিল যে? শুন্‌লেও গা জ্বালা করে।"

"তাই নাকি? শুনেও ধড়ে প্রাণ এল। তাহলে আমিই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ?"

"যাও যাও বাজে বকুনি রাখ। তোমায় পাত্রের জন্য আজ থেকেই চেষ্টা করতে হ'বে।"

"চেষ্টা কর্‌ব বটে; কিন্তু সে মিথ্যা চেষ্টা হবে। তুমি যে রকম পাত্র চাও তা' বললেই অমনি পাওয়া যায় না—বিশেষ নীহারের একটু বয়স হয়েছে। একজামিনের পর ভাল করে চেষ্টা করা যাবে।"

"তিন মাস পরে তোমার একজামিন—তা'র পরে তুমি খুঁজবে? অত দেরী কর্‌তে পা'বে না?"

"এ আর এত বেশী দেরী কি? বড় জোর মাস চারেক। নীহারও ততদিন আর একটু সাম্‌লাক।"

"আঃ—তোমার কেবলই ওজোর। নীহার বেশ সাম্‌লেছে। তা'র জন্য তোমায় অত ভাব্‌তে হ'বে না।"

কমলার কথায় ও স্বরে এমন একটু রুক্ষতা প্রকাশ পাইল যে, অপ্রতিভ হইয়া অরুণ নীহারের পানে চাহিয়া দেখিল—নীহার তাহার মুখের বিবর্ণতা যেন সামলাইতে পারিতেছিল না। তাহার হাতখানা স্পষ্টই থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অরুণ তাহার পানে চাহিতেই সে এমনই ভীতভাবে চক্ষু ফিরাইয়া লইল যে অরুণ সে দৃষ্টিতে ব্যথিতের বেদনাই মুদ্রিত দেখিল। অরুণ কমলার রুক্ষস্বরকে ঢাকিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাদের গল্পসল্পের মধ্যে অন্যমনা হয়ে নীহার যদি একটু ভাল থাকে বলে তুমিই ব্যস্ত। দেওয়ানজীকেও তাই বলে তুমি ভাগিয়ে দিলে। নহিলে দেওয়ানই ত এতদিন পাত্র ঠিক করতে পারতেন। মাতৃশোক সামলান কি সোজা কথা—বিশেষ যার আর কেউ নেই। আমি এই তিন মাসের

পর ঠিক দশ দিনের মধ্যে তোমার পছন্দমত পাত্র ঠিক করে দেব। এই কটা মাস মাত্র যা'ক!"

কমলা চাহিয়া দেখিল, অরুণের সহানুভূতিময় বাক্যে ও আর্দ্র স্বরে নীহার একেবারে যেন অসম্বৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাহার নত চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া কক্ষের মেঝেয় পড়িতেছে। সে দৃশ্যে অরুণের চিত্ত যে অধিকতর বিগলিত হইয়া পড়িতেছে ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া কমলার চিত্ত আবার অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। সে সহসা সুদৃঢ়স্বরে বলিল, "এই মাসের মধ্যেই আমি নীহারের বিবাহ দেব।"

অরুণ তাহার কঠিন ভাবে বিস্মিত ও সহসা অল্প বিরক্ত হইয়া বলিল, "তবুও এক কথা? আমি এখন পড়া ছেড়ে পাত্র খুঁজতে পার্‌ব না।"

"না পার আমার অন্য লোক আছে।"

"বেশ তবে তাই হোক।"

রাগ করিয়া অরুণ উঠিয়া চলিয়া গেল; এবং কমলাও সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। কেবল ভীতা সঙ্কুচিতা নীহার যে বাড়ীর কোন্ কোণে লুকাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এবার গোটা দুই দিন বাক্যালাপ বন্ধ রহিয়া শেষে যথারীতি নিয়মে স্বামিস্ত্রীর কলহ ভঙ্গ হইল। অরুণ সেই দিনই কলিকাতাস্থ ভগিনীপতি কানাই বাবুকে সুপাত্রের সন্ধান দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখায় তিনি কয়েক দিন পরে একটি পাত্রের কথা লিখিলেন। কয়েকখানা পত্র লিখালেখির পর কমলার আদেশে তাহার এম, এ, পড়ার পুস্তক বন্ধ রাখিয়া অরুণ "ঘর বর" দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। কেন

না পরের মুখে ঝাল খাইয়া কমলা একটা যাহার তাহার হাতে নীহারকে দিতে পারিবে না।

কয়েক দিন পরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া অরুণ কমলার সন্ধানে আসিয়া দেখিল, নীহার কমলার কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কি একটা বুনিতেছে। সেই বিবাদের পরদিন হইতে নীহার আর তাহাদের নিকটে আইসে নাই। আবার যে কমলাই তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছে তাহা অরুণ বেশ বুঝিতে পারিল। তাহার এই "ক্ষণঃতুষ্ট ক্ষণঃরুষ্ট" অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় সে বহুদিন হইতেই পাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার মূল সূত্রের সন্ধান এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে না পারাই অরুণের সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অরুণ আবার একটা ভুল করিল। সে দিনের সেই কলহের স্মৃতিটুকু নীহার ও তাহাদের মধ্যে যাহাতে নিঃশেষ ভাবে মুছিয়া যায় এইরূপ একটা ইচ্ছা সহসা তাহার মনে জাগিল। সে দিনের স্মৃতি যে নীহারের মন হইতে মুছে নাই, তাহা তাহার মুখভাবেই অরুণ বুঝিতে পারিল এবং নিজেও অতর্কিতে তাহার সম্মুখে পড়িয়া যে একটা নূতন রকম লজ্জাবোধ করিল ইহাতেই সেও বুঝিল যে, সেই অপমানজনক স্মৃতিই তাহার মূল। এ ভাবটা চেষ্টার দ্বারা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অরুণ পূর্ব্বের মত অসঙ্কোচ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নীহারের নিকটে দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে বলিল, "আজ যে তোমায় নতুন কাযে ব্রতী দেখ্‌ছি। এ সব ত তোমার কোনদিন দেখি নি। কমলা বুঝি তোমায়ও তা'র নেশা ধরিয়ে তবে ছেড়েছে। একেই বলে 'সঙ্গ দোষে শত গুণ নাশে' অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ।"

অরুণের রসিকতায় নীহার পূর্ব্বের মত হাসিতে চেষ্টা করিলেও তাহার মুখে সে হাসি ফুটিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটি যেন দ্বিগুণ ভীত ও

সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অরুণ তাহার এ ভাবকে নষ্ট করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাহার আরও নিকটে গিয়া নীহারের শিল্প কর্ম্মটির একধার ধরিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাঃ বেশ হচ্চে ত! কার জন্য এ নতুন শিক্ষা—নতুন চেষ্টা। নতুন লোকের জন্যেই নাকি?"

নীহার এইবার একটু হাসিয়া কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল, "কমল দিদি আপনার জন্যেই বুন্‌তে বলেছেন।"

"এ ত কমলার বড় অন্যায় আব্‌দার! এমন জিনিষটি নতুন লোকের জন্যেই রাখা উচিৎ, তা না—যা সে জগতে হ'তে দেখ্‌বে সবই পুরোণোর জন্য ফরমাস্ করে বস্‌বে! কই সে বে-আক্কেল মানুষ? এ নিয়ে তা'র সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে হ'বে ত।"

অরুণের ব্যবহারে এবং অসঙ্কোচ কথাবার্ত্তায় নীহারেরও আড়ষ্ট ভাব ক্রমে দূর হইতেছিল। সে মুখ তুলিয়া ঈষৎ প্রফুল্ল অথচ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এইখানেই ছিলেন এতক্ষণ। আসবেন এখুনি। বসুন না।" বলিয়া নীহার সম্মুখস্থ চেয়ারখানার পানে চাহিল। অরুণ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাতে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাওয়ায় অরুণ শেষে বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি হস্তস্থ পুস্তক কয়খানা নাড়িতে নাড়তে বলিল—"বল দেখি এ-কখানা কি জিনিষ!"

নীহার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বই।"

"সত্যি নাকি। ছুরী কাঁচি ঘটি বাটি ছুঁচ সুতো নয়, বই! অত্যদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য গবেষণাপূর্ণ আবিষ্কার ত!"

"আপনার হাতে রয়েছে আমি দূর থেকে বই ছাড়া আর কি বলব।"

"আচ্ছা এই করকমলেষু। এইবার বল কেমন জিনিষ?"

নীহার যেন সহসা চকিত হইয়া উঠিল; তাহার পাণ্ডু গণ্ডযুগলে মুহূর্ত্তে রক্তের আভা :দেখা দিল। সে ত্রস্ত স্বরে বলিল, "কার জন্য এনেছেন। কমল দিদির জন্যই ত!"

অগত্যাই ঘুষের সাহায্য নিতে হয়েছে। তোমার কমল দিদি আমাকে অঙ্গদ বীরের মত "চারি কার্য্যের তরে" সোনার লঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন, তা অঙ্গদ বীরের মতই অকর্ম্মণ্য আমি "চারি কার্য্যের এক কার্য্য" কিছুই করে আস্‌তে পারি নি, তাই ভয়ে ভয়ে প্রফেসার মোহিত সেনের এডিসন কখানা রবিবাবুর কাব্য গ্রন্থ কিনে খুব ভাল করে মরোক্কো চামড়ায় ভেলভেটে বাঁধিয়ে সোনার জলে বইয়ের নাম লিখিয়ে এনেছি! দেখ্‌ছ না?"

নীহার মূঢ়ের মত অরুণের পানে চাহিয়া রহিল। যেন অরুণ কি বলিতেছে, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে চাহে।

অরুণ তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া তেমনই সপরিহাসে বলিল, "বিধাতা ঘাস জল না মাপালে কেউ কি কারুর গোয়ালে জোর করে ঢুক্‌তে পারে? তোমার এই পুরাণ খোঁয়াড়েই এখনও কিছুদিন বাস কপালে আছে। আমি কি কর্‌ব?"

নীহার ধীরে ধীরে মস্তক নামাইল; কিছুক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। অরুণ ক্রমে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কই, কমল ত এখনও এল না। দেখি সে কোথায়?" গমনোদ্যত অরুণের পায়ের নিকটে নীহার ত্রস্তে পুস্তক কয়খানা নামাইয়া দিতে দিতে বলিল, "বই ক'খানা নিয়ে যান্‌,—দিদির জন্যেই সবগুলো এনেছেন বোধ হয়,—না?"

অরুণের সেই বাল্যকালের ঘটনা মনে পড়িল। সেই গোলাপ ফুলটি

দেখিয়া মোহিত লুব্ধ অথচ ভীত নিরাশাপূর্ণ স্বর। ঠিক তেমনই স্বরে—তেমনই ভাবেই নীহার কথাটা বলিল। সহসা অরুণ যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইল,—কেন না, সেই গোলাপ ফুল দানের পরের ঘটনাও তাহার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনই সে ভাবকে মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার জন্যও একখানা আছে নীহার—এর মধ্যে একটা তুমিও পাবে।"

নীহার মাথা নাড়িয়া ভীত স্বরে বলিল "না! না! দিদি রাগ কর্‌বে।"

কমলাকে তুমি চিন্‌তে পার নি এখনো, নীহার? আমার কাছে তা'র চির দিনই ওই রকম অভিমান করা অভ্যাস; কিন্তু আর সকলকে সে কতখানি স্নেহের চোখে দেখে, কতখানি তার কর্ত্তব্যজ্ঞান, উচ্চ মন তা'কি জান—না এখনও? আমি না দিলেও সে এখনি এ বইয়ের ভাগ তোমায় দিত। তা'র সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা মনে রেখ না। তুমি সচ্ছন্দে বই নাও।"

নীহার জড়িতস্বরে বলিল, "আপনিই যেটা দিতে ইচ্ছে করেন, দিন।"

তোমার যেটা ইচ্ছা নিতে পার। তবু নিজে নিতে পারবে না! আচ্ছা আমিই দিচ্ছি।"

প্রেমের চির প্রাপ্য সম্মান প্রণয়ীর হস্তের স্বতঃদত্ত পূজা অরুণ বা কমলার ভাগ্যবশে এইরূপে করুণাদেবী আসিয়া মাঝে পড়িয়া কয়েক বারই হরণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে অরুণেরও হাত ছিল না। কেন না দয়াকেই এইরূপ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে উচ্চ আসন দেওয়া তাহার প্রকৃতিগত; বিশেষ সে বাল্যকাল হইতেই নীহারকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিত। রূপৈশ্বর্য্য সর্ব্বসৌভাগ্যময়ী কমলা যেন তাহার ধ্যানের দেবী—কামনার সর্ব্বসাফল্য-ময়ী প্রতিমা। হৃদয়ের স্বতঃপ্রস্ফুটিত প্রেমের ফুলে অন্তর সর্ব্বদা তাহার

পূজায় নিযুক্ত। কিন্তু এই যে মলিনা দীনা পরগৃহবাসিনী পরদয়া-প্রত্যাশিনী বালিকা তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগতের কৃপার পাত্র স্বরূপে অবস্থান করিতেছে সেই দেবীর বাহ্য পূজার জন্য এই দীন কৃপার্থী হৃদয়কে করুণা না করা এ যেন সেই দেবীরই অপমান বলিয়া অরুণের বোধ হইত। এই দয়ার দানের জন্য যে সে দেবীর নিজ পূজায় ত্রুটি বোধ করিবে এ চিন্তা অরুণের অসম্ভব বোধ হইত—প্রেমের এই সদা ভিক্ষুক ভাব এবং তজ্জন্য মান অভিমানও অরুণের তত ভাল লাগিত না। কবির "পুরুষের উক্তি" কবিতাটিই যেন তাহার জীবনে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছিল—

"সৌন্দর্য্য সম্পদ মাঝে বসি কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা ভিক্ষা সর্ব্ব ঠাঁই তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!"

অরুণ যখন নিজের মনে প্রেম ও করুণার স্বত্ব সাব্যস্তের মোকর্দ্দমায় এইরূপে ব্যস্ত তখন সহসা সে নীহারের ব্যবহারে একটু চমকিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। নীহার বহিখানা অঞ্চলে ঢাকিয়া যেন অন্তরের অন্তর দিয়া লুকাইয়া লইয়া পলাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি যাই।"

"অমন করে পালাচ্ছ কেন ওকি?—বিরক্ত অরুণের কথা মুখে রহিল—নীহারও গতিশক্তিরহিত হইয়া সেই স্থানে একেবারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া গেল। সম্মুখে কমলা!

সহসা অপ্রস্তুত অরুণের মুখেও প্রথমটা কথা জোগাইল না। বিনা

দোষেও সে যেন কতকটা অপরাধীর মত নীরব রহিল। কমলা নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে উভয়কে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "তা'র পর? কাযের কত দূর কি হল? কবে দিন স্থির করেছ? এই মাসেই ত?"

অরুণ অপ্রস্তুত ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "দাঁড়াও বসি আগে। হাঁপ নিতে দাও।"

"শুন্‌লাম এক ঘণ্টারও উপর বাড়ীর মধ্যে এসেছ; এতখানি সময়ের মধ্যেও বসা বা হাঁপ নেওয়া ঘটে নি?" নিজের কাছে নিজেকে অন্য কোন দোষে অপরাধী বোধ না হইলেও অরুণ নীহার এবং নিজের উপরও যেন অনেকটা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, অনর্থক এই এক ঘণ্টা সময় নষ্টেরই অনুতাপ তাহার চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছিল। আজ কয়দিনের প্রবাস হইতে সে গৃহে আসিল; কিন্তু কমলার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ বা একটি কথাও না হইয়া একটা যেন অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যেই তাহাদের প্রথম সম্ভাষণ হইতে চলিল। বিরুদ্ধ ঘটনা নিজে ও নীহার তিনজনের উপর বিরক্ত অরুণের চিত্ত কমলার রুক্ষ ও ব্যঙ্গ স্বরে দ্বিগুণ তিক্ত হইয়া উঠিল। ঘটনাবিপর্য্যয়ে কমলারও যে সহজভাবে কথা কহা তখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে একবার ভাবিতে পারিল না। সমস্ত বিরক্তি পুঞ্জীভূত ভাবে কমলার উপরেই নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "অত জবাব দীহি করা আমার দ্বারা পোষাবে না।"

"যে কাযে পাঠিয়েছিলাম সেই কাযেরই মাত্র জবাব চাইতে এসেছি, আর কিছুরই নয়।"

"সর্ব্বদা অত লডায়ে গোরার মত সঙ্গীন উঠিয়ে থাক্‌লে সংসার চলে না। বস বলছি, শোন।"

কমলা বসিল না, নিঃশব্দে অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেরই ত্রুটিতে কমলার উপর যে সে একটু অধিক মাত্রায় দোষারোপ করিয়া ফেলিতেছে অরুণ ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিল। কমলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া আগে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই তাহার অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীহারের উপস্থিতিতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা কোমল সাপরাধ কণ্ঠে অরুণ বলিল, "ভারি ত্যক্ত হয়ে এসেছি কমল। কানাই বাবু পর্য্যন্ত তা'দের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। টাকার খাঁই তা'দের কিছুতেই মিটে না।"

"আদত কথাটি মাত্র আমি শুন্‌তে চাই। কোথাও সম্বন্ধ বা দিন স্থির হয়েছে কি না?"

"দশ হাজারেও যখন তা'দের দেমাক্ বাড়্‌তে লাগ্‌ল তখন কানাই বাবু রাগ করে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন।"

"কেন আমি কি টাকার কোন মাপ্ করে দিয়েছিলাম? টাকার ভাবনা না ভেবে পাত্রই কেন ঠিক করা হল না?"

"শুধু সে জন্যও নয়, কমল, দেখ্‌লাম তা'রা অতি ছোট লোক! কন্যার মা কত টাকা রেখে গেছেন ইত্যাদি এত অভদ্রের মত কথা কইতে লাগল যে, আমারও মনে হল যে, তুমিও শুন্‌লে সেখানে বিয়ের রাজী হ'বে না। এই আর একটি সৎবংশের ছেলের সংবাদ পেয়ে সেইখানে কথাবার্ত্তা এক রকম স্থির করে এলাম। কিন্তু পাত্রের সম্মুখে বি, এ, একজামিন। মাস চারেক পরে নইলে সেখানেও বিয়ে দেওয়া ঘট্‌বে না।"

"এই তবে শেষ সংবাদ! বেশ! সেই যে তিন মাস পরের জিদ্ ধরে-ছিলে প্রকারান্তরে সেই কথাই বাহাল ত?"

"এ কি অবুঝের মত কথা, কমলা ? কানাই বাবুও ত চেষ্টা কর্‌ছেন, তিনিও ত এ ভিন্ন আর উপায় দেখ্‌লেন না।"

কমলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ এতক্ষণে অবসর পাইয়া ভূমি হইতে পুস্তক কয়খানি তুলিয়া লইল। কমলার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিল, "কমলা, তুমি যে ক'খানা বই ভালবাস তোমার জন্যে বাঁধিয়ে এনেছি।"

কমলা পুস্তকের পানে ফিরিয়াও চাহিল না দেখিয়া অরুণ কমলার হাত ধরিয়া বই ক'খানা গুঁজিয়া দিতে চেষ্টা করিল। তখন কমলা স্বামীর পানে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, "আমার জন্যে এনেছ এই বই ?"

"হ্যাঁ তোমার জন্য। দেখ ভিতরে নাম লেখা আছে।"

"দেখি" বলিয়া স্বামীর হস্ত হইতে পুস্তক ক'খানা লইয়া কমলা নীহারের দিকে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "নীহারকেও একখানা দিয়েছি যে, ও গুলো তোমার। তুমি ভালবাস বলেই এনেছি। তুমি নেবে না ? একখানাও নিজে রাখ্‌বে না ?"

স্বামীর ব্যথিত স্বরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কমলা সুদৃঢ় স্বরে বলিল "না ! মনরাখা প্রসাদী জিনিস আমি নিই না।"

"মনরাখা প্রসাদী জিনিস !" অরুণ প্রথমত হতবুদ্ধি ভাবে রহিল ; তার পরেই সক্রোধে বলিল "এত নীচ মন তোমার ? এই জন্যই নীহার একটা সামান্য বই নিতেও এত ভয় পাচ্ছিল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

ক্ষুদ্র অভিমানের বেশে একটা বিরাট দৈত্য আসিয়া কমলাকে নিমেষে অধিকার করিয়া লইল। কমলার রুদ্ধ কোপ এইবারে অগ্নি উদ্গীরণ করিল, "আমি নীচ ? আর আজন্ম যা'রা পরের দয়াতেই মাটীতে পা

রেখে উল্টে তাকেই নীচ বলে প্রমাণ করতে সর্ব্বদা ব্যস্ত তারাই জগতে সব চেয়ে মহৎ! না?"

"আজন্ম যা'রা পরের আশ্রিত—পরের দয়ায় পুষ্ট তা'রা ত নীচ হতেই পারে! কিন্তু ঐশ্বর্য্যও যে মানুষের মনের দৈন্য ঘুচাতে পারে না তা'র প্রমাণ তুমি অহরহঃই দিচ্ছ।"

"বটে? তা হ'লে এমন নীচের সঙ্গ সে সব মহৎদের ত ত্যাগ সর্ব্বাগ্রে উচিৎ।"

"নিশ্চয়ই। মনে ভেব না যে, তোমার কথা কেবল নীহারকেই মাত্র লক্ষ্য করছে! নীহার ছাড়াও আজন্ম পরদয়াপুষ্ট পরের মাটীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে থেকেছে এমন লোক আরও এখানে উপস্থিত আছে।"

"সেত জান্‌ছিই। নীহারকে উদ্দেশ ক'রে কোন কথা বল্‌লে এখন তা' একা তা'র গায়েই লাগে না, তা বেশই জান্‌ছি। আমি খুব নীচমনা সত্যই, আর এ রকম কথা কেবল তা'দেরই মুখে শোভা পায় যা'রা—"

"পরের অনুগ্রহজীবী অথচ তা'রই ঘরের কর্ত্তা সেজে অনধিকার কর্তৃত্ব করতে চায় সেই মূর্খের মুখে। না?"

"আমার মুখে কথা গুঁজে দেবার তোমার কোন অধিকার নাই মনে রেখ।"

"তোমার উপরে আর আমি কোন অধিকারের কথাই মনে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না। তোমার এ আমিত্বের অহঙ্কার যে সর্ব্বনাশী রকমে দিন দিন বাড়্‌ছে তাতে সে-ই তোমায় ক্রমশঃ তা'র দাসী করে ফেল্‌ছে এ আমি কিছু দিন হতেই লক্ষ্য করছি। পার যদি এই বেলা সতর্ক হও, উপদেশ দিয়ে গেলাম। যতদিন না নিজে উপার্জ্জনক্ষম হই ততদিন এখানে আর মুখ দেখাব না"।

"মুখ দেখাবে না? কোথায় যেতে হ'বে?

"যেখানে ইচ্ছা।"

কমলা ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু অরুণকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবার ক্ষোভে রোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এখন ত তা' যা'বেই; এখন কিনা দিন কিনে নিয়েছ! এখন আর তোয়াক্কা কিসের?"

অরুণ মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, "এর উত্তর যিনি আমায় প্রতিপালন করেছিলেন তাঁ'র কাছে দেব, তোমার কাছে না।"

অরুণ চলিয়া গেল, কমলা প্রস্তর-প্রতিমার মত নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কি হইল না হইল তাহা সে যেন ভাল বুঝিতেও পারিল না, কেবল কর্ণে স্বামীর অসহ্য বাক্যজ্বালা এবং তাহার দুর্ব্ব্যবহার শূলের মতই বিঁধিতেছিল! এই পরদয়াপ্রত্যাশী কি সে স্বামীকে বলিয়াছিল? অরুণ কি তাহা বুঝে নাই! বুঝিয়াও সে কলহ করিবার জন্য তাহা স্বেচ্ছায়ই গায়ে পাতিয়া লইয়াছে। নীহারের অপমান সহিতে না পারিয়া স্ত্রীর ত অপমান সে স্বচ্ছন্দে করিল! এই অরুণই সেই অরুণ? না নীহারের সম্বন্ধে সে চিরদিনই এইরূপ পক্ষপাতী।

৪

নীহারের বিবাহ। দেওয়ানজীই পাত্র স্থির করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একটি শ্যালক বিপত্নীক—একটু বয়স হইলেও ভদ্রসন্তান; ঘরে দু'পয়সা আছে—'লিখাপড়া'ও তার ভাল রকম জানা শুনা আছে; তাহার প্রমাণ—কোন "সাহেব"কে সে একবার বাঙ্গালা পড়াইয়াছিল। শ্যালকটি সদ্বংশজাত। তাহার সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা দেওয়ানজী এই কয়দিনে

ফুরাইতে পারিতেছেন না। কমলা যাহা একবার "না" বলেন, তাহা "হাঁ" হইতে পারে না, জানিয়া দেওয়ান আর নাতিটির কথা অধিক বলিতে সাহস পায়েন নাই; অগত্যা গৃহিণীর জেদে তাঁহার ভবঘুরে ও সকল রকম নেশায় পরিপক্ক অতি স্নেহের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাটির—যিনি বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকিয়া সম্প্রতি তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, সেই শ্যালকটির—একটা উপায় করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কমলা এত তথ্য জানিত না—সে হাতের নিকটে আর অন্য পাত্র না পাইয়া অগত্যা এই পাত্রেই বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এই মাসের মধ্যেই সে যে নীহারের বিবাহ দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এ পাত্র ছাড়িয়া দিলে তাহার সে জেদও রক্ষা হয় না। নীহারের বিবাহ দিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া সে একটা কার্য্য করিবে, মনে মনে স্থির করিতেছিল। অরুণ কলিকাতায় কানাই বাবুর কাছে যাইতেছি, এই কথা সকলকে বলিয়া সেই যে চলিয়া গিয়াছে, আজ দশ বারো দিন হইল, আর তাহার কোন সংবাদ নাই। সে জীবনে যাহাকে কখনও দেখে নাই, সে ননদকে পত্র লিখিতেও কমলার লজ্জা করিতেছিল—তাহা ছাড়া কি বলিয়াই বা পত্র লিখিবে! তাহার চেয়ে একবার দেখা করিতে গেলেই অত্যন্ত আত্মীয়তা প্রকাশ পাইবে এবং অরুণও যদি সেখানে থাকে—কমলা এর বেশী আর কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না। অভিমানে—বেদনায় তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। অরুণের এমন ব্যবহার সে জীবনে যে কখনও পায় নাই!

যাক্ সে কথা। এখন বিবাহটা এক রকমে চুকিয়া গেলেই বাঁচা যায়। দেওয়ানজী কলিকাতা হইতে সন্তক্রীত দুই হাজার টাকার গহনাগুলি ওজন করিয়া নীল কাগজে মুড়িয়া এবং একটা রঙ্গিন্ থলির

মধ্যে তিন হাজার টাকা গণিয়া পুরিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কর্ম্মান্তরে গেলে কমলা নীহারের গাত্রে হরিদ্রা দিবার জন্য আদেশ দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে এক জন দাসী আসিয়া বলিল, "বাবু এসেছেন!" কমলা যেন প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। দাসী আবার বলিল, "বাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন, মা।" কমলা অন্য কথা সব নিমেষে ভুলিয়া গেল; বলিল "কই? কোথায়?"

অরুণ আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "একটা কথা শুনে এখনি আবার আমায় আস্‌তে হ'ল।"

কমলা অরুণের পানে চাহিতে পারিতেছিল না; তাহার পা দুইটা স্পষ্টই থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে একটু একটু করিয়া স্বামীর নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল। অরুণ বলিল, "শুনিলাম, দেওয়ান-জীর শালার সঙ্গে তুমি নাকি নীহারের বিয়ে দিচ্ছ?"

সহসা একটা প্রস্তরে আহত হইয়া যেন কমলার গতিশক্তি থামিয়া গেল। সংযত ভাবে মুখ তুলিয়া সে বলিল, "তাই এসেছ?"

"হ্যা।"

"তুমি কি বল? বিয়ে দেব না?"

"ও রকম পাত্রে দিও না।"

"কেন, পাত্র ত মন্দ নয়—দোজবরে এইমাত্র দোষ তেমনই ক'নেরও বয়স হ'য়েছে।"

"তুমি তা' হ'লে সব কথা জান না। বর আধ্‌বয়সি, নেশাখোর, গণ্ডমূর্খ চালচুলোহীন—এক কথায় অতি অপাত্র।"

"বেশ! তুমি পাত্র এনে দাও—কাল্‌কেই কিন্তু বিয়ে হওয়া চাই।"

"এর মধ্যে আমি পাত্র কোথায় পা'ব?

"তবে মিছে বাধাও দিও না।"

"তবু তোমার সঙ্কল্প ভাঙ্গবে না?"

"না।"

"তুমি কি জন্য—কি কারণে যে এমন হিংস্র জন্তুর মত প্রকৃতি ধরেছ, তা' আমি বুঝেছি—কিন্তু তা' উচ্চারণ করতেও আমার ঘৃণায় কণ্ঠরোধ হ'বে—আমি তা বলতে চাই না; কিন্তু সেই কারণেই তোমার এ অন্যায়ে—এ পাপে নিজেকেও জড়িত মনে কর্‌ছি! রাগ ও জেদের বশে তুমি যদি এত বড় অন্যায় কায কর ত লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাকেও এর অংশী হতে হ'বে। তাই বলছি, এখনও মাথা স্থির কর।"

"আমার মাথা খুব স্থির আছে। তুমিই তা'র ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছ, স্থির হয়ে শোন, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মানুষের কোন সম্বন্ধ নেই। যারা মানুষ, তা'রা যেন সে জন্তুকে কোন উপদেশ দিতে না আসে।"

"এখনও বল্‌ছি শোন, আমি শীগ্‌গিরই একটি ভাল পাত্র নিয়ে আস্‌ব; এ বিয়ে দিও না। নইলে শেষে তোমারই আবার ঐ নীহারকে নিয়ে চিরদিন ভুগ্‌তে হ'বে, বলে রাখ্‌ছি।"

"কিসের জন্য আমি নীহারকে নিয়ে চিরদিন জ্বল্‌ব পুড়্‌ব? কালই আমি জন্মের মত আমার সঙ্গে তা'র সম্বন্ধচ্ছেদ করে দিতে চাই। এই আমার শেষ কথা। আমি এর বেশী আর তাকে আমার ঘরে রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

"বেশ, তবে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও?"

"কোথায় দেব? কোন্ চুলোয়?"

"তা'র কি দূর সম্পর্কেরও কেউ কোথাও নেই?"

"না।"

"তবে আমার দিদির কাছেই পাঠিয়ে দাও। কানাই বাবুও তা' হ'লে সচেষ্ট হয়ে পাত্র খুঁজবেন।"

"আমি অত পার্‌ব না। যার গরজ থাকে, সে নিয়ে যাক্।"

"বেশ; আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

"এখনই এখনই—এই দণ্ডে নিয়ে যাও।"

"তবু মত বদ্‌লা'বে না? দু'দিন সময় দেবে না?"

"আমার ঘরে আর তা'র এক দিনের জন্যও স্থান নেই।"

"কেন? কিসে সে এত অপরাধী তোমার কাছে?"

"অপরাধ! শত্রু। সে আমায় ছোট থেকে জ্বালিয়ে আস্‌ছে, সে আমার এমনই চিরদিনের শত্রু; অথচ আমি চিরদিন তা'র ভালর চেষ্টা করে এসেছি। সে আমার সর্ব্বস্বের হন্তারক—আমার স্বামীকে সে আমার কাছ থেকে ভেদ করে নেয়, এর চেয়ে শত্রু আর কে হতে পারে?"

"যথেষ্ট যথেষ্ট, কমলা, আর না, স্বামীর উপর তোমার এমনই শ্রদ্ধা—এমনই বিশ্বাস—থাক্ সে কথা—তবু আমি দম্‌ব না। তোমার এত জেদ আমি রাখ্‌ছি না—কই, নীহার কোথায়?" অরুণ ক্ষিপ্রপদে নীহারের কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু নীহারকে লইয়া চলিয়া গেলেন।" কমলা এতক্ষণ বজ্রাহতার মত ছিল, এইবার উদ্যতফণ ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"এত দূর? বটে? তবে আমারও আজ থেকে সব শেষ।"

*   *   *   *   *

দুই মাস তাহার প্রত্যেক দিন, প্রহর, ঘণ্টা, যথারীতি পোহাইয়া

লইয়া কাটিয়া গেল। কমলা একটিমাত্র সংবাদের জন্য দিন রাত উৎকণ্ঠা ভোগ করিলেও সে সংবাদ পাওয়ার বাহ্যতঃ কোন উপায় করে নাই! সে সংবাদ আর কিছুই না—কেবল নীহারের বিবাহ হইল কি না? অরুণের এম্, এ, পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সহসা একদিন দেওয়ান অরুণের লিখিত দুইখানা কাগজ আনিয়া দিলেন, একটি একখানা হ্যাণ্ডনোট, দুই বৎসরের মধ্যে শোধ করিবার অঙ্গীকারে অরুণচন্দ্র রায় জমীদার শ্রীমতী কমলা দেবীর নিকটে যথারীতি সুদে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিতেছেন! অন্য খানায় দেওয়ানের উপর আদেশ যে, তিনি যেন অবিলম্বে পাঁচ হাজার টাকা কানাই বাবুর ঠিকানায় প্রেরণ করেন। দেওয়ান কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল, মা? টাকা ত পাঠাতে হ'বে? নইলে স্বর্গীয় কর্ত্তা বাবুর উইলের জোরে উনি আদালত থেকে এ টাকা বার করিয়ে নিতে পার্‌বেন।"

"বেশ ত, তাই হ'ক্! আমিও সেই রকমই চাই। খবর্দ্দার, আমার ষ্টেট থেকে যেন এক পয়সাও না দেওয়া হয়।"

কিন্তু কয়েক দিন পরেই দেওয়ান ম্লানমুখে আসিয়া জানাইলেন, জামাই বাবু আসিয়া নিজে খাতাঞ্জিখানায় ঢুকিয়া জোর করিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। কমলা একেবারে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল; "অকর্ম্মণ্য সব। কেউ বাধা দিতে পার্‌লেন না! আমায় একটা খবর দিতেও কা'রও সাহস হ'ল না? কেন আমার বাড়ীতে যা'র খুসী সে এমন করে ঢুক্‌তে পায়? দ্বারোয়ানরা কি জন্য আছে?" দেওয়ান ভীত মুখে বলিলেন, "মা! তারা কি তা'দের মনিবকে বারণ কর্‌তে পারে? আর আমরাই বা কোন্ সাহসে—?"

"কে মনিব? আমি ছাড়া তা'দের আর কেউ মনিব নেই। ডাকুন, আপনার দুর্ব্বল সিং পাঁড়েদের আর খাতাঞ্চিখানার ভীতুদের! আমি নিজে তা'দের হুকুম দেব, আমার বাড়ীতে তা'রা যেন আর ঢুক্তে না পায়। আমি ছাড়া তা'দের অন্য কেউ মনিব নয়! এ যদি তা'রা না মান্তে পারে—এই মুহূর্ত্তে তা'রা চলে যাক্, আমি নূতন লোক ভর্ত্তি কর্ব। আপনি এ কথা যদি মনে না রাখ্তে পারেন—পেন্সন্ নিয়ে কাশীবাস করুন গে।"

দেওয়ান ভয়ে ভরসায় আম্তা আম্তা করিয়া বলিলেন, "তা' তোমার হুকুম পেলে কেন তা'রা পার্বে না? আর আমরা ত তোমারি চাকর, মা! জামাই বাবু—"

"চুপ করুন; বাজে কথা আর নয়। এখনই সকলকে ডাকিয়ে ভাল করে এ কথা জানান্।"

তখনই জমীদার-বাড়ীর কীটাণুকীট পর্য্যন্ত জানিল, অরুণের ঐ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। এখন হইতে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভবিষ্যতে যে তাহাকে এ বাড়ীতে ঢুকিতে দিবে, তাহাকে তখনই যথোচিত দণ্ড দিয়া জমীদার-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বারবানদিগের উপরে এ হুকুম অতি কঠিনভাবে জারী হইল। কর্ত্তার আমলের লোক ঘনবরণ ও লছ্‌মন সিং কপালে হাত দিয়া উচ্চারণ করিল,—"বক্‌ত!" কেন না, এতদিনের ডাল-রুটির উপায় এইবার এ স্থান হইতে উঠিয়াছে বলিয়াই তাহাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিল। নূতন লোক রামদীন পাঁড়ে ও ভজু তেওয়ারী বীরত্ব প্রকাশের সম্ভাবনা পাইয়া ঘন ঘন গোঁফে তা দিতে লাগিল। বিস্ময় হাস্য ও করুণরস জমীদার-বাড়ীতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ধারার

মত নীরবে বহিতে লাগিল। অল্পদিনের লোকের বিস্ময়, হাস্য ও বিদ্রূপ এবং প্রাচীনগণের একটা নীরব "হায়!" শব্দের মধ্যে কমলা নূতন উদ্যমে পুরা জমিদারণী সাজিয়া তাহার বিষয়-সম্পত্তির নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তাহাকে এত দিন এ সব দেখিতে হয় নাই, তাই তাহার ষ্টেটে এত বিশৃঙ্খলা! নিত্য নূতন নিয়ম সংগঠনের জ্বালায় কর্ম্মচারিগণের অন্তর হইতে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও কোন উচ্চবাচ্য করিবার সাধ্য হইল না। দেওয়ানজী বেচারা বড়ই ক্ষোভে পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্যালক বা নাতি দুইটির একটির দ্বারাও সেই পাঁচ হাজার টাকা ঘরে লইয়া যাইতে না পারিয়া অরুণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ সেই নীল কাগজে মোড়া গহনাগুলি—তাহার চাকৃচিক্যরশ্মি এখনও যে দেওয়ানের বুকে ছুরীর মতই বিঁধিতে থাকে! ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক দিন কমলার নিকটে অরুণের এই অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের যথোচিত নিন্দা করিয়া এই অন্যায়ের প্রচুর প্রতিবাদ করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন, "একটা উপায় করিলে হয় না, মা?" কমলা এতক্ষণ সহিষ্ণু ভাবে চুপ করিয়া ছিল; পরের মুখে এ সব আলোচনা ও সহানুভূতি শুনিতে ভাল না বাসিলেও সহ্য না করিয়া উপায় নাই। এইবার দেওয়ানকে প্রসঙ্গান্তরে আসিবার আদেশ দিতে গিয়াও সে তাঁহার প্রশ্নে মুখ তুলিয়া নিজের অনিচ্ছায় উত্তর দিল, "কি উপায় আছে আর?"

"মেয়েটাকে লাঠিয়াল দিয়ে এই বেলা কানাই বাবুর বাড়ী থেকে কেড়ে আন্‌লে হয় না?"

কমলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি দরকার?"

"জামাই বাবু জোর করে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে কোন্ একটা অখা পাত্রের হাতে দেবেন হয় ত!"

"যা'কে ইচ্ছা দিক্!"

দেওয়ান অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা! শুধু শুধু জল যা'বে!"

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "পাঁচ হাজার টাকার কথা কি বল্‌ছেন—সেটার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, যদি কেউ আমায় এ খবর এনে দিতে পারে, তা'কে আমি আরও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দি।"

বেচারা দেওয়ান হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ইহার উপরে আর কথা চলে না, তবে—তবে সে সংবাদটা আনিয়া দিবার জন্য কি একবার চেষ্টা দেখিবেন? তিনি মনে মনে এই কথা ভাবিলেন, কিন্তু কমলার ভ্রূকুটীবদ্ধ ললাট ও ঘনান্ধকারময় মুখ দেখিয়া এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পাইলেন না!

এম্, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পরে পাত্র স্থির ও টাকার যোগাড় করিয়া অরুণ সানন্দে আসিয়া তাহার দিদিকে জানাইল যে, আগামী সপ্তাহেই মেয়েটির বিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছে।

দিদি বলিলেন, "যা হয় শীঘ্র কর, ভাই। পরের এত বড় আইবুড় মেয়ে বেশী দিন ঘরে রাখা ভাল দেখায় না। বৌও ত কোন খোঁজ-খবর নেয় না। ওখান থেকে কি বিয়ে হতে পার্‌ত না। কি জানি, তোমাদের কি ব্যাপার—তাও বুঝি না।"

এ কথার উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর অরুণ নীহারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। নীহারকে এই স্থানে রাখিয়া

সে নিজে মেসে থাকিত এবং দুই এক দিনের বেশী তাহার সহিত সাক্ষাৎও করে নাই।

নীহারের সঙ্গে সাক্ষাতে কিন্তু তাহার শীঘ্র ভারমুক্তির আশায় উৎফুল্ল মন একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। নীহার ত প্রথমে কথাই কহিল না; বহু চেষ্টায় শেষে গভীর ক্রন্দনের মধ্যে এমন অবোধ্য ভাবে তাহার নিকটে যোড়হাত করিয়া একটা দুর্ব্বোধ্য ভিক্ষা জানাইল যে, অরুণ তাহার অর্থই আবিষ্কার করিতে পারিল না—"আমার জন্য অন্য কোন চেষ্টা আর কর্‌বেন না, আমায় এমনই ভাবে এই স্থানে চিরদিন থাকতে দিন।" বহু যুক্তি-তর্কের দ্বারাও অরুণ তাহার সে ভিক্ষাপূর্ণ মিনতি ও ক্রন্দন নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তাহার এক কথা—"আমি এঁদের দাসীবৃত্তি করে থাকব। চাকরাণীর দরকার সকলেরই আছে। আপনি না হয় চলে যান্—আমিই আমার জায়গা করে নেব ক্রমে।" এ কথার অসারতা অরুণ নির্ব্বোধ নীহারকে কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া অগত্যা সে দিন বিরক্তচিত্তে চলিয়া গেল। কিন্তু বিবাহের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, নীহার ততই একেবারে শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার শীর্ণ দুর্ব্বল শরীর একেবারে যেন বহুদিনের রোগীর দেহের আকার ধারণ করিল। তাহার কোন পীড়া হইয়াছে ভাবিয়া গৃহস্থ সকলে উদ্বিগ্ন এবং একটু যেন বিরক্তও হইল; কিন্তু অরুণ বুঝিল যে, নির্দ্ধারিত বিষয়ে অনিচ্ছাই তাহার এ অবস্থার মূল। পাছে লোক জানাজানি হইয়া সকলের বিস্ময় ও বিরক্তি উৎপাদিত করে, এই ভয়ে অরুণ তাহার বিরক্তি ও ক্রুদ্ধভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া দুই বেলা আসিয়া নীহারকে যুক্তি ও অনুনয়ের দ্বারা বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কমলার সহিত বিবাদ করিয়া এইরূপে সে যে কি বিভ্রাটই স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, এখন তাহার

দায়িত্ব সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। নিজেদের যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এ বিপদ্ হইতে সে উদ্ধার পাইলে বাঁচে। নীহারের উপরে তাহার চিরদিনের সে স্নেহভাব কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। নীহারের প্রকৃতিবিরোধী এরূপ উদ্ধত ভাব সে আর কখনও দেখে নাই, তাহার ভয় হইতেছিল, জোর করিয়া বিবাহ দিতে গেলে পাছে নীহার কোন কেলেঙ্কারীই বা করিয়া বসে! অসুখ হইয়াছে বলিয়া অরুণ বিবাহের দিন আর এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিল।

অরুণের দিদির এইবার ভয়ানক রাগ হইল। গোড়াগুড়িই তাঁহার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার অরুণের ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহটা এইবার স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইল। তবে আগাগোড়া না জানিলে যেমন সকলেই এ ক্ষেত্রে একটা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই অতি সহজে করিয়া বসে, অরুণের দিদিও সেইরূপ ভুল করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এ বিবাহ দেওয়া অছিলা মাত্র—ধাড়ী আইবুড় মেয়েটা দেখ্‌ছি অরুণকে 'গছে' বসেছে! বৌটা তা' সইতে না পারায়—তাই এইখানে এনে লোক দেখানো একটা বিয়ের ধুয়ো তুল্‌ছে মাত্র। মেয়ে তাতে একেবারে "ধরাশয্যা" নিলেন—আর ছেলে অমনই দিন পেছিয়ে দিয়ে দুই বেলা তার সঙ্গে কিসের যে এত খোসামুদি সুরু করলেন। যে রকম গতিক দেখছি, অরুণটা শেষে বিয়েই দেব না বলে বস্‌বে না কি? আমারও ত এ ভারি কলঙ্কের কথা হল। বৌটাই বা মনে করছে কি যে, ঠাকুরঝিও বুঝি এর মধ্যে আছেন।" যদিও ধনিকন্যা ভ্রাতৃবধূকে তিনি কখনও দেখেন নাই (অরুণকেই শ্বশুরগৃহে আসার পর এ পর্য্যন্ত আর দেখা ঘটে নাই বলিয়া কানাই বাবু পরিচয় না দেওয়া পর্য্যন্ত শৈশবদৃষ্ট শিশু ভ্রাতাটিকে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ভ্রাতার চরিত্রসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ-

তাই তাঁহাকে এতটা ভুল করাইল!) তথাপি এখন সেই ভ্রাতৃবধূর উপর সহানুভূতিতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি তাঁহার ননন্দার কর্ত্তব্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আঘাতও বোধ করিলেন। সেই দিন তিনি কমলাকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ; জগতের কিছুই জান না। এ রকম ব্যাপার তো সর্ব্বত্রই প্রায় ঘটিয়া থাকে; তাই বলিয়া কি এইরূপে স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে হয়? পুরুষ ত বাঁধন কাটিতেই সর্ব্বদা উৎসুক; ইহা তাহাদের জাতীয় গুণ, মেয়ে মানুষের সর্ব্বদা তাহাদের পায়ে শিকল দিয়া ঘরে আট্‌কাইয়া রাখা উচিত! ছাড়িয়া দিলেই বিপদ্। পরের উপর রাগ করিয়া এমন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ কি করিতে আছে! এই বেলা স্বামীকে ও মেয়েটাকে নিজের কোর্টে লইয়া গিয়া মেয়েটার একটা বিবাহ দিয়া ফেল, নহিলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আমি আর বেশী দিন যে ভাইয়ের অনুরোধে অতবড় ধেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখিতে পারিব, তাহা বোধ হইতেছে না। তুমি এই বেলা সতর্ক হও। কমলার আগুন ধরিতে যেটুকু বাকী ছিল, এই পত্র সেটুকু পূরণ করিল। কমলা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সে দিন অরুণেরও ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল—তীব্রকণ্ঠে সে নীহারকে বলিয়া ফেলিল,—"এমন জান্‌লে কি তোমার জন্য এত কাণ্ড করি! এখন দেখছি, কমলার ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে ঠিক হচ্ছিল,—বাধা দিয়ে আমি অন্যায় করেছি। যা'র হৃদয়ে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই—এমন স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকুও নেই যাতে—" অরুণের রোষদগ্ধ বাক্য অর্দ্ধ-পথে সহসা বাধা প্রাপ্ত হইল। সে দেখিল, নীহার ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার যন্ত্রণাসূচক গোঁঙানির মধ্যে

এই কয়েকটি কথা অরুণের কানে গেল—"বলো না—তুমি ও কথা বলো না—একটু দয়া কর—আমায় মেরে ফেল!"

অরুণের হৃত বুদ্ধি যখন আবার ফিরিয়া আসিল—সে দেখিল, তখনও নীহার তাহার পদতলে মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া আছে। পা সরাইয়া লইয়া অরুণ বাহিরে চলিয়া আসিল। তাহার অন্ধকার মনের মধ্যে এত দিনে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু সে অগ্নির দাহিকাশক্তি আজ কিসে সে নিবাইবে?

পরদিন প্রভাতে আসিয়া অরুণ গম্ভীরকণ্ঠে নীহারকে ডাকিল, "উঠে এস।"

তাহার আগমনে নীহার কোণে মুখ লুকাইয়া বসিয়া ছিল,—দুইবার আহ্বানের পর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

"কমলের কাছে!"

নীহারের সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রস্তরীভূত হইয়া পড়িল—কোন শব্দ বা একটু অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতাও তাহার রহিল না।

"এখনও অবাধ্যতা? কমলার কাছে আমি যে অপরাধ করেছি, তা'র এই-ই প্রায়শ্চিত্ত! এ না কর্‌তে পারলে এ জীবনে তা'র কাছে আর আমার মুখ দেখানই হ'বে না। তোমার ভয় নেই; তোমায় কোন কষ্ট পেতে হ'বে না। আমার নির্ব্বুদ্ধিতাই যে তা'কে এমন কঠিন করে তুলেছিল, তা আজ আমি বুঝ্‌তে পারছি। তোমার উপর যথোচিত কর্ত্তব্যই সে কর্‌বে, তা'র হাত দিয়েই তোমায় আমি পাত্রস্থা কর্‌ব। উঠে এস!"

নীহার তথাপি নড়িল না!

"তুমি কি মনে স্থির সঙ্কল্প করেছ যে, চির জীবনে তা'র কাছে আমায়

আর মুখ দেখাতে দেবে না? যে তোমার ভালর জন্য এত করেছে—আজীবন তোমার বড় ভাইয়ের তুল্য স্নেহ করে এসেছে—শেষে বুদ্ধির ভুলে এত সয়েছে তা'র চিরজীবনের মত সর্ব্বনাশ না করে তুমি ক্ষান্ত হবে না? এই তোমার পণ? তুমি কি মেয়ে মানুষ?"

ধাতু মূর্ত্তি ঠেলিয়া দিলে তাহা যেমন ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে তেমনই করিয়া নীহার যাইয়া অরুণের নির্দ্দিষ্ট শকটে আরোহণ করিল। অরুণও দিদিকে প্রণাম করিয়া "বাড়ী যাইতেছি" জানাইয়া কোচবাক্সে উঠিল। দিদি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দুর্ভাবনার দায়ে বাঁচলাম। অরুণ ত খুব ভাল ছেলেই জান্‌তাম; ডাইনী মায়া দিয়ে ছুঁড়ি যেন ওকে ঘিরেছিল! গেল তা' একটা প্রণামও করলে না। না করুক, অরুণ এখন বৌয়ের কাছে পৌঁছুলে বাঁচি।"

দ্বারবানদিগের নিষেধ বাক্যের অপমানও সহ্য করিয়া অরুণ কমলার নিকটে সংবাদ পাঠাইল। সে সংবাদের উত্তরে যে আদেশ আসিল, তাহাতে দ্বারবানরা গেট বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। জমীদার কমলা দেবীর সঙ্গে অরুণের কোন সম্পর্কই নাই!

প্রকাশ্য দিবালোকে—অসংখ্য পরিচিত চোখের দৃষ্টির সম্মুখে নিশ্চেষ্ট জড়প্রায় ভৃত্যবর্গের নিকটে আর ত দাঁড়াইয়া থাকা চলে না—পাছে কেহ কোন কথা কহিয়া বসে!

অরুণ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। গাড়োয়ান হাঁকিল "কোথায় যাইতে হইবে? ষ্টেশনে?" অরুণ দূরস্থ একটা গ্রামের নাম করিলে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

ক্রোশের পর ক্রোশ এইরূপ নীরবে অতিবাহিত করিয়া অরুণ সহসা

নীহারকে প্রশ্ন করিল, "তোমার যদি কোথাও আত্মীয়স্থান থাকে—এই বেলা বল ; আমি পৌঁছে দিতে পারব।"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোথাও কেহ নাই।

"কোথাও কেউ নেই ? সর্ব্বত্র সমান ?"

নীহার ঘাড় নাড়িল—"হাঁ।"

"তবে এইখানেই নেমে যাও। গাড়োয়ান গাড়ী থামাও !"

গাড়ী থামিল।

"নাম !"

নীহার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—অজানা স্থান, অদূরে গ্রাম—মাঠের মধ্যে টানা রাস্তা—পার্শ্বে একটা পুষ্করিণী। আড়ষ্ট হইয়া নীহার পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল দেখিয়া অরুণ রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তোমার মতলবটা কি ?"

"কোথায় য'াব ?" উচ্ছ্বসিত রোদনে নীহারের কণ্ঠরোধ হইল।

অরুণ পূর্ব্বের মত কঠিন স্বরে বলিল "যেখানে ইচ্ছা ! তোমার সঙ্গ আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।"

নীহার এইবার ধীরে ধীরে শকট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল ! অরুণ পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিতে গেল, "কর্ত্তার তোমায় দেওয়া টাকা। কোন ভাল লোকের আশ্রয় নিয়ে এরই সাহায্যে তোমার জীবনটা একরকমে কাটাতে পার্‌বে। নাও। টাকা নেবে না ? এখনও তোমার অবাধ্যতা ?"

অরুণের সম্মুখ হইতে গাড়ীর পশ্চাতের দিকে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে হইতে নীহার অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, "টাকার দরকার হবে না।"

শকটের অন্য দিকের কপাট খুলিয়া ফেলিয়া অরুণ সরোষে নোটের তাড়াটা রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিয়া নীহারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "নাও না নাও তোমার ইচ্ছা। আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলাম।" তাহার পর সে গাড়োয়ানকে বলিল, "গাড়ী হাঁকাও!"

বিস্মিত গাড়োয়ান বলিল, "বাবু ওঁকে এমন জায়গায় কেন নামিয়ে দিলেন? সাম্‌নে পুকুর! আর ও রকম বয়সের মেয়ের জাত ধর্ম্মের কথা ভাবলেন্ না? এমনই করে ওঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন,—বড় লোক—ভদ্র লোক আপনারা পারেন—আমরা চাষা—আমরা এ পারি না, তা' যতই হোক্।"

"গাড়ী চালাও না।"

গাড়োয়ান বেচারা অনিচ্ছুক ভাবে ধীরে ধীরে গাড়ী হাঁকাইল। কিছু দূরে গিয়া সহসা অরুণ গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিয়া ফেলিল—নীহারকে দেখা যাইতেছে না! মুহূর্ত্তে অরুণ চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পশ্চাৎ দিকে ছুটিয়া চলিল; নিকটে গিয়া দেখিল, মূর্চ্ছিতার মত নীহার পুষ্করিণীর ধারে পড়িয়া আছে। অরুণ নিঃশব্দে পুষ্করিণী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহার চোখে মুখে দিতে লাগিল এবং ব্যাপার দেখিয়া ভীত হতবুদ্ধি গাড়োয়ান গাড়ী নিকটে আনিলে হাত ধরিয়া নীহারকে গাড়ীতে তুলিল। সে গাড়ী ফিরাইয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইতে আদেশ দিলে গাড়োয়ান তাহার ভাড়ার চতুর্গুণ দাবীতে অরুণকে সম্মত করাইয়া শেষে বলিল, "বাবু নোটের তাড়াটা কি ফেলে যাবেন? ওটাও তুলে নিন! আপনাদের মত বাবু গাড়ী ভাড়া কর্‌লে নানারকম হাঙ্গামে পড়ে কি যে কপালে না ঘট্‌তে পারে তাত ভেবে পাচ্ছি না! এখন আপনাদের আমার গাড়ী থেকে উৎরাতে পার্‌লে বাঁচি। আজ কা'র

মুখ দেখেই যে উঠেছিলাম।" অগত্যা অরুণ ভাবিয়া চিন্তিয়া নোটগুলাও তুলিয়া লইল।

কয়েক দিন পরে দেওয়ানজী একটি পাঁচ হাজার টাকার ইন্‌শিওর করা রেজেষ্ট্রী খাম এবং একখানা পত্র আনিয়া কমলার হাতে দিলেন। পত্র অরুণের—সে লিখিয়াছে—

"৺কর্ত্তার দেওয়া পণস্বরূপ এ পাঁচ হাজার টাকা আর নীহারের বিবাহের জন্ম প্রয়োজন হইল না। আমিই তাহাকে বিবাহ করিয়াছি। সে কারণে ফেরত পাঠাইলাম।"

৬

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অরুণ এখন প্রফেসরি করে। নীহারের একটি কন্যা হইয়াছে। তিন বৎসরের কন্যা লীলাই অরুণের একমাত্র ধ্রুবতারা; আর দ্বিতীয় আলমারীস্থ পুস্তকগুলি। কলেজ হইতে অধ্যাপনা কার্য্য সারিয়া গৃহে আসিয়া অরুণ সেই যে তাহাদের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়ে নিদ্রাভরে চক্ষু বুজিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের ছাড়ে না। কেবল লীলাই মাঝে মাঝে তাহাকে যা' একটু অন্যমনা করে।

নীহার মধ্যে কিছুদিন পশ্চিমের হাওয়ায় এবং নবজীবনের প্রফুল্লতায় নব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আবার বাল্যের ক্ষীণতা তাহাকে অধিকতর ভাবে অধিকার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে; মাতার রোগ—সেই যক্ষ্মা—তাহাতে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়াছে। সে জন্য অরুণ যথারীতি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী উপকার বুঝা যায় নাই, রোগটা চাপা ভাবে আছে এইমাত্র।

নীহার আর সহ্য করিতে পারে না। তাহার ক্ষীণ ধাতু এ বিষকে

অহরহঃ আর জীর্ণ করিতে পারে না। সে এখন বেশ বুঝিয়াছে, ঘটনা-পরম্পরা ঘটাইয়া ভাগ্য তাহাকে যাহা দিয়াছে তাহা তাহার ভোগ্য নহে। তাহা সম্পূর্ণ পরস্ব। এত যন্ত্রণা এত কষ্টের পরে জীবনসমুদ্র মন্থিয়া তাহার ভাগ্যে যাহা উঠিল, তাহা বিষ,—সুধা নহে! তাই তাহার দুর্ব্বল দেহপ্রাণ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

সহসা একদিন সে অরুণকে প্রশ্ন করিল, "যদি আমি মরে যাই?"

অরুণ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "আবার কি জ্বর হচ্ছে? কাশি আর বুকে ব্যথা কমে নি কি একটুও?"

"তা' জানি না! কিন্তু আমি যদি মরি—লীলাকে কে দেখ্‌বে?"

লীলা তখন বারান্দায় খেলার গাড়ী টানিয়া বেড়াইতেছিল; কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অরুণ সনিঃশ্বাসে বলিল, "কি জানি!"

স্বামীকে পুনর্ব্বার পুস্তকে মন দিতে দেখিয়া নীহার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দ্যাখ—আমার মনে হয়, আমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌ব না!"

"শরীর কি আবার বেশী খারাপ বোধ করছ?" অরুণ হস্তস্থ পুস্তক এইবার নামাইয়া রাখিল; পত্নীর মুখের পানে ক্ষণেক চাহিয়া বলিল, "চল, কলকাতায় গিয়ে তোমার চিকিৎসা করাই গে।"

নীহার সনিঃশ্বাসে বলিল, "কলকাতায় গেলে ত লীলার কোন উপায় হবে না; আমার অন্য এক জায়গায় যেতে ইচ্ছে হয় এক একবার।"

অরুণ বুঝিল; ক্ষণপরে গম্ভীরমুখে পুস্তক খুলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "সাহস হয়?"

"একা হ'লে হ'ত না। লীলার জন্য হয়।"

বহুক্ষণ আর কেহ কথা কহিল না—শেষে অরুণ বলিল, "ও সব

চিন্তা ছেড়ে দাও। চল কলকাতায় তোমায় নিয়ে যাই ; নইলে এখানে সার্‌তে পার্‌বে না দেখ্‌ছি।”

কলিকাতায় গিয়া নীহারের রীতিমত চিকিৎসা করাইয়াও পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একটা নূতন বাতিকও নীহারের মনে সর্ব্বদা খেলা করিতেছে ; কেবল অরুণের বিরক্তির ভয়েই যে সে কথা সে ফুটিতে পারিতেছে না তাহা অরুণ বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। যে দিন ডাক্তার নীহারের জীবনের আশা নাই জানাইল, সে দিন নীহারও যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া অরুণকে টাকার জন্য এবং অন্য কোন গুরু-তর প্রয়োজনে একবার এলাহাবাদ যাইতে হইয়াছিল। দিন দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া অরুণ দেখিল, ভৃত্য ও লীলাকে লইয়া রুগ্না নীহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে ; দাসীর কাছে বলিয়া গিয়াছে, বাপের বাড়ী বড় ভগিনীর কাছে যাইতেছি! অরুণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া সেই রাত্রিতেই আবার এলাহাবাদ চলিয়া গেল। উন্মনাভাবেই কয় দিন কাটিল,—অরুণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে যখন কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে একখানা টেলিগ্রাম তাহার হস্তে পৌঁছিল! “মা বাঁচেন না, শীঘ্র এসো—লীলা।” অরুণের হস্ত হইতে টেলিগ্রামের কাগজখানা পড়িয়া গেল—“নীহার যাবার সময়ও এ কি বাদ সাধ্‌ছ? এ কি অলঙ্ঘ্য নিয়তিসূত্রে তোমার সঙ্গে আমি জড়িত? আর তুমি? তোমারও এ কি নিয়তি? মর্‌বার সময়ও কি একটু শান্তিতে মর্‌তে পার্‌লে না? তুমিও বড় হতভাগ্য!”

এক দিন যে প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়া তাহাকে সে গৃহ হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল, সে-ই আবার পাঁচ বৎসর পরে কর্ম্মসূত্রের মত তাহাকে

সেই গৃহে টানিয়া আনিল। অরুণ কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া উৎসুক কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ মাত্র না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া রুগ্নার কক্ষে প্রবেশ করিল; দেখিল বিছানার সঙ্গে মিশিয়া নীহার শয্যায় পড়িয়া আছে। ব্যাধিক্লিষ্ট মুখে শান্তির—তৃপ্তির সুখচ্ছায়া! অরুণকে দেখিয়া সে মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"এসো!"

পার্শ্বে বসিয়া উদ্বিগ্ন মুখে অরুণ বলিল, "কেমন আছ নীহার" ?

"খুব ভাল আছি—বড় শান্তিতে আছি। তুমি যে আস্‌বে—আমার এ সময়ে, রাগ করে থাক্‌বে না—তাও জান্‌তাম! আজ আমার আর কোন দুঃখ নেই!"

"কেন এলে, নীহার? এখানে এ সময়ে কেন এলে?

মনস্তাপের হাসি হাসিয়া নীহার বলিল, "কেন এলাম? না এলে কি আমার মরারও উপায় ছিল? তুমি এক দিন প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য এখানে আমায় নিয়ে এসেছিলে; কিন্তু তখন বিধির বিপাকে তা হয় নি, আমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন—এখানে আমি আবার ছোট বেলার মত স্থান পেয়েছি—সুখ পেয়েছি—অভয় পেয়েছি! লীলার ভাবনাও আজ আর আমার নেই! এখানে না এলে কি আমার মরে সুখ হতো?"

অরুণ বুঝিল, নীহারের আর বড় বেশী সময় নাই! সে সজল নয়নে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "লীলা কই?"

"তা'র বড় মা'র কাছে।"

অরুণ নীরবে তখন নীহারের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে নীহার এক একবার যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

অরুণ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন ললাটে হাত বুলাইতেছিল আর পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটা চির-ঈর্ষ্যাপূর্ণ হৃদয় বুঝি নীহারের মৃত্যু দেখিয়া এই মৃত্যুকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত সুখ বোধে তৃষিত নয়নে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল! জীবনের সর্ব্বসার্থকতার বিনিময়ে সে যদি এমনই করিয়া মরিতে পাইত, তাহা হইলে সে আজ আর অন্য কিছু চাহিত না!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। নীহার চোখ মেলিয়া ডাকিল, "দিদি, কমল দিদি!"

কমলা নিঃশব্দে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—"বোন!"

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া নীহার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দিদি তোমার ধন এক দিন আমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—আজ আবার ফিরিয়ে দিতে এসেছি! তোমারি সব—আমি কেবল দুদণ্ডের অতিথি মাত্র। দিদি, জোর করে কি কেউ কারুর বিধিদত্ত সম্পদ কেড়ে নিতে পারে? পারে না, এক দিনের জন্যও পারে না। তোমাদের দয়ায় ক্রমশঃ প্রশ্রয় পেয়ে আমি কুকুরের মত মাথায় উঠেছিলাম বটে—কিন্তু তার পরেই নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার ধন আমার নেবার সাধ্য কি? তোমরা যা' তাই আছ—মাঝ্‌খানে আমি দুঃস্বপ্নের মত উঠে আবার তেমনই মিলিয়ে যেতে চাই! এই নাও, দিদি, তোমার জিনিস এবং আমারও যথাসর্ব্বস্ব—লীলা, সব তোমায় দিয়ে গেলাম। আজ আমায় ছোট বোনের মত বিদায় দাও, দিদি, আমি তোমার ছেলেবেলার সেই নীহার বলে মনে কর।" আবেগে নীহার মূর্চ্ছিতার মত হইল। কমলা ধীরে ধীরে তাহার ললাটে হস্তার্পণ করিল। তথন শুশ্রূষায় সংজ্ঞা পাইয়া সে অতি কষ্টে বলিল, "আমি আজ বড় সুখী! তোমার জিনিস তোমায় দিয়ে"—

নীহার আর বেশী কথা কহিতে পারিল না—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার বিবর্ণ ললাটচুম্বন করিয়া অরুণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "জন্মান্তরে তুমি সুখী হইও !"

সংকারাদি হইয়া গেল। প্রভাতে লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বড় মা ! মা কই ?" কমলা নিঃশব্দে তাহাকে কেবল বুকে তুলিয়া লইল—কোন উত্তর দিতে পারিল না ! বালিকা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"বাবা ?" সেবারেও কোন উত্তর না পাইয়া বালিকা আবার কাঁদিয়া উঠিলে কমলার ইঙ্গিতে একজন অরুণের সন্ধানে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া আসিয়া সংবাদ দিল "তাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। হরি বল্‌লে, ভোরে তিনি বেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে গেছেন ; বোধ হয় এলাহাবাদেই চলে গেছেন।"

মা নাই—বাবা চলিয়া গিয়াছেন—ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। রোদন কি কোন একটা কথা—কিছুই যেন আর তাহার মুখে ফুটিতে পারিতেছে না ! তাহার অসহায় ভীত মুখচ্ছবি কমলাকে একান্ত ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল ; সে সর্ব্বদাই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার খেলানা দিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু পিতার অনুগতা বালিকা যে মাতা অপেক্ষাও পিতার জন্য কাতর হইয়াছে, তাহা কমলা বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু উপায় নাই—কোন উপায় নাই ! তাহাকে আসিতে বলার অধিকার যে কমলা সেই নিদারুণ দিনে কয়েক মুহূর্ত্তস্থায়ী উত্তেজনার প্রভাবে চির জীবনের মত হারাইয়াছে ! যাহা সে হারাইয়াছে তাহা আজ তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। কেবল এক একবার তাহার

মনে হইতেছিল, নীহারকে ত স্বেচ্ছায় সে কিছুই দেয় নাই—কিন্তু সে অবলীলাক্রমে তাহার সমস্ত তাহাকে হাসিমুখে দিয়া গেল! আর সেই নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর—পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ—তাহাকে কি কমলা কিছুই দেয় নাই? সেই আকৌমার যৌবনের যত ন্যায় অন্যায়—মান অভিমান—রাগ ঈর্ষ্যা—প্রণয় কলহের মধ্যে,—এই দীর্ঘ পাঁচ বর্ষব্যাপী অবিশ্রান্ত তুষানলের জ্বালার মধ্যে কমলা এ কাহার উদ্দেশে জীবনের সর্ব্বোত্তম সার সর্ব্বস্বটুকু নিবেদন করিয়া আসিতেছে? বাল্যের সেই সরল অভিমান—যৌবনের সেই অতৃপ্ত পিপাসার ক্ষোভ—বিরহের এই অনুতাপময় অশ্রু—এ কোন্ পাষাণের উদ্দেশে চির দিনই এক স্রোতে একটানা ভাবে বহিতেছে—ঝরিতেছে? পাষাণ সে, পাষাণ হইতেও হৃদয়হীন! তাই সে কেবল মানুষের অপরাধ দেখিতে—বুঝিতে জানে—তা' ছাড়া তাহার আর কিছু বুঝিবার [illegible]।

আবার—আবার এই অভিমান!—[illegible] আবার অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিল। এই যে লীলাকেও [illegible] করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে—এ কাহার করুণায়? যদি সে লীলাকেও লইয়া যাইত? এ [illegible]টুকু পাইবার মত মুখও কি কমলা রাখিয়াছে? কমলা কি [illegible]?

না—না আমার জন্য নয়—ওগো আমায় তুমি এই যাহা দয়া দেখাইয়াছ আমার পক্ষে এই ঢের! কেবল তোমার লীলার জন্য বলিতেছি—মাতৃ-পিতৃহারা সে যে কিছুতে শান্ত হয় না! একবার শুধু তাহার জন্য তুমি এস! আমায় কথা কহিও না—আমার কাছে আসিও না—কেবল আর একবার এস!

*   *   *   *

এক মাস পরে অরুণ আবার বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল; আবার সে একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছে, "বাবা, এসো আমার বড় অসুখ। লীলা।" সংসারের শেষ সম্বন্ধসূত্রটুকুও বুঝি এইবার ছিন্ন হয়! "এই আমার উপযুক্ত!" ভাবিতে ভাবিতে অরুণ পথ অতিবাহিত করিল।

লীলার ক্ষীণ রুগ্ন দেহ বক্ষে তুলিয়া অরুণ বলিল "লীলা—লীলা—আমি এসেছি, মা—তোমার চণ্ডাল বাপ এসেছে।"

দুই হাতে পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া লীলা বলিল, "আর চলে যা'বে না?"

"না।"

"আমার কাছে থাক্‌বে?"

"একটু ভাল হও, তোমায় এলাহাবাদে নিয়ে যাব!"

"সেখানে কা'র কাছে থাক্‌ব? সেখানে যে বড় মা নেই!"

অরুণ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বালিকার পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ প্রশ্নে বলিল, "আমার কাছে থাক্‌বে! তাই ত তুমি আগে থাক্‌তে, লীলা! এখন কি আর তা' পার্‌বে না?"

লীলা ভাবিয়া বলিল, "না, আমি বড় মা'র কাছে থাক্‌ব।"

অরুণ লীলার পুতুল ইত্যাদি টানিয়া আনিয়া এ প্রসঙ্গকে চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল; কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

অরুণ ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিল, পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া কমলা নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছে। অরুণ একটা পুতুলের প্রতি মনঃসংযোগ করিল। কমলা নীরবে লীলাকে পথ্য সেবন করাইবার পর বালিকা হাসিমুখে দুই একটা কথা কহিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চুপ করিয়া থাকা আর ভাল

দেখায় না বুঝিয়া অরুণ মৃদুস্বরে বলিল, "লীলা কত দিন এমন ভাবে শয্যাগত হয়েছে ?"

কমলার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল—কত দিন—কত কাল পরে! বহু কষ্টে সে ভাব দমিত করিয়া সে বলিল, "দিন পাঁচ ছয়—বেশী দিন নয়।"

"ডাক্তার কি বলে ?"

"বলে, ভয় নেই—মন ভাল হলেই সেরে যাবে।"

অরুণ যেন আপন মনে বলিল, "সার্‌বে কি আর ?"

কমলা একটু মুখ তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এখন সার্‌বে! কোন দিন এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোয় না। সেই হচ্ছে ওর প্রধান অসুখ।"

অরুণ তেমনই নীরবে বসিয়া রহিল। আবার ক্ষণিক ইতস্ততঃ করিয়া কমলা বহু কষ্টে বলিল, "একটু জিরুলে হ'ত; অনেকটা পথ আসা।"—অরুণ নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দার উচ্চ রেলিংএ ললাট রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যেন তাহার হাঁফ ধরিতেছিল—সে বাহিরের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গৃহমধ্য হইতে কমলা নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে লীলার ক্ষীণ আহ্বানে আবার অরুণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। লীলা বলিল, "বাবা তুমি আমার কাছে বস্‌বে ?"

অরুণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

"না—বড় মা কেমন আস্তে আস্তে মিষ্টি মিষ্টি বাতাস করে! তুমি শুধু গল্প কর; বড় মা বাতাস করুক।" হাতখানি হাতে তুলিয়া লইয়া অরুণ আদর করিতে লাগিল। আরামে বালিকা আবার শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

কতকাল পরে উভয়ে এত কাছে! বহু—বহু—কাল! বুকের মধ্যে কত দুঃখ—কত অপমানের—অভিমানের শেল ওতপ্রোতঃ ভাবে হানিতেছিল। আর উভয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, বক্ষের অতি দ্রুত স্পন্দন এক একবার যেন থামিয়া যাইতেছে। বড় কষ্টকর অবস্থা!

কমলা উঠিল; ধীরে ধীরে অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ নিস্পন্দ—শ্বাসহীন! সহসা কমলা বসিয়া পড়িয়া জোড় হাতে আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল,—"বল, অনুমতি দাও—একবার পা ছুঁই?"

অরুণ দেহে মনে চমকিয়া উঠিয়া এতক্ষণে কমলার পানে চাহিল। এই কি সেই কমলা? এ যে এক জন্মের মধ্যেই নূতন জন্ম গ্রহণ! এই দীনা মলিনা ভিখারিণীর মত প্রার্থনাঞ্জলিবদ্ধা কি সেই রাজরাজেশ্বরী কমলা?

"তবে কি এখনও ছুঁতে পা'ব না? এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নি? আরও কি বাকি আছে কিছু? বল বল একবার।"

"কমলা!" অরুণের মুখের কথা মুখে রহিল; উন্মাদিনীর মত কমলা গিয়া তাহার জানু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল। বহু চেষ্টায়ও অরুণ পা ছাড়াইয়া লইতে পারিল না।

কতক্ষণ পরে কমলা মুখ তুলিল। অরুণ নির্নিমেষ নেত্রে সে মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে যেন কত জন্মের সঞ্চিত প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস একত্রিত হইয়া সে মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে! সেই অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইতে যেন জন্মজন্মান্তরের ব্যর্থ বাসনা—বেদনার অভিমান নীরবে গলিয়া বহিয়া পড়িতেছে! অরুণ রুদ্ধকণ্ঠে আবার ডাকিল "কমলা!" কমলা আবার সজোরে স্বামীর জানুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

"ওঠ, কমলা! আর আমার পাপের বোঝা বাড়িও না। তোমার ক্ষমা চাইবার মুখ আছে, আমার তা'ও নেই!"

"হাঁ আমার তা' অধিকার আছে, বল—স্বীকার কর আমার এ জায়গা আমি ছুঁতে পারি তুমিও আমায় এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পার না। স্বীকার কর্‌ছ ত?"

"কমলা, কি বল্‌ছো? কোথায় তোমার স্থান ছিল তা' কি তুমি জান্‌তে না? কিন্তু তা তুমি এক দিন বুঝি চাও নি তাই চেনো নি!"

"চির দিনই চেয়েছি, পেয়েছি, জেনেছি, আবার তুচ্ছ অভিমানে তা' ভুলে গেছি! মূর্খ আমি—অজ্ঞান আমি—অল্পবুদ্ধি আমি! বল, ক্ষমা করেছ।"

"ওঠ কমলা ওঠ—আর না! আর পারি না!"

"পার্‌ছ না আমায় সহ্য কর্‌তে? পায়ে জায়গা দিতে পারছ না?"

"না—না। ও জায়গা ত তোমার নয়। আমারও ত তোমার মাথার উপরে এ স্থান নয়। দু'জনেই দোষ করেছি, ভুল করেছি; তবু আমাদের চির দিনের স্থানই পেতে চাই—দিতে চাই। নাও তাই—পায়ে নয়, তোমার স্থান তুমি নাও—আর আমার স্থান আমায় দাও।" অরুণ সজোরে কমলাকে বক্ষে টানিয়া লইল।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

স্নেহের সার্জ্জারী

১

ডাক্তার নবীনচন্দ্রের বয়স কিছুতেই আর বাড়ে না, সেই যে কবে সে ২৫ বৎসরের হইয়াছে আজিও সেই পঁচিশ আর পঁচিশ। পরিহাসপ্রিয় রমেশ বলে, "নবীনের এক এক ঠ্যাঙে পঁচিশ বচ্ছর, হাত পা সব ধরলে ওর বয়েস আশীর কম নয়।" কিন্তু আমরা জানি সে কথা মিথ্যা কারণ সে আমাদেরই বন্ধু। হয়তো তাহার বয়স ত্রিশ না হয় পঁয়ত্রিশ কিন্তু সে কথা মনেই হয় না, কারণ এমনই তাহার বালকের মত স্বভাব, এমনই তাহার সদানন্দ ব্যবহার যে তাহার নিকট দাঁড়াইলে অনেক ২০ বৎসরকেই ৪০ বৎসর মনে হইতে পারে। না আছে তার কাপড় চোপড়ের ঠিক, না আছে তার সময় অসময়ের নিয়ম, না আছে তার কথাবার্ত্তার বাঁধুনি। যাহা আছে তাহা কেবল একটা বিরাট ছাতফাটান হাসি।

কিন্তু কে জানিত যে তাহার এই উদার আকাশের মত হাসির মধ্যেও কোথায় এক কোণে একখানা ছোট কালো অশ্রুভরা মেঘ লুকান ছিল। হঠাৎ একদিনের কেমন একটা কথার বাতাসে সেই ছোট মেঘখানি হইতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া বন্ধুদের পরিহাসকে গলাইয়া মৌন গম্ভীর দুঃখের ভারে সকলকেই পীড়িত করিল।

ঘটনাটা এই—রমেশ একদিন বন্ধুদের মধ্যে প্রস্তাব করিল নবীন ডাক্তারের বয়েস যখন কিছুতেই বাড়ে না, তখন ওর বিয়ে দিতেই হবে।

ও যে চিরদিন সোঁদা থেকে ২৫ বছর ২৫ বছর বলে বড়াই করবে তা হবে না। বিয়ে করে পাঁচটা ছেলে পিলে হলে ওর বয়েস কেমন না বাড়ে দেখতে হবে।"

কালিদাস বলিল, "আরও একটা কথা, ওর পয়সা আছে, অথচ অভিভাবক নেই ; ওর দাদা সেদিনও দুঃখ করছিলেন, যে এত কষ্ট করে এত খরচ করে ডাক্তারী পাশ করিয়ে শেষে কিনা বিনে পয়সার ডাক্তার হয়ে দাঁড়াল। ওর ঘাড়ে একটা সংসার একটা পুরাদস্তুর মুরুব্বি জুটিয়ে দিতে না পারলে যে সংসার আর টেকে না।"

সতীশ বলিল, "আর এও যে বেজায় অন্যায়, আমরা সব চারদিকে ট্যাঁ-ট্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ নেই-নেই, দাও-দাও শুনতে শুনতে দিব্বি বুড়ো হতে চল্লাম, মুরুব্বি হয়ে মুখে দাড়ি, পেটে ভুঁড়ি, মাথায় টাক বানিয়ে ফেল্লাম আর ঐ থাকবে পঁচিশ বছরের ছোকরা ?

রমেশ বলিল, "না তা হবে না, ওর বিয়ে দিতেই হবে—আর আমি সম্বন্ধও ঠিক করেছি।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—যার বিয়ে তার কিছু ঠিক নেই তোমরা না ঘুমিয়ে মেয়ে পর্য্যন্ত ঠিক করে বসে আছ ? সে পাত্রী কোথাকার শুনি ?"

পাত্রীটির নাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির হইল, শুনিলাম সে কোথাকার এক লেডি ডাক্তার, এবং রমেশ বিশ্বস্তসূত্রে এমন কি প্রায় প্রত্যক্ষসূত্রে অবগত আছে যে এই লেডি ডাক্তারটির সঙ্গে নবীনের নাকি পরিচয়ও আছে। লভ্ এফেয়ার নাকি ? নবীনের মধ্যে লভ্!—হাসির চোটে ঘর ফাটিবার জোগাড় হইল। কিন্তু রমেশ হটিবার পাত্র নয়, সে সতেজে বলিল, "ওর পঁচিশ আর এই ডাক্তারের নিশ্চয়ই যোল কিংবা বড় জোর

কুড়ি বৎসর, এর বেশী হতেই পারে না ; কারণ তার বয়েসও নিশ্চয়ই আর বাড়ে নি। অতএব এ বিয়ে দিতেই হবে।"

আমাদের মহাসভায় গম্ভীরভাবে ঠিক হইয়া গেল, এই বিবাহ দিতেই হইবে কিন্তু নবীনের কাছে একথা পড়িবামাত্র—একটা প্রকাণ্ড হাসিতে ঘরটা কাঁপিয়া উঠিল, তারপর প্রশ্ন হইল "বিয়েত করবই, কিন্তু পাত্রী কৈ ? আমি ভাই মোটে পঁচিশ বছরের, তেমনি একটা মানানসই কনে ত' চাই—শেষে যেন বর বড় কি কনে বড় করতে গিয়ে কনেই না বড় হয়ে যায়।"

রমেশ বলিল, "কনেও ষোলর বেশী নয়।" নবীন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওরে বাবা, ও যে ধাড়ী ! আমার সঙ্গে মানাবে কেন ? যদি শেষে তার আমাকে পছন্দ না হয়।"

সতীশ বলিল, "বিয়ে হবে ডাক্তারী মতে, তাতে আবার তোমার দাদা গোঁড়া ব্যারিষ্টার। এই ডাক্তারী আর ব্যারিষ্টারীর মণি-কাঞ্চন যোগের বিয়েতে ষোলোতেই হয়ত কুলুবে না। তুমি কি হিঁদুর ঘরের মত তিল-কাঞ্চন দিয়ে বিয়ের শ্রাদ্ধ সারতে চাও। সে হবে না, এতে হিঁদুমতেই যদি হয় তবু তোমার মত বৃষোৎসর্গে, ষোল কেন, ষোল দুগুণে বত্রিশ হলেও কম হবে।"

নবীন তাল ঠুকিয়া বলিল "বহুত আচ্ছা—কনে কোথায় আছে বল, তার নাড়ী দেখে আসি। আমি ডাক্তার আমার ত' আগে তার নাড়ীর খবর নিতে হবে ? তারপর দাদা গিয়ে তার লোহার সিন্ধুকের খবর নিয়ে এলেই ব্যাস্ সব গোল চুকে যাবে।"

রমেশ বলিল, "তুমি এখনও নাবালক, তোমার এবিষয়ে কিছু করবার এখনও অধিকার হয় নি। তবে তোমার এই যে ক'জন সাবালক গার্জ্জন

আছেন তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন অখন। আর নাড়ী দেখতে সেখানে যেতে হবে না, সেও একজন তোমারি মত এম্ বি। সেই হয়তো এসে কোন দিন তোমার বুকে ষ্টেথেস্কোপ বসিয়ে বুকের খবর নেব।"

হঠাৎ নবীনের সমস্ত হাসি কোথায় উড়িয়া গেল। সে পাংশুবর্ণ মুখে বলিল "মেয়ে ডাক্তার? এম্ বি? কোথাকার?" রমেশ আমাদের দিকে চোক টিপিয়া বলিল, "সে যেখানকারই হোক, তোমার তাতে কি? তোমায় কেবল বিয়েটী করে ফেলতে হবে।"

নবীন হটাৎ উঠিয়া "উঃ বড় গরম" বলিয়া বাহিরে গেল—তারপর ছুট—ছুট—ছুট। 'ও নবীন' 'ও ডাক্তার'—আর ডাক্তার! সেই যে সে পালাইল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর তাহার দেখা নাই।

সতীশের বৈঠকখানায় তখন ঘোর রবে পাশা আর তাস চলিতেছিল। আমার আসিতে দেরী হওয়াতে পাশার 'উপর-চাল' বলিতেছিলাম; এমন সময় রামদীন দরোয়ান আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিল! পত্র খানা নবীনের লেখা, সে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, বিশেষ দরকার।

ডাক্তারের বেয়াদবীতে চটিয়া আমি বলিলাম "দেখ দিথি, এই এমন দু'দে বাজীর মোয়াড়ায় কে এখন উঠতে পারে? সে রাস্কাল আসতে পারলে না?" বন্ধুমহলে এই পত্র লইয়া দু একটা মধুর শব্দ উচ্চারিত হইবার পর আমি বলিলাম, "থাকগে, আমি এই এলাম বলে।"

দ্রুতপদে নবীনের বাসায় পৌঁছিলাম। সে আমারই জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক উচ্চ হাসি হাসিল বটে, কিন্তু সেই হাসিটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাহার জন্য আমি হাসিতে পারিলাম না। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কি হয়েছে বল?"

সম্মুখের হলঘরে তাহার ব্যারিষ্টার দাদা বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত চা পান ও গল্পগুজব করিতেছিলেন। আমরা উভয়ে তাহার পার্শ্বের একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

নবীন তাহার কক্ষের আলোটা একটু কমাইয়া দিয়া বলিল, "সকাল বেলায় যে কথা হচ্ছিল তারই বিষয় দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডেকেছি। যে লেডি ডাক্তারের কথা বলছিলে, সে কে ?"

আমি তাহার নাম পর্য্যন্তই জানিতাম, তাহাই বলিলাম। নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আমার অন্য কিছু বলবার নেই, কেবল এইটুকু জানতে চাই, এর খবর তোমরা কোথা থেকে পেলে ?"

আমি বলিলাম, "রমেশ তার স্ত্রীর কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে এই বিষয়ে হাত দিয়েছে! কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন ? এর মধ্যে কি ব্যাপার লুকোনো আছে যদি—"

নবীন বলিল, "লুকোনো যা আছে, তা লুকোনোই থাকবে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আজ এতদিন পরে কেন তা জাগল তাত' জানিনে ? রমেশের স্ত্রীই বা কেন তাকে অনুরোধ করলে ? যা কোন দিন শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেছিলাম, তা দেখছি কিছুতেই শেষ হতে চায় না। যাকগে, তোমায় দুটো গোপন কথা বলব—কেন বলব তার কারণ জানতে চেয়ো না, কেবল এইটুকু অনুরোধ। একথা নিয়ে আর আলোচনা কর না, আশা করি আমার জীবনকে এই সম্মানটুকু তুমি দেখাবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম; নবীন তাহার পঠদ্দশার একটা অধ্যায় আমার নিকট বর্ণনা করিল। ব্যাপারটা সে ডাক্তার মানুষ বলিয়াই বোধ হয় অনেকটা সংক্ষেপে সারিল। কিন্তু আমার মনে তাহার ঝঙ্কার আর

কিছুতেই থামিতে চাহিল না, তাই তাহার জীবনের সহিত আমার যেটুকু সম্বন্ধ অকারণে ঘটিয়া গেল তাহাই আজ এতদিন পরে বাহির করিতেছি।

সে যাহা বলিল তাহা এই ;—

সে যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, তখন মাধুরীর সহিত আলাপ হয়। আলাপ হওয়াটা এমন কিছুই নয় ; কারণ নবীনের মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে যাহাতে সে নিমিষের আলাপেই একেবারে পরিচিত হইয়া পড়ে। নবীন এই আলাপের সূত্রে মাধুরীর বাটীর অন্যান্য সকলের সহিতও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হইয়া পড়ে। মাধুরীর পিতার কি একটি ব্যাধির সময় রাত্রি জাগিয়া সেবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের কোন একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকেই লাগাইয়া দিয়াছিলেন। নবীন তাঁহাকে নিজের নিপুণ সেবায় এবং সরল হাস্যে এমনই বশ করিয়া ফেলিয়াছিল, যে তিনি তাহাকে নিজের সন্তান ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতেন না, এবং সময় অসময়ে তাহাকে ডাকাইয়া ডাক্তারী ছাড়াও এমন সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ লইতেন যাহার উপদেশ চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন পুস্তকেই ছিল না।

যাহাই হোক নানা কারণে এই মাধুরী আমাদের নবীনের জীবনের সঙ্গে ক্রমশঃ এতই জড়িত হইয়া গেল যে শেষে নবীনের জ্যেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনের ডাক্তারী পাশের পর নবীন যাহাতে বিবাহের ফাঁশ পরিয়া পুরাদস্তুর সংসারী হয় সে বিষয়ে মাধুরীর পিতার সঙ্গে ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া ফেলেন।

এই ভাবে বৎসর খানেক চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহাতে নবীন ও মাধুরীর সমস্ত সুখের স্বপ্ন বৈশাখের প্রথম মেঘের মত শুধু একটা ঝড় উঠাইয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল। বাকী রহিল কেবল একটা ইস্পাতের মত চক্‌চকে ফর্সা আকাশের ন্যায় হাসি।

নবীন তখন পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে হাউস-সার্জ্জন হইয়া বসিয়াছে। হঠাৎ একদিন মাধুরী তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধুরীর ছোট পত্রখানায় লেখা ছিল "এমন সব ওষুধ নিয়ে আসবে যাতে অপারেশন না করে, এরিসিপেলাস সারান যায়—অস্ত্র করতে পাবে না বলে রাখছি। তুমি সার্জ্জারীতে মেডেল পেয়েছ, কিন্তু সে কথা ভুলে যেতে হবে। তোমার মেডিসিনের জ্ঞানের এই চরম পরীক্ষা—আর সে আমার কাছে তা যেন মনে থাকে। আমি এই জন্য আমার রুগীকে কলেজে নিয়ে যাইনি।"

নবীন তাহার এই বহুদিনের আগেকার পত্রখানা আমার কম্পিতহস্তে দেখিতে দিল। আমি পড়িয়া বলিলাম, "ইনিও ত' তখন কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়েন, তবে এ বিষয়ে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন কেন?"

নবীন বলিল, "সব কথা না শুনলে বুঝতে পারবে না। এই মাধুরী ডাক্তারী পড়লেও এর মনের মধ্যে সব স্থানটাই ছুরী কাঁচি ফরশেপে ভরে যায় নি। আমি কিন্তু বুদ্ধি করে সমস্ত যন্ত্রপাতী এবং সেই সঙ্গে ওষুধপত্র নিয়ে ওদের ওখানে উপস্থিত হলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। একটী বছর খানেকের ছোট্ট পদ্ম ফুলের মত ছেলে মাধুরীর কোলের ওপর রোগের যন্ত্রণায় কি যে কাতরোক্তি করছে তা বর্ণনা করা যায় না। আমি দেখলাম যে তখনি যদি অপারেসন না করি তা হলে একটা দিনও আর কাটবে না। কিন্তু আমি যেতেই মাধুরী বল্‌লে, "এরিসিপেলাসে এর সমস্ত পিঠটা ভরে গিয়েছে, কিন্তু তুমি অপারেসন করতে পাবে না।"

"আমি কিন্তু ডাক্তারী কর্ত্তব্য ভুলতে পারি নে। সব দেখে বল্লাম,

'এখনি একে অপারেসন করতে হবে নইলে এর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী হব।' মাধুরী কেঁদে ফেল্লে—সে যে কি করুণা তার চোখে দেখলাম! সেই যেন ওর মা—উঃ—যাক সে কথা। মাধুরী আমায় কিছুতেই অপারেসন করতে দিলে না, বল্লে, এই এমন সুন্দর শরীরে সে কিছুতেই ছুরী চালাতে দেবে না, তা সে যাই হোক। এর মা তার কোলে দিয়ে বলেছে, 'যেমনটী দিলাম তেমনটি ফিরিয়ে দিও যেন ভাই', সেও তাই দেবে। যদি না পারে কিসের জন্য এত মড়া ঘেঁটে সারা দিনরাত থেটে বই মুখস্থ করে মরছে। সে বেশ করে বুঝিয়ে দিলে যে সেই ফুলের মত শরীরে আমি কোন আঘাত করতে পাব না।"

নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তার পর সংক্ষেপে বলিল যে ঐ শিশুকে লইয়া তাহাদের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার জন্য তাহারা উভয়েই প্রস্তুত ছিল না। সেই রোগাক্রান্ত শিশুটা যেন হঠাৎ মাধুরীকে নবীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া এমন একস্থানে লইয়া গেল, যেখান হইতে কোন অনুরোধ-উপরোধ ভয়প্রদর্শন কিছুই আর মাধুরীকে বাস্তবের মধ্যে আনিতে পারিল না। মাধুরী দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিল যে যদি ভগবানের ইহার মৃত্যুই অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে এই শিশু তাঁহার নিকট ইহার কুসুম-সুকুমার দেহকে অক্ষত লইয়াই যাইবে।

নবীন অনেক বুঝাইল, বলিল, "দেহটা ত কিছুই নয়, প্রাণ আছে বলিয়াই উহার আদর, নহিলে উহা ত জড়পিণ্ড। মড়ার দেহই বা কি আর জীবন্ত দেহই বা কি—কিছুই নয়।" মাধুরী তখন জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল, যে, "যাহারা মরা ঘাঁটে, দেহটাকে যাহারা জড়ের সঙ্গে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না, তাহারা মড়ারই মত প্রাণহীন। ভগবান কেন সেই সব শকুনের হস্তে মানুষের মরণ বাঁচনের ভার দিয়াছেন?"

যখন মাধুরী কিছুতেই বুঝিল না, তখন নবীন পুরাদস্তুর ডাক্তারী চালে বুঝাইয়া দিল, "এর যদি কিছু হয়, তাহলে তুমিই দায়ী।"

মাধুরী হঠাৎ সেই শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সজল চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আমি— আমি—কেবল আমিই দায়ী? আর কেউ নয়? তুমিও নও? তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই—যাও তুমি। আমি কিছু চাই নে, এই একে কোলে নিয়ে আমি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলব—আমিই এর মা, তোমার সাধ্য থাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কেটে কুটে মেরে ধরে একে বাঁচাও। আমি এর গায়ে একটুও আঘাত লাগতে দেব না—এতে সমস্ত ডাক্তারী শাস্ত্র জহন্নামায় যায় যাক।"

ডাক্তারী শাস্ত্র জহন্নামায় যাক আর নাই যাক, শিশু বাঁচিল না। দুই দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর শান্তি পাইল। কিন্তু মাধুরী সেই দিন হইতে আর এক মাধুরী হইয়া গেল। সে নবীনের নিকট হইতে এতদূরে চলিয়া গেল যেখানে নবীনের আর কোনকালে পৌছিবার আশা নাই। মাধুরী এম্, বি, পাশ করিল, সসম্মানে ডিপ্লোমা লইয়া কোথায় তাহার পিতার সহিত নবীনের জীবনাকাশ হইতে অস্তমিত হইল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত নবীনের নিকট সময় তাহার গতি হারাইয়া স্থির হইয়া আছে!

আমি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলাম "তা এতে তার সঙ্গে তোমার এতখানি অমিল হবার মত ত' কিছুই পেলাম না। সে হাজার হলেও মেয়ে মানুষ—তার যদি ভুলই হয় তাই বলে তাকে ত্যাগ করতে হবে?"

নবীন। ত্যাগ ঠিক আমিই করি নি, ত্যাগ আপনি ঘটে গেল। তবে আমিও যে তার সঙ্গে ঠিকমত মিলবার চেষ্টা করেছিলাম তাও বলতে পারি নে। তখন নূতন জীবন—কর্ত্তব্য জ্ঞানটাও খুব সতেজ। কি

করতে কি করে বসলাম, সেও দূরে গেল, আমিও সরে দাঁড়ালাম। সেও আমায় ক্ষমা করতে পারলে না, আমিও না ;—ডাক্তার হয়ে এত বড় একটা অকর্ত্তব্য করলে কি করে তাকে ক্ষমা করব, এই কথাটাই তখন আমার মনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে আমি ক্ষমা করলেও আমার ডাক্তারী শাস্ত্র, আমার ডাক্তারী কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাকে ক্ষমা করবে কেন? যেখানে মায়া দেখানই নির্দ্দয় হওয়া সেখানে যে জেনে শুনে এরকম হ'ল তাকে যে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলাম না। সে তো শুধু মেয়ে মানুষ নয় সেও যে চিকিৎসা-বিদ্যার্থী একথা সে ভুলে গেল কেন?

আমি। কিন্তু তুমি ত' তাকে ডাক্তার বলেই বিয়ে করতে যাচ্ছিলে না, তাকে মেয়ে মানুষ বলেই জীবনের সাথী করতে যাচ্ছিলে? তবে কেন তাকে ছেড়ে দিলে?

নবীন। তখন তা বুঝিনি ভাই। তখন তাকে কেবল চিকিৎসা বিদ্যার্থী এবং আমার স্নেহের ছাত্রী বলেই মনে করেছিলাম! তখন ত' বুঝিনি, যে মড়াই কাটুক আর অস্ত্রই ঘাঁটুক মানুষ মানুষই থাকে, মানুষের ভিতরকার লোকটা কিছুতেই বদলাতে চায় না, সময় হলেই সে বেরিয়ে পড়ে। সে চলে যাওয়ার পর হতে কত রকমে বুঝছি যে আমিও কেবল ডাক্তার নই, আমিও শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞান নই—আমিও মানুষ। তাই সে দিন যে সেই শিশুর ফুলের মত দেহটা কেবল ছুরীকাঁচীর ক্ষেত্র বলে দেখেছিলাম সেই অন্যায়ের প্রতিফল সারাজীবন ধরে ভোগ করছি। মাধুরী ভুল করেনি, ভুল করেছিলাম আমি। ডাক্তারের দিক হতে আমি ঠিক, কিন্তু সব ডাক্তারীর ওপরে যা, সেই স্নেহের ডাক্তারীর দিক থেকে ভালবাসার দিক থেকে মাধুরীই ঠিক। দেহত' কেবল দেহ নয়,

প্রাণেরই বাহিরে
আমার চক্ষু স্থির হইল। দেখিলাম নবীনের হসপিটাল
তাহাকে কাতরভাবে বুঝাইতেছে যে এই সামান্য ফোড়াটার মধ্যে প্রকাশ হওয়া,
এতদিন ধরিয়া কেন কষ্ট দেওয়া হইতেছে, সামান্য একট করেছিলাম তারই পাপে
সব চুকিয়া যায়। নবীন কিন্তু ক্রমাগতই মা... গয়েছে। দেহটার চিকিৎসা
দেহটাকে আমরা যত অবজ্ঞা করি
...কছে যে আর একদিন থাকিলেই
..., ভাই, মাধুরী ঠিকই করেছে; আমি তার
...তেই কাজ হইবে'
উপযুক্ত ..., তার সঙ্গে, যেখানে মিললে ঠিক মেলা হ'ত সেখানে যে
আমি উঠতে পারি নি।

নবীন নীরব হইলে আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম "তা হলে এ মাধুরী যে সেই মাধুরী তা তুমি কি করে জানলে?"

নবীন এইবার গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাই বা হল এ সেই মাধুরী—তবে নামটায় যে যন্ত্রণা আর যে সুখ লুকান ছিল, তাই তোমায় বল্লাম। এখন তোমায় অনুরোধ তুমি রমেশ আর দাদাকে বলে এ সব ব্যাপার থামিয়ে দাও। রমেশ দাদার সঙ্গে সব ঠিকঠাক করবার যোগাড় করেছে। দাদাও আমায় সাটেপাটে ধরেছেন। বৌ ঠাকরুণ কাকুতি মিনতি করছে কিন্তু ভাই আমি পারব না। এই ভাবেই আমার জীবন কাটবে—আর কাউকে আমার জীবনে পেতে চাইনে।

আমি। যদি সেই মাধুরীকেই পাও।

নবীন হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর দুইবার ঘরময় ঘুরিয়া বলিল' "না তাকে আর পাওয়া যাবে না—হয় ত' আর সে সে মাধুরীই নাই, সংসারের ফেরে কি যে সে হয়েছে কে জানে? না আর নয়—আর নয়।"

এমন সময় নবীনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভা আসিয়া ডাকিল "কাকা—"

বসলাম, সেও দূরে গেল, আমিও সরে দাঁড়ালাম। সেও
নবীন তাড়াতাড়ি দতে পারলে না, আমিও না ;—ডাক্তার হয়ে এত বড়
একটু চা দিলি নে।" ল কি করে তাকে ক্ষমা করব, এই কথাটাই তখন
ইয়া বলিল, "যে তুমি সান্দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে আমি ক্ষমা
আরও কিছুক্ষণ বালিকার •. আমার ডাক্তারী কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাকে ক্ষমা
লাম। কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা—ই নির্দ্দয় হওয়া সেখানে যে জেনে
বেদনার শেষ কোথায় দেখিতে হইবে। করতে পারলাম না। সে

২

এদিকে ঘটনাও ক্রমশঃ জমিয়া আসিতে লাগিল। রমেশের স্ত্রী বহুদিন হইতে কি একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছিল, নানাস্থান ঘুরিয়া এবং নানারূপ চিকিৎসা কিছুতেই কিছু হয় নাই। শেষে রমেশ কোথা হতে এক লেডি ডাক্তারকে আনাইয়া তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়াছে। এই ডাক্তারটি নাকি তাহার স্ত্রীর বাল্য এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু—রমেশের স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দু-এক দিনের জন্য হাওয়া বদলাইতে এবং বন্ধুর চিকিৎসা করিতে এখানে আসিয়াছেন।

আমারও অমনি মাথায় টনক নড়িল, এইত সুযোগ! আমি রমেশের সহিত পরামর্শ করিয়া নবীনের খোঁজে বাহির হইলাম। তাহাকেও কয়েক দিন হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারও বাড়ীতে তাহার দাদার কন্যা শোভার হঠাৎ কি একটা পীড়ার চিকিৎসায় সে বিশেষ ব্যস্ত—ইহা ছাড়া তাহার নিজের বিনা পয়সায় রুগীপত্র হাঁসপাতাল পরিদর্শন ত' আছেই।

সন্ধ্যার সময় তাহাকে খোলসা পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমি তাহার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে

আমার চক্ষু স্থির হইল। দেখিলাম নবীনের হস্‌পিটাল এসিস্‌টাণ্ট তাহাকে কাতরভাবে বুঝাইতেছে যে এই সামান্য ফোড়াটার জন্য মেয়েটাকে এতদিন ধরিয়া কেন কষ্ট দেওয়া হইতেছে, সামান্য একটু অস্ত্র করিলেইত' সব চুকিয়া যায়। নবীন কিন্তু ক্রমাগতই মাথা নাড়িতেছে। সে বলিতেছে যে আর একদিন থাকিলেই ফাটিয়া যাইবে, সে যে প্ল্যাসটার দিয়াছে তাহাতেই কাজ হইবে।

আমি প্রশ্ন করিলাম "কার ফোড়া হয়েছে।"

নবীন বলিল "শোভার।"

আমি। ফোড়া পেকে থাকে ত' কেটে দাও না।

নবীন। না তা পারব না—আমি সার্জ্জারী এখানে করতে দেব না।

আমি। পরের ওপর ত' খুব ছুরি চালাও।

নবীন। আমি চালাইনে, তারা চালিয়ে নেয়।

আমি। তাহ'লেই হল, যাক, তুমি না পার ইনি ত' পারবেন, তুমি এর ওপর ভার দাও না।

নবীন। না ভাই তা যে পারছি না।

আমি কিছুক্ষণ তাহার সহিত তর্ক করিলাম। শেষে মনে মনে একটা মৎলব আঁটিয়া এসিস্‌টাণ্টকে বলিলাম, "মহাশয়, আজ যান, কালকে দরকার হলে ডেকে পাঠাব।" এসিস্‌টাণ্ট চলিয়া গেল। নবীন তখন উঠিয়া ক্ষণকাল সেই কক্ষের মধ্যে পায়চারি করিল। হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—

"তুমি জান না ভাই, যেদিন মাধুরী আমায় ছেড়ে গেল তারপর থেকে আমার যেন সবই ওলট পালট হয়ে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম জোর করে সব উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু আমার অজ্ঞাতে কখন যে আমার মনটা

লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শভীরু হয়ে গিয়েছিল বলতে পারিনে, কিন্তু কাটাকাটির নাম শুনলেই সেটা কেঁপে উঠত। ছুরি কাঁচি ফরসেপ দেখলেই সে কুঁচকে যেত, আমি জোর করে তাকে কর্ত্তব্যে লাগাতাম কিন্তু কোথা হতে একরাশ অশ্রু এসে আমার চোক ঢেকে ফেলত। যে সব রুগীকে ক্লরোফর্ম্ম দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেসন করতাম তাদের সেই নীরব নীথর দেহও যেন আমার কানে কাতর স্বরে চীৎকার করে বলত—না—না—না। প্রথম প্রথম সে স্বর চিনিতাম না তারপর ক্রমশঃ সেই স্বর চিনিতে পারিলাম—সে স্বর সেই বিদ্রোহী মাধুরীর। সে দেশ-কালকে অতিক্রম করে প্রত্যেক কর্ত্তব্যের নিষ্ঠুরতার সময় বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে এসে বলত—আমায় কেট না, আমি তোমারই, আমি তোমার বুকের মধ্যে বসে আছি, তোমার বুকের মধ্যে তোমার বুকের রক্তের তালে তোমার দেহের মধ্যে জীবনের গতির সুর হয়ে জেগে আছি, তুমি আমায় চিনছ না ?”

নবীন ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া যেন তাহার জীবনেব সুরটী শুনিতে লাগিল। আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এই ডাক্তার বন্ধুটীর মনের মধ্যে এ কিসের কোমলতা, এ কিসের মাধুরী প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনকে এমনভাবে কর্ত্তব্যভীরু করিয়া তুলিয়াছে !

নবীন উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিল,—

“প্রথম প্রথম মন কাঁপ্‌ত, তারপর হাত কাঁপ্‌তে লাগল। তখন মেডিকেল কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু মেডিসিনের বিদ্যে দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করিতে লাগলাম। সারাদিন বৈ ঘাঁটতাম, বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতাম ; এমন কি এক

সময় মনে করেছিলাম হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করব। কিন্তু দাদা তা দিলেন না—পেটের টান বড় টান, তাই দাদার অনুরোধে এইখানে এসে এখানকার হাঁসপাতালের চাকরী নিলাম। কিন্তু যখনই বড় বড় অপারেসনের দরকার হয়েছে তখনি প্রথমেই উপদেশ দিয়েছি কলকাতায় যেতে। যারা তা পারেনি তাদের হয়ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপারেসন করিছি, কিন্তু তাও বেশী নয়। আমার এসিস্‌টাণ্টকে দিয়ে যেখানে কাজ চলেছে, সে কাজটা তাকে দিয়েই করিয়েছি—এমন কি ডাক্তার সাহেব যে কাজটা করতে হয়ত মনে মনে অনিচ্ছুক হতেন তাও তাঁকে দিয়ে পাকে প্রকারে করিয়ে নিয়েছি। বিশেষতঃ ছোট ছেলে মেয়ে দেখলেত' আমি কিছুতেই আর এগুতে পারিনে—সেই যে একখানি কোমল বুকে একটী কাতর রমণীর অবুঝ মাতৃহৃদয়ের 'না—না' ধ্বনি আমার সব বিদ্যে সব শক্তি কেড়ে নেয়। সেই মায়ের হৃদয় আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশে গিয়েছে। তাকে আর আমার পুরুষের হৃদয় থেকে পৃথক করতে পারছিনে ভাই! কি করে আমার এই শোভাকে ঐ সামান্য ফোড়াকাটার যন্ত্রণা দেব তা যে কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আমার দুর্ব্বলতা যে ক্রমশঃ আমার প্রাণঘাতী হয়ে উঠল। আমার বুকের ব্যথা ক্রমশঃ আমার হাতপায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, শেষে এখন দেখছি সারা জীব-জগতে বুঝি ছড়িয়ে পড়ে।"

নবীন আবার বেড়াইতে আরম্ভ করিল। আমিও অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হইল, "এই ত' সময়—এইবার ত' তাহাকে ডাকিতে পারি। মাধুরীর জন্য সমস্তই যেন প্রস্তুত হইয়াছে এখন কেবল তাহার আসিয়া দাঁড়ানটুকুরই মাত্র প্রয়োজন। তারপর সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে।"

আমি সময় বুঝিয়া প্রস্তাব করিলাম, "ওহে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে, সে নাকি বিনা অপারেসনে চিকিৎসা করতে পারে—এবিষয়ে সে একজন স্পেশালিষ্ট, তাকেই ডাক না।"

নবীন মৃদু হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার নয়—কবরেজ বোধ হয়। বিনা অস্ত্রে ফোড়ার ঠিক চিকিৎসা ডাক্তারীতে কৈ ?"

আমি। না—না ডাক্তার,—যদি বলত তাকে কালকে ডেকে আনি।

নবীন। তাহলে কালকে কেন ভাই, আজই আন না—আমার যা কিছু বিদ্যে ছিল ফুরিয়েছে, মেয়েটা বড় কষ্ট পাচ্ছে—আমারই দোষে, আমি কিছুতেই অস্ত্র করতে দিচ্চিনে। তার মা কত বলছে, দাদা বকছেন, আমি কেবল শোভার ভীত মুখখানা দেখে কিছুতেই ছুরী চালাতে পারছিনে।

আমি। তুমি কি মনে কর ডাক্তারী বিদ্যের সবটাই তোমার আয়ত্ত হয়েছে ? হয়তো কেউ কেউ এমন জিনিষ—

নবীন। যাক যাক আমি আর কিছু শুনতে চাইনে, তর্ক করব না, তুমি তাঁকে ডেকে আন।

আমি মহা বিপদে পড়িলাম। কোথাও কিছু ঠিক নাই কেমন করিয়া এরই মধ্যে সব বন্দোবস্ত করি। শেষে বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলাম, "আজ তিনি আসবেন না, তাঁরও হাতে একটা মস্ত রুগী, আর মোটে আজ এসেছেন এরই মধ্যে—"

নবীন বাধা দিয়া বলিল, "তিনি যদি বাস্তবিক ডাক্তার হন তাহলে তোমার ভয় নেই, ডাকলেই আসবেন। আমার এ কেস্‌ ত খুব গোলমেলে নয়, আধ ঘণ্টাও লাগবে না—তুমি যাও। না হয় চল আমিও যাই।"

বিপদ ঘনাইয়া উঠিল। কি জানি কি করিতে কি হইয়া বসে—ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নবীনের কথামতই মাধুরীকে লইয়া আসিবার জন্য আমি একাই বাহির হইলাম। কে জানিত যে এমন ঘটনা ঘটিবে ? এ মিলনের মধ্যে আমি ভগবানেরই হাত দেখিতে পাইলাম। রমেশের স্ত্রীর ব্যাধির উপলক্ষে মাধুরীই বা এখানে আসিবে কেন ? আর ঠিক সেই সময়ে নবীনের ভাইঝিরই বা অসুখ করিবে কেন ? ভগবানের খেলা নয় ত কি ? আমি সাহসে ভর করিয়া রমেশের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম।

রমেশ তখন উপরে তাহার অতিথিসৎকারে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের কথা নিচের তালা হইতে শোনা যাইতেছিল। আমি চাকরের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলাম। রমেশ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমার নিকট সমস্তই শুনিল। শেষে ভীত হইয়া বলিল "তাইত' কি করা যায় দাঁড়াও আমি একবার ওপর থেকে আসি।" আমি বলিলাম "সেই ভাল, এ বিষয়ে যিনি নাটের গুরু তাঁর পরামর্শ নেওয়াই আগে উচিত।"

রমেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, তার পশ্চাতে একটী তরুণী। কিন্তু তরুণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছাড়াও এমন একটা গম্ভীর মর্য্যাদা তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছিল যে আমি তাঁহার দিকে ভাল করিয়া না চাহিয়াই উঠিয়া নমস্কার জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে ?"

আমি। সেটা আপনি ডাক্তার, নিজেই দেখে ঠিক করবেন। আমার বলা বাহুল্য।

রমেশ ইতিমধ্যে তাহার গাড়োয়ানকে গাড়ী জুড়িতে বলিল। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তিন জনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রমেশের মনে কি হইতেছিল জানি না, কিন্তু আমার বুক ধড় ফড করিতেছিল। এই দুই জন অতি পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে আমরা দুই জন একান্ত অপরিচিত, আমাদের সম্মুখে না জানি কি ঘটিয়া বসিবে!

গাড়ীখানা নবীনের বাটীর সম্মুখে থামিতেই আমি নামিয়া পড়িলাম কিন্তু রমেশ নামিবার পূর্ব্বে বলিল, "শুনুন, জানিনে আমরা কি করে বসলাম, কিন্তু এর পর যাই হোক অনুগ্রহ করে মনে রাখ্‌বেন যে আমরা আমাদের কোনও বন্ধুর উপকারের জন্যই আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। আপনি যে বাড়ীতে যাচ্ছেন তাঁকে আপনি চেনেন, অন্ততঃ আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সেই রকমই শুনিছি এবং তার পরামর্শেই একাজ আমরা করিছি। কিন্তু যদি—"

মাধুরী তাহাকে বাধা দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি জেনে শুনেই এসেছি।"

মাধুরী যখন গাড়ীর অন্ধকার হইতে নবীনের বাটীর গাড়ি-বারান্দার আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। এই তরুণী সমস্ত জানে, সমস্ত বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সে তাহার হারাণ মানুষটীর খোঁজে আসিয়াছে। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলাম।

এদিকে গাড়ির শব্দ পাইয়াই বোধ হয় নবীন ও তাহার ভ্রাতা উভয়েই উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। নবীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্র অবাক্ হইয়া একবার মাধুরীর দিকে আর একবার আমাদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মাধুরী কোন কথা না বলিয়া একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করিল। ব্যারিষ্টার তখন অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "একি এ যে মিস্ বোস্! একে কোথায় পেলে তোমরা?"

রমেশ বলিল "ইনি আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু, তাঁকে দেখতে আর কতকটা Changeএর জন্য এখানে এসেছেন। শোভার জন্য, প্রসাদ (আমার নাম) গিয়ে আমায় খবর দেওয়াতে আমি এঁকে ডেকে আনলাম। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক্।"

নবীন এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী ও রমেশ নবীনের দাদার সহিত হলে প্রবেশ করিল।

নবীন গম্ভীর ভাবে বলিল,—"এ তুমি কি করলে ?"

আমি। আমি করিনি ভাই, ভগবান করেছেন। সত্যি বলছি এতে আমার এতটুকু কৃতিত্ব নেই। চল ভেতরে যাই, পরে সব কথা হবে।"

নবীন যন্ত্রচালিতবৎ হলে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য সকলে ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তখন একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, "তুমি যাও, ডাক্তার, আমি এখানে রইলাম।" নবীন নড়িল না। একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "না—না সে কিছুতেই হবে না—তোমরা একাজ ভাল করনি।"

আমি নবীনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাল হোক মন্দ হোক আজ আমার অনুরোধ তুমি শান্ত হয়ে তোমার শোভার যাতে ভাল হয় তাই কর! তুমি এ দুদিনে কি হয়ে গিয়েছ নবীন, তোমার সেই প্রাণখোলা হাসি কোথায় গেল। জীবনটা তোমার কাছে খোলা মাঠে দৌড়ানোর মতই সহজ ছিল, হঠাৎ কেন সেটাকে এত গম্ভীর এত জটিল করে তুলছ। হাসি দিয়ে সব ঝেড়ে ফেল ভাই—"

নবীন হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এই অশ্রুই

এতদিন তাহার হাসির ঠাণ্ডা বাতাসে জমাট বাঁধিয়াছিল। সহসা আজিকার বাতাসে তাহা গলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমিও থাকিতে পারিলাম না, যে ব্যাপারে নিজেকে এতখানি জড়িত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার শেষ দেখিতেই হইবে—আমি ভিতরের সিঁড়ি দিয়া উপরে গেলাম। নবীনের বাটীর অন্দর বাহির সমস্তই আমার জানা ছিল।

উপরে গিয়া রোগীর কক্ষের বাহির হইতে শুনিলাম মাধুরী বলিতেছে —"না—আপনারা বড় অন্যায় করেছেন, মিছিমিছি কেন এই ছোট মেয়েকে এত কষ্ট দিচ্ছেন। কালকেই অপারেশেন করে দেন, সব সেরে যাবে—জ্বর থাকবে না, যন্ত্রণা কমবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, নবীন যে কিছুতেই Operation করতে দিচ্চে না। ও ডাক্তার, ওর চেয়ে কি আমরা বুঝি?"

নবীনের ডাক পড়িল কিন্তু কোথায় নবীন? মাধুরীকে তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীর কাছে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রমেশের সহিত বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল "নবীন কৈ?"

পার্শ্বের একটা কক্ষ হইতে সে বাহির হইয়া বলিল, "দাদা আপনি মিস্ বোসকে যেতে বলুন, আমার রুগী আমি দেখ্‌ব।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "কি ছেলে মানুষী করছ? উনি যখন এসেছেন তখন যাতে কোন গোল না হয় তাই কর। ওঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করগে যাও।"

নবীন চুপ করিয়া রহিল, আমি তাহাকে রোগীর কক্ষের দিকে ঠেলিয়া দিয়া তাহার কাণে কাণে বলিলাম "তোমার বয়স ত' আর সত্যি সত্যি পঁচিশ নয়—কেন বাঁদরামী করছ!"

নবীন ধীরে ধীরে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। রমেশ এদিকে নবীনের দাদাকে বলিল "বড়দা, এই আমাদের অবসর, আমাদের সেই পরামর্শ অনুসারেই ওকে এখানে আনিয়েছি এখন যাতে এই বিয়েটা হয়, বৌ ঠাকুরুণকে বলে ঠিক করে ফেলুন।"

বঙ্কিমচন্দ্র মহা উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আঃ তাহ'লে যে বাঁচি।"

রমেশ তাঁহার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল। আমি পুরুষমানুষকে যাহা করিতে নাই সেই দুষ্কর্ম্ম করিলাম, দরজার গোড়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

শুনিলাম বৌ-ঠাকুরাণী বলিতেছেন "শোভার সম্মুখে সব কথা ত' হবে না, ওঘরে কিংবা নীচে গিয়ে তোমরা পরামর্শ কর। আমি শোভার কাছে রইলাম।"

বৌঠাকুরুণের বুদ্ধিকে শত ধন্যবাদ দিয়া আমি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইলাম। যে খানসামাটা নীচে বসিয়াছিল তাহাকে বলিলাম "তুমি বাইরে যাও।"

মাধুরী ও তৎপশ্চাতে নবীন নামিয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ মাধুরী ফিরিয়া হাসিভরা মুখে বলিল, "একদিন যে অপরাধের জন্য আমার শাস্তি হয়েছিল, আজ সেই অপরাধই করা হচ্ছে, কিন্তু আমারই জয় হয়েছে, তুমি হার মেনেছ। এখন থেকে স্বীকার কর এই তোমার স্নেহের ধনের দেহটিকে যে চক্ষে দেখ সেই দেখাও মিথ্যে নয়। ডাক্তারের চোখে দেখাই শেষ দেখা নয়।"

নবীন মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে—"

মাধুরী। এখনো শাস্তির শেষ হয় নি, এই শোভার ফোড়া আমিই

কাটব,—তুমি মেডাালিষ্ট, সার্জ্জারীতে ফাষ্ট, তোমায় হাত গুটিয়ে দেখতে হবে।"

নবীন একবার মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে তোমারও হার হয়েছে। ডাক্তারের কর্ত্তব্যটাও ফেলনা জিনিষ নয়, এটুকু ত' তুমি স্বীকার করেছ।"

উভয়ে নীচে নামিয়া হলে প্রবেশ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলাম। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠিক হ'ল ?"

মাধুরী বলিল, "ঠিক আর কি হবে, ওতো একটা সামান্য ফোড়া ওর জন্য ব্যস্ত হবার কিছু দরকার ছিল না, ইনি নিজের ভাইঝি বলে না কাটতে পারেন, আর কাউকে দিয়ে সামান্য একটু Operation করে দিলেই চলবে। বলেন ত' না হয় কাল এসে আমিই করে দিয়ে যাব।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "নবীন কি বল ? নবীনের বড় আদরের মেয়ে তাই ও এত গোলমাল করেছে, তুমি যদি আস মিস্ বোস, তাহ'লে—"

"বেশ তাই আসব, এখন তবে আসি।"

রমেশ ও মাধুরীর সহিত আমি ও নবীন উভয়ে বাহিরে আসিলাম। মাধুরী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হে আমাদের সাহায্য আর দরকার হবে, না একলাই কাল সমস্ত শেষ করতে পারবে ?"

নবীনও একচোট খুব হাসিয়া লইয়া বলিল "না হে একলাই পারব, তবে অপারেশনের সময় আমি থাকব না বোধ হয়।"

রমেশ বলিল "তোমারও বুক ধড়ফড়ানি রোগ হয়েছে তার চিকিৎসার ভার এঁকেই দেব, কি বল ?"

৩

আর একদিন মধুর প্রভাতে হঠাৎ নবীন ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া আমার বাটীর সম্মুখে লাগিল। আমি তখন মক্কেল-বেষ্টিত অবস্থায় বসিয়া ছটফট্ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে সেই গাড়ী হইতে নবীন নামিয়া আসিয়া বলিল "আজ ছুটী নাও ভাই, কাজ ত' রোজই আছে।"

আমিও বাঁচিলাম, ঘাড়ে একখানা চাদর ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলাম, "কি হে ব্যাপার কি?"

নবীন। তুমি এই নাট্যের একজন একটর, তোমাকে না দেখালে আমার মন শান্ত হবে না।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া নবীনের গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিলাম। গাড়ীখানা এখানকার বড় হাঁসপাতালে গিয়া থামিল। আমরা উভয়ে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। দেখিলাম, মাধুরী সেই রোগীগণের মধ্যে, সেই বেদনা ও কাতরোক্তির মধ্যে সেবা ও স্নেহ, আশা ও আশ্বাসের মত রমণীর পূর্ণ সৌন্দর্য্যে এবং জননীর পূর্ণ মহিমায় বিরাজিতা! একটী ক্ষুদ্র ক্ষীণ অপরিষ্কার কৃষ্ণকায় শিশুকে কোলে লইয়া সে সযত্নে একটা Feeding bottle হইতে কি একটা পেয় বস্তু পান করাইতেছিল। ছেলেটীর দরিদ্রা মাতা একদৃষ্টিতে এই সেবিকার কার্য্য দেখিতেছিল। দূর হইতে মাধুরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি নবীনকে বলিলাম, ডাক্তার, পুরাণে যে লিখেছে আদর্শ সতীকে জননী হবার জন্য, কার্ত্তিক গণেশের মা হবার জন্য, আগুনে পুড়ে কায়া বদল করতে হয়েছিল সেটা একটা মস্ত সত্য। সেই মরণের বেদনা, তারপর তপস্যার দুঃখ না সহ্য করলে

নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শিবকেও পূর্ণ মঙ্গল হবার জন্য অনেক দিন মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে মড়া ঘাড়ে করে ঘুরে মরতে হয়েছিল। তোমাদের উভয়ের দুঃখ সহ্য করা, বিরহ সহ্য করার মধ্যে সেই কথাটার, সেই সনাতন সত্যেরই ছোট সংস্করণ দেখতে পেলাম।"

নবীনচন্দ্র সজল চক্ষে মাধুরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর আমাদের এই পুনর্ম্মিলন দুঃখেরই হোক আর সুখেরই হোক যেন সত্যের হয়, প্রেমের হয়, মঙ্গলের হয়।"

আমিও মনে মনে বলিলাম—"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

অপমান না অভিমান ?

১

পাঠশালার ছুটীর পর কয়েকটি বালক এমনি একান্ত মনঃসংযোগের সহিত পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া "গ্রামভারি" চালে গল্প করিতে করিতে গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছিল যে তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে দর্শকের মনে কোন সংশয়ই জন্মিতে পারে না। তাহাদের কুঞ্চিত ভ্রূ, কুটিলদৃষ্টি, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত এবং সাবধানতাসূচক কথাবার্ত্তায় তাহারা যে কোন একটা বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বরেও এমন একটা রুদ্ধ কোপ এবং উদ্বিগ্নতার আভাস প্রকাশ পাইতেছিল যে বোধ হয় বিলাতে পার্লামেণ্ট অধিবেশনে William IV. এর দত্ত Charter of Rights চার্টার অফ্ রাইটস্ হইতে বঞ্চিত হইয়াও সে সভার সদস্যবর্গ ইহাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইতে পারিতেন না। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রামখানির এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্ক, পিট্, ক্রমোয়েল্, (গ্রাম্য) হ্যামডেন্ গ্রাম্যপথে একটা বিষম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে তাহাদের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

ভোলা বলিল—"না,—আর চুপ্ করে থাকা উচিত নয়! এই বেলা এর একটা প্রতিকার না কর্‌লে ক্রমে আমাদের আর কেউ গ্রাহ্য কর্‌বে না। এখনি আমাদের দলের প্রায় অর্দ্ধেক ছেলে ওর দলে গিয়ে মিশেছে।

আমাদের দলে আর ক'টা ছেলে আছে? নীলেই সকলের ইষ্টিগুরু হ'য়ে উঠেছে!"

মধু বলিল—"শালা যে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে! পড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই 'ক' বল্‌তে 'ঠ' বেরোয় মুখ দিয়ে, ভোমা গোয়ালা ব্যাটা বাট্‌ বছরেও নাবালক, তিনি হ'লেন পাঠশালার সর্দ্দার প'ড়ো। সকলের উপর হুকুম চালাচ্ছেন, শাসন কর্‌ছেন, বাহবা দিচ্চেন, পণ্ডিতটা পর্য্যন্ত ওর তরফে; নীলে যাকে মন্দ বল্‌বে সে-ই মন্দ, যাকে ভাল বল্‌বে সে-ই ভাল। ব্যাটা কি পণ্ডিত্‌টাকেও ওর গোয়ালের গরুর দুধ খাইয়ে যাদু বানিয়েছে?"

বিচক্ষণ রতন বলিল—"আরে দুর! ওটাত "মায়ে খেদানো বাপেমারা" ছেলে, ওর আবার গরু, না তার দুধ। নরেন্‌ জমিদারের ছেলে, তারই বাবার পাঠশালা। নীলে সেই নরেনের প্রাণের ইয়ার, কাজেই পণ্ডিতটা "ভয়ে ভক্তিতেই" ওকে "নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ" করে।" নবাগত হরি প্রশ্ন করিল—"ওটা নরেনের সঙ্গে জুটল কি করে?"

"আরে সে ঢের কথা! একদিন আমরা ওদের মাঠের পুকুরটায় দল বেঁধে স্নান করতে গিয়াছিলাম। ঐ ভেড়ের ভেড়ে নর্‌না ব্যাটা "নিবুদ্ধি" না'হলে কখনো "বাপের পুকুরে ডুবে মরে?" লোকে যা বলে ঠাট্টা করে, ব্যাটা তাই কর্‌লে। আমাদের সঙ্গে "ফুটুনি" করে সাঁতার দিতে গিয়ে মাঝ্‌ পুকুরে মরেন আর কি ডুবে—এমন সময়ে ঐ হতভাগা নীলেটা পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছিল, লাফিয়ে জলে প'ড়ে নর্‌নাটাকে ডাঙ্গায় টেনে তোলে। গোয়ালার ছেলে ভাদ্রমাসে দুধের হাঁড়ী মাথায় করে নদী পার হয়—কুমীরের মুখ থেকে 'মোস্‌' টেনে ডাঙ্গায় তোলে ওরা—ওদের পক্ষে এটা আর শক্ত কি? ভদ্রলোকের ছেলে আমরা—আমরা

কি ওই "গুজরুটি হাতী" নর্‌নাকে তুল্‌তে গিয়ে ডুবে মর্‌ব? যাক্, সেই থেকে জমীদার বাড়ীর পুষ্যিএঁড়ে হয়েছেন, নরেনের সঙ্গে বেজায় ভাব জমে গেল, বাড়ীর সবাইও ওই জন্যে ওকে খুব ভালবাসে। চাষা—"

হরি প্রশ্ন করিল, "ওর বাড়ী কোথায়? এ গাঁয়ে ত নয়!"

"কোথায় ন'পুকুর না কি একটা গাঁ আছে, সেইখানে বাড়ী। মা বাপ নেই, কোন্ এক সম্পর্কে' মামার স্কন্ধে ছিলেন, মামাটা গাল্‌মন্দ দেওয়ায় বাড়ী ছেড়ে রাগ করে এসে এইখানে ঢুকেছে! মামাটারও আপদ গিয়েছে, একটা "ধর্ম্মডাক্" দিতে সে এসেছিল ব্যাটা গেল না। যাবে কি, গোয়ালার ঘরের পুত্ গরু চড়াতে চড়াতে, দুধ দুইতে দুইতে মর্‌তেন, এখানে লম্বাকোঁচা ঝুলিয়ে জমিদারের বাড়ীর ভাত মেরে জমিদারের ছেলের সঙ্গে এক পাঠশালায় ব'সে "শিশুশিক্ষা" পড়্ছেন। তারই দেমাক্ কত। আমরা বোধোদয় পড়া প্রথম ক্লাসের ছাত্তর, আমাদের সঙ্গে সমানে কথা কইতে আসেন!"

"দেখ্‌তেও তেমনি ষণ্ডা! বাগে পেয়ে যে দু'ঘা দিয়ে দেব, তারও জো নেই।"

ভোলা এবার—সগর্জ্জনে বলিল "তাই বলে কি চিরদিনই ওর সর্দ্দারি সইতে হবে? একা জোরে না পারি পাঁচজনে তো পার্‌বই। একতায় কি না হয়; শুনেছি সেইতো—

"একতায় হিন্দুরাজগণ, সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন,
সে ভাবে থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধুনদী,
আসিতে কি পারিত যবন!"

জানিস্ তো?" সঙ্গীরা মূঢ়ের মত পরস্পরের পানে চাইতে লাগিল, বেচারারা শিশুশিক্ষা ছাড়িয়া সবে বোধোদয় ধরিয়াছে। 'পদার্থ'

নামক প্রথম পাঠ শেষ করিয়া 'ঈশ্বর' নামক দ্বিতীয় পাঠে "ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ" জানিয়া তিনি "চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ" এই তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে কোন্ পর্য্যায় ভুক্ত হইবেন, তাহারই মীমাংসায় ব্যস্ত আছে; তাহারা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফতে কবি রঙ্গলালের সহিত এখনো পরিচিত হয় নাই! কিন্তু রতন ঠকিবার ছেলে নয়, সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, ওরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ওরা এসব কোথা থেকে জান্‌বে? আমি যখন আমার মামাদের গাঁয়ের পাঠশালায় অ আ শিখ্‌তাম, সেই পাঠশালায় ফাষ্টো কেলাসের ছেলেরা সুর্ করে বল্‌ত শুনেছি, "কুমীরের মত তার খোঁপামারা অঙ্গ, নামটি খেজুর গাছ বাস করে বঙ্গ!" ভোলা সগর্ব্বে হাস্যে রতনকে বাধা দিয়া বলিল, "আরে থাম্‌না,—ও আমার পিসিমার ছোটা ছেলেটা পড়ে—ওর নাম পদ্মমালা। আর আমি যার কথা বলেছি, তার নাম পদ্মপাঠ! পদ্মমালা নয় পদ্মপাঠ, বুঝেছিস্। আমার পিসিমার বড় ছেলেরা পড়ে, "সেই পদ্ম-পাঠ!" রতন তথাপি মৃদু মৃদু বলিল, "পদ্মমালাও খুব ভাল বই! তাতে আরও কত আমের নামে কাঁঠালের নামে ঐ রকম সব ছড়া আছে, শোন যদি!" ভোলা এবার বিষম ধমক্ দিয়া বলিল, "তুই চুপ করত' রতনা! কেবল খেজুর আর আম কাঁঠাল নিয়েই মলি। নাম শুনে বুঝ্‌তে পারছিস্ না, কোন্ বইটা বড়? ও হ'ল পদ্ম-মালা, আর এ হ'ল পদ্ম-পাঠ!" "তা হলেই বা পাঠ, এও তো মালা"—বিপিনও অন্যান্য মুগ্ধ বালকবৃন্দ রতনের এইরূপ উদ্ধত তর্কে চটিয়া গিয়া একযোগে চেঁচাইয়া উঠিল,—"চুপ্ কর বল্‌ছি রতন! হাতীর মত যেমন দেখ্‌তে, তেমনি বুদ্ধি কি না, কত হবে আর! ভোলা তুই কি বল্‌ছিলি বল্ ভাই। সেই যে ছড়টা করে কি বল্‌লি—সেই —"আঁসিত যবন!" ভোলা সহসা বলিল, "আসিত যবন" নয়, "আসিতে

কি পারিত যবন ?” এই যেমন ধরনা, আমাদের দলের নুটু, নন্দা, কানাই, নেপ্‌লা—ওরা যদি নীলের দলে না যোগ দিত, তা'হলে কি আজ আমাদের তেমন দল ভাঙ্‌ত, না নীলে'র ভয়ে কাঁপ্‌তে হ'ত। ও যত বড় ষণ্ডাই হোক্ না কেন, আমরা দলশুদ্ধ ওর ঘাড়ে পড়্‌তাম আর ওটাকে একেবারে পিষে ছেড়ে দিতাম। আমাদের একতা নেই বলেই না এমন হ'ল !”

সকলে এক বাক্যে সায় দিল। ভোলা আবার নব উৎসাহে বলিয়া উঠিল, “কিন্তু তাই বলে কি আমরা নীলে'র সর্দ্দারি এম্‌নি করে চির দিন মেনে চল্‌ব ? কখনো না। নষ্টচন্দ্রের রাতে রায়েদের বাগান লুট্ করব বলে আমি দল জোট্ করলাম, কোথা থেকে নীলে' এসে তিন্ তুড়িতে আমার দলের তিন ভাগ ছেলেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বানের জলে “বিত্তি” রেখেছে গাঁয়ের লোকে, বড় বড় কই মাগুর তার ভেতরে চড়্-বড়্ করছে, নীলে'র ভয়ে কোন ছেলে জলে নাম্‌বেনা—বলে, নীলমণি এতে বড় রাগ করে। গাছের কোন ফল পাড়া কি অন্য কিছু যাকে যা বল্‌ব, সে অমনি বায়না ধর্‌বে “ও লোকটা বড় গরীব ওর ফল চুরি ক'রে কাজ নেই, ও মেয়েমানুষটার কেউ নেই, ভিক্ষে করে' খায় ওর ক্ষেতি করা উচিত নয়।” কই, এত কাল তো আমাদের দলে এমন সব কথা ওঠেনি কখনো। এসব নীলে'র কাজ, নীলে'র পরামর্শেই এরা সব এমন বিগ্‌ড়ে গেছে !” সকলে একবাক্যে পুনরায় সায় দিল—“নীলেরই কাজ।” এখন উপায় ?”—“উপায় কর্‌তেই হবে। নীলের অধীন হ'য়ে আমরা কিছুতেই থাক্‌বনা। আমার পিস্‌তুতো ভাইয়েরা পড়ে— “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়রে কে পরিবে পায়”—সবটা আমি জানিনা,—এও সেই পদ্যপাঠের ছড়া। সব শেষে কি একটা “সাজ সাজ সাজ” বলে কথা

আছে”—রতন বেচারা এতক্ষণ চুপ, করিয়াছিল, কিন্তু আবার সেই পদ্যপাঠের আবৃত্তি শুনিয়া চটিয়া গেল। বিরক্ত ভাবে বলিল, “তা যেন শুন্‌লাম এখন, আসল কথাটা কি, কি করতে হবে?” ভোলা তজ্জন করিয়া উঠিল “এটুকু:আর বুঝ্‌তে পারলি না! পাড়াগেঁয়ে ছেলের আর কত বুদ্ধি হবে”। অন্যান্য বালকেরাও যে কত বুঝিয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়া কেহ রতনের মত পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করিল না। সকলেই রতনকে একবাক্যে টিট্‌কারী দিল। তখন ভোলা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার গভীর মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দলশুদ্ধ বালকই পরম গম্ভীর হইয়া উঠিল।

২

পরদিন বৈকালে নীলমণির দল মাঠে সমবেত হইয়া হাডু ডু খেলিতে-ছিল। এক একটি ব্যক্তি বা বালকের অনেকের উপর প্রভুত্ব করিবার মত প্রকৃতিদত্ত এমন একটি শক্তি থাকে, যাহাতে তাহার আধিপত্য লোক-সমাজে শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই শক্তির জন্যই নীলমণি নবাগত হইলেও সে গ্রামের বালকবৃন্দের সর্দ্দার হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহার আরও একটি ক্ষমতা ছিল। এই কারণেই বালকেরা তাহার অত্যধিক অনুগত হইয়া পড়িত। নীলমণির গল্প বলিবার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং নিত্যনবক্রীড়াউদ্ভাবনী শক্তিরও সীমা ছিল না। এই দুই কারণেই তাহার দলস্থ বালকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল। তাহারা নীলমণির এমনি অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার অনুমতি

পাইলে অতি অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিয়া ফেলিতে পারিত। এই ক্ষুদ্র বালক-সৈন্যকে সংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধরাখার বিষয়েও নীলমণির সেনাপতির উপযুক্ত গুণের অভাব ছিল না। প্রত্যেক বালকের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অন্যায়ের বিচার এবং প্রত্যেক গুণের পুরস্কার দিয়া, প্রত্যেকের ন্যায্য স্বত্ব বজায় রাখিয়া, বিবাদ বিসংবাদ মারামারির মীমাংসা করিয়া নীলমণি নিজের সেনাপতি-পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানিত। জমিদার-পুত্র নরেনও এখানে অন্যান্য বালকের মতই তাহার অধীনতা স্বীকার করিত। সেও নরেনকে সকলের চেয়ে ভালবাসিলেও বিচারের সময় বিন্দুমাত্র পক্ষপাত দেখাইত না।

জগতে যেমন প্রত্যেক প্রবল শক্তির পার্শ্বেই তাহার একটা সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুও জন্মগ্রহণ করিয়া তেমনি সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি এই শিশু-সম্রাট্ নীলমণির প্রভুত্বের পার্শ্বে ভোলার দলও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও তাহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু বিষ বেশী, আদত গোখ্‌রো কেউটের "ডাঁকা"! গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা "দুঁদে" দাঙ্গাবাজ বালক কয়টি লইয়াই সে দলটি গঠিত! দলপতি ভোলা একটি ক্ষুদ্র "কালীকেউটে"র ছানা।

সবে খেলা আরম্ভ হইতেছে, এমন সময়ে ভোলার দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নীলমণি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিল এবং তখনি নিজকার্য্যে মন দিল। ভোলা দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল, "ওহে নীলচাঁদ! আমরাও খেল্‌ব।" নীলমণি তখন ওয়াটারলু ক্ষেত্রে বীর ওয়েলিংটনের মত সৈন্য সমাবেশে নিবিষ্টচিত্ত, ভোলার পানে না চহিয়াই উত্তর দিল, "দেদার মাঠ পড়ে রয়েছে, স্বচ্ছন্দে খেল্‌তে পার"। ভোলা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "মাঠ পড়ে আছে, তা আমিও দেখ্‌তে

পাচ্ছি! তোমার দলের সঙ্গে আমরা খেল্‌তে চাই"! নীলমণি তখন সৈন্যরচনা স্থগিত রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোলার পানে চাহিয়া তাহার মতলবটা এক নিমিষেই বুঝিয়া লইল। নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে উত্তর দিল, "যদি ঝগড়া না বাধাও—তবে খেল্‌তে পার ইচ্ছা কর্‌লে"!

"কি? আমি ঝগড়া বাধাই? ঝগড়া বাধাবার জন্যই বুঝি আমরা এসেছি!"

"সেই রকম তো বোধ হচ্ছে।"

"মুখ সাম্‌লে কথা কও; আমরা দাঙ্গাবাজ?"

"একশ বার! 'হক্' কথা বল্‌তে আমি মুখ সাম্‌লাই না!"

"যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—বেটা চাষা—"

নীলমণি দৃপ্তচক্ষে চাহিয়া বলিল, "খবরদার ঝগড়া বাধিও না বল্‌ছি! তোমার গায়ে যে আমার চেয়ে বেশী জোর, তা নয়!" ভোলা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। নীলমণি সেই রুষ্ট যুযুৎসু বৈরিবৃন্দের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া নিজের দলের প্রতি আজ্ঞা দিল—"খেলা আরম্ভ হোক্"। ভোলার সহিত নীলমণির বচসা শুনিয়া মারামারির সম্ভাবনা বুঝিয়া বালকেরা একস্থানে জমায়ৎ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে নীলমণির আদেশে দুই দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট "কোর্টে" গিয়া দাঁড়াইল। হাডু-ডুডু শব্দ করিতে করিতে দলপতিই সর্ব্বপ্রথমে অপর দলের "কোর্টে" প্রবিষ্ট হইয়া কাহাকেও "মর্" করিবার চেষ্টা করায় অপর দলও সতর্ক হইয়া উঠিল, শত্রু—মারিয়া পলাইতে না পারে। তাহাকে "কোর্টের" মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তাহার হাডু-ডু শব্দের দমটুকু ফুরাইয়া দিতে পারিলেই তাহার বীরত্বটুকুও ফুরাইয়া যাইবে। বেচারা মারিতে আসিয়া নিজেই "মর্" হইবে। খেলা প্রথমেই খুব জমিয়া উঠিল। ভোলার দল ঈর্ষা ক্রূর

নেত্রে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, ভোলাও হতাশ না হইয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

যে ভাগে নীলমণি আছে, সেই ভাগের অপর পক্ষের এক বালকের "মর্" লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবা মাত্র ভোলা অপর পক্ষের বালকের হইয়া মহা তর্ক বাধাইয়া দিল। নরেনও সেই তর্কের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "কখনই নয়,—নেপাল নিশ্চয়ই দাসুকে মেরেছে।" দাসুর দলের প্রতিবাদের উপরেও ভোলার কণ্ঠ সকলের কণ্ঠকে ছাপাইয়া দিল—"দাসু 'মর্' হয়নি! মিথ্যা কথা এ! তোম্‌রা এমনি করে নিজের কোলে ঝোল্ টানো"! দাসুর দলও সহানুভূতিকারীর বাক্যে অস্ফুট সায় দিল। তখন নীলমণি অগ্রসর হইয়া দু' এক বার সগর্জ্জনে "থাম্ থাম্" শব্দ করিতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল; ভোলার পানে চাহিয়া সে রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তোমার মত্‌লবটা হাসিল না ক'রে দেখ্‌ছি ছাড়্‌বে না? ঝগড়া বাধাবেই নিতান্ত?"—নরেন সপরিহাসে বলিল, "আহা অনেক করে দল জুটিয়ে আশা ক'রে এসেছে, করুক না একটু ঝগড়া, তুমিই বা তাতে ভড়কাও কেন?" তার পর বাম করতলের উপর দক্ষিণ হস্তের কনুই রাখিয়া দক্ষিণ করটিকে সর্পের ফণার আকারে ভোলার পানে সঞ্চালিত করিয়া বলিল, "হুর্-রে বক দেখেছ? রাঙ্গা বকের ছা দেখেছ?" নীলমণি রক্ত চক্ষে নরেনের পানে চাহিয়া ধমক দিল, "নরেন।" নরেন অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

ভোলাকে অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীলমণি শান্তস্বরে বলিল, "আমার দলের মীমাংসা আমিই করে দিতে পারি! দাসু 'মর্' হয়েছে না হয়েছে, সে আমিই ঠিক্ করে দেব। তুমি কেন এর মধ্যে গণ্ডগোল বাধাতে এসেছ? খেল্‌তে চাও খেল, নয়ত—"

ভোলা একেবারে বিসুবিয়সের মত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া উঠিল, "তোদের দলের সঙ্গে কুকুরে খেলা করে—শালা ভোমা গোয়ালা!"

"তুমি যে ঝগড়া বাধাতেই এসেছ, তা আমি তোমাদের দেখেই বুঝেছি। এখনো বল্‌ছি, চুপ করে খেলা দেখ্‌তে হয় তো ছাখ, নয়ত"—

"নয়ত কিরে শালা চাষা!—তোর বাবার মাঠ, যে হুকুম চালাবি?" —নরেন তীরবেগে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার বাবার মাঠ! বেরোও বল্‌ছি এখান থেকে।" ভোলা মুষ্টি বদ্ধ করিয়া নরেনের পানে ঝুঁকিয়া বলিল, "সাধ্যি থাকে বার্ কর।" নরেন নীলমণির পানে চাহিবার পূর্ব্বেই নীলমণি উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, "থাম, থাম বল্‌ছি তোমরা! কানাই, খেলা গুটোও,—চল আমরা বিলের ধারে খেল্‌ব! চল এগোও সব"! নিতান্ত অনিচ্ছুক অপ্রসন্ন ভাবে বালকের দল খেলা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। নরেন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও কাতর ভাবে নীলমণির পানে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কথা কহিতে সাহস করিল না।

নীলমণির দলের সঙ্গে নরেনকেও পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া রতন পূর্ব্বদিনের পদ্যপাঠ-বিদ্বেষ ভুলিয়া করতালি দিয়া গাহিয়া উঠিল, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে—কে বাঁচিতে চায়! দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে—কে পরিবে পায়।" নরেন মুষ্টি বদ্ধ হস্তে তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া রতনের উপর পড়িবামাত্র ভোলার দলও নরেনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নীলমণি সবেগে সমবেত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নরেনকে ছিনাইয়া লইবামাত্র যুধ্যমান দল উন্মত্তের মত নীলমণিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ভোলা দলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল, "মার্ ঐ শালাকেই

মার্—এই দলের চাঁই! পিষে ফ্যাল্ একেবারে।" নীলমণি চাহিয়া দেখিল, সদলবলে নরেন আবার ছুটিয়া আসিতেছে! বোঁ বোঁ শব্দে চক্রাকারে দুই হাত ঘুরাইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নীলমণি সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল, "খবর্দ্দার! আমার দলের কেউ এগিয়েছ কি মরেছ! চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাক সব। এই বদ্‌মাস কটাকে আমিই দেখে নিচ্চি!" নিঃশব্দে নীলমণির দল দাঁড়াইয়া সেই ক্ষুদ্র সপ্তরথী-পরিবৃত ক্ষুদ্র অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। দুই পাশের যুধ্যমান বালকগণ বাতাহত কদলীবৎ চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া ঢিপ্‌ঢাপ করিয়া পড়িয়া উলটি-পালটি খাইতেছিল। পতিত এবং আঘাতিত বালকগণ নীলমণির রৌদ্রমূর্ত্তি এবং দলবদ্ধ বালকগণের রোষরক্তিম প্রতীক্ষা দেখিয়া বুঝিল—ব্যাপার বড় সাধারণ রকম হইবে না! তাহারা একে একে বঙ্গের চাণক্য-নীতি স্মরণ করিয়া পলায়ন দিল। কেবল ভোলা ও রতন বীরাগ্রগণ্যদ্বয় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল।

ভোলাকে সবেগে একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া নীলমণি রতনকে কায়দা করিয়া ধরিল। ভোলাকে আবার নীলমণির দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া নরেন আর সহ্য করিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া প্রাণপণ বলে ভোলার নাসিকা লক্ষ্যে এক ঘুঁষি মারিতেই ভোলার নাসিকা হইতে ঝর ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভোলা তখন নীলমণিকে ত্যাগ করিয়া নরেনের প্রতি ধাবিত হইল। রতনকে পরাস্ত করিয়া নীলমণি আসিয়া তাহাকে না আট্‌কাইলে নরেনের পক্ষে আজ বিষম ব্যাপার ঘটিত।

শেষে "পরাভূত যুদ্ধে মহা অভিমানে—অভিমানী কুলবীরর্ষভদ্বয়" রতন ও ভোলা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মাঠ ত্যাগ করিল।

৩

সন্ধ্যাকালে পুঁটে আসিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া নীলমণিকে ডাকিল, "ও নীলু বাবু! আপনাকে বড় দাদা বাবু যে ডাক্‌ছেন! যান্ একবার তাঁর কাছে।" বড় দাদা বাবু নরেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ। পুঁটে তাঁহার খানসামা। জমীদার বাড়ীর মধ্যে নীলমণির সেও এক শত্রু। মনিবের পূর্ব্বতন চাকরেরা চিরদিনই নবাগত কেহ প্রভুর প্রিয় হইলে তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। পুঁটেও নীলমণিকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। ছোট বাবুর পরিত্যক্ত কাপড়টা জামাটার উপর তাহার দারুণ লোভ। সুরেন্দ্রনাথের প্রসাদি জামার লম্বা হাতা, অসঙ্গত ঝুল এবং বুক পীঠের বেড়ের আধিক্যে তাহাকে সংএর মত দেখাইত! কেহবা তাহাকে প্রশ্ন করিত, "পুঁটে তুই জামাটাকে পরছিস্ না, জামাটাই তোকে পরেছে?" সুরেন্দ্রনাথ লোকটাও কিছু অসৌখীন্, তাঁহার "বুড়ুটে" পাড়ের দীর্ঘ কাপড়খানারও খানিকটা পুঁটেকে কোমরে পোঁটলা করিয়া রাখিতে হইত! কিন্তু ছোট বাবুর লেস্‌দার পাঞ্জাবী হ্যাথাওয়ে ও লেড্‌লর বাড়ীর সার্ট যাহা তাহার মা ছোট ছেলেটিকে অত্যন্ত চেষ্টায় কর্ত্তার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়াও আনাইয়া সজ্জিত করেন, সেই জামা এবং সুন্দর সুন্দর পাড়ের মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতী গুলির উপর পুঁটের প্রাণ পড়িয়া থাকিত, কবে তাহা একটু পুরাতন হইবে বা একটু ছিঁড়িবে! এই গুলিই যে তাহার গায়ে এবং পরণে একেবারে "ফিট্" হয়। কিন্তু নীলমণি আসা পর্য্যন্ত তাহা প্রায় নূতন অবস্থাতেই নীলমণির অধিকারভুক্ত হয়। সুধু এই নয়—ছোট বাবুর সঙ্গী বলিয়া নীলমণিকে সকলেই একটু অতিরিক্ত রকম ভালবাসে

(তাহার যে কোন গুণের দ্বারা সে সকলের ভালবাসা পাইতেছে ইহা পুঁটে মানিতে চাহে না। ছোট বাবুর সঙ্গী হইতে পারিলে তাহারও এই "অপগুণের ধাড়ী" নাম পাইতে হইত না! এই "অপগুণের" ভিতরেই লোকে "গুণের" সন্ধান পাইত, তাহার এইরূপ মত)! নীলমণির এত দৌরাত্ম্য পুঁটে তাই সহিতে পারিতেছিল না।

নীলমণি গিয়া দেখিল, সুরেন্দ্রনাথ বেত্রহস্তে রুষ্টভাবে বসিয়া আছেন। ভোলা প্রমুখ বীরগণকে ত্রেতাযুগের "ভগ্নদূতের" মত ধূলি-ধূসরিত দেহে সজল নয়নে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীলমণির ভারি হাসি পাইল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণিত রামরাবণের যুদ্ধের হতাবশিষ্ট বারগণের কথা তাহারও মনে পড়িয়াছিল।

নীলমণিকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ একবার বেত্রগাছি মৃদুভাবে আছড়াইয়া লইলেন। বজ্র গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন "নীলমণি! তুমি এদের মেরেছ?" নীলমণি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! "কথা কচ্চনা কেন? উত্তর দাও, এদের মেরেছ কি না?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কেন?" "ওরা আমাদের দলের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়েছিল!" ভোলার দল স-কোহাহলে একবারে বাধা দিয়া জানাইল যে, আর কাহারো সহিত তাহাদের মারামারি হয় নাই, কেহই দাঙ্গা করে নাই, কেবল একা নীলমণিই তাহাদের দলকে দল ঠেঙ্গাইয়াছে। নরেনের নামটা তাহারা সুরেন্দ্র বাবুর কাছে উল্লেখ করিতে সাহসী হইল না, পাছে তাহাতে মোকর্দ্দমা কিছুমাত্র কাঁচিয়া যায়। "চুপ্ করে আছিস্ যে? উত্তর দে! দলের সঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে, না তুই একা এই ভেড়াগুলোকে "গোবেড়োনে বেড়িয়েছিস্?" বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টেও হাস্য সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না! নীলমণি নতমুখে ছিল, সে হাসি সে

দেখিতে পাইল না, কিন্তু বাদীপক্ষ তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিল, বুঝি মোকর্দ্দমাই ফাঁসিয়া যায়! ভোলা অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার রক্তস্রাবী নাসিকা এবং রতন প্রমুখ বীরেরা কেহ ব্যথিত গণ্ড, কেহ বা আঘাত-প্রাপ্ত ওষ্ঠাধর, বেদনাগ্রস্ত অঙ্গ দেখাইয়া একযোগে বিষম করুণ-রসের তুফান তুলিয়া দিল! নীলমণি একটী প্রতিবাদও করিল না। তাহার কেবল ঘৃণা হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রনাথ রাগিয়া আগুণ হইয়া উঠিলেন। রক্ত চক্ষে নীলমণির পানে চাহিয়া দন্তে দন্তে চাপিয়া বলিলেন, "বল্ তোর কি বল্‌বার আছে?" নীলমণি নিঃশব্দেই রহিল। "রাস্কেল্, তুই গোয়ালার ছেলে হ'য়ে বামুন কায়েতের ছেলেদের গায়ে হাত তুলিস্? রক্তপাত করিস্?"

সুরেন্দ্রনাথের হস্তস্থ বেত্র সজোরে নীলমণির অঙ্গে পড়িতে ও উঠিতে লাগিল! চার পাঁচবার আঘাতেও নীলমণিকে সেই "নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব" দেখিয়া সুরেন্দ্রের রাগ আরও চড়িয়া গেল। যিনিই কখনো কাহাকেও প্রহার করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে প্রহৃত ব্যক্তি পলাইয়া গেলে বা কাঁদিয়া ফেলিলে দণ্ডদাতা তুষ্ট বই রুষ্ট হন না! ইহাতে তাঁহার প্রহারের প্রতি সম্মানও দেখান হইয়া থাকে এবং এই উপায়ে তাহারা উভয়েই বাঁচিয়া যায়। একজন পড়িয়া মার খায় এবং একজন অনবরত মারিতে থাকে, ইহাতে প্রহৃত ব্যক্তির অপেক্ষা প্রহারকর্ত্তার বিপদ যে বড় কম হয়, তাহা নয়! উভয় পক্ষেরই এ বীরত্বের ফল শোচনীয় হইয়া পড়ে! দণ্ডিতের এইরূপ অন্যায় বীরত্ব দেখিয়া দণ্ডদাতা মাত্রেরই যেরূপ হইয়া থাকে, সুরেন্দ্রনাথেরও রাগ বাড়িয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ডোণ্ট্ কেয়ার! বটে?" বেত্রে দ্বিগুণ জোর দিয়া সেটাকে চালিত করিলেন—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ

—নীলমণির বাহুর একস্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে অটল। রক্তের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুরেন্দ্রনাথের হস্তের বেত গাছটা যেন আপনা হইতেই ছিট্‌কাইয়া ঘরের মেজে পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্র বার কতক তাহার পানে চাহিয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "চলে যা আমার সুমুখ থেকে।" চীৎকারে রোষের ভাব না ফুটিয়া যেন দোষীর আর্ত্তকণ্ঠের ধ্বনির মতই শুনাইল! নীলমণি তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল।

ভোলার দল তখনো দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সুরেন্দ্র সহসা লাফাইয়া উঠিলেন। পতিত বেত্রটা তুলিয়া লইয়া হাঁকিলেন, "বেরো, বেরো ভেড়ার দল এখান থেকে, নইলে—" হুড়মুড় করিয়া বেচারারা চক্ষের নিমেষে অন্তর্ধান করিল। বড় বাবুর মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না তাহা সকলেই জানিত।

আঘাতিত স্থানটা জল দিয়া ধুইয়া হাত দিয়া চাপিয়া লইয়া নীলমণি নরেনের পাঠ কক্ষে ঢুকিবা মাত্র আল্‌মারির ভিতরের লুক্কায়িত স্থান হইতে নরেন বলিল, "কি হল ভাই! মিটে গেল?" নীলমণি অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল "হুঁ!" "বড়দা আমায় খোঁজেননি!" "না!" "আমার ওপর রেগেছেন খুব—না?" "তোমার নাম কেউ করেনি তাঁর কাছে।" "সত্যি নাকি? ভোলা—রতন—কেউ না?" নরেন মহানন্দে আল্‌-মারির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবা মাত্র নীলমণির আবৃত হস্তের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল—"ও-কিরে-ওকি? বড়দা বুঝি তোকে মেরেছেন! লুকুচ্ছিস কেন, দেখিনা! এ্যাঁ! সেই পাজীরা নিজেরা মারামারি করে শেষে তোকে এমনি করে মার খাওয়ালে!" নীলমণি একটু হাসিয়া বলিল "যাদের যা বল! গায়ের জোরে হেরে ধূর্ত্তমি

করে' ক্ষমতা জাহির করতে এসেছিল।” তার পরে ভ্রূকুটি করিয়া দন্তে দন্তে চাপিয়া বলিল “ঠকামি করে মার খাওয়ানোর চেয়ে গায়ের জোরের যে কতটা ক্ষমতা, তা একবার ভাল করে জানিয়ে দিলে তখন আর বদ্‌মাইসি কর্‌তে সাহসে কুলোবেনা! তাই-ই এবার কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি।” নরেনও সক্রোধে এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, “বড়দাদার কাছে যেতে যে আমার ভয় করে, নইলে আমি ওদের সব বদ্‌মাইসি ভেঙ্গে দিতাম। বড়দা কিছু শুন্‌বার বুঝ্‌বার আগেই ধাঁ করে মেরে বসেন। আমি এই চল্লাম মার কাছে বাবার কাছে। ভোলাকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে শেষে গাঁ ছাড়া না করি ত আমার নাম নরেন রায় নয়। আমার কিছু ক্ষমতা আছে কিনা বেটাদের দেখাচ্ছি।” নীলমণি উত্যক্তভাবে বাধা দিল “বড়দের কাছে নালিশ ক'রে শাস্তি, এ-ও তোমার ওদেরই মত কাজ করা হবে”। “ওদের মত কাজ করা কিসে? সত্যি যা তাই বল্‌ব! বেটারা আমায় পর্য্যন্ত মারবার উয্যুগ করেছিল, দেখেছিলে ত?” নীলমণি হাসিয়া বলিল, “উয্যুগ কি? তোমায়ও ত ক'ঘা মেরেছিল, তার শাস্তিও তো তখুনি পেয়েছে”। “তোমার হাতে পেয়েছে আমার কাছে ত পায়নি, আমি এইবার দেখাচ্ছি।” “তোমার হাতে পেয়েছে বই কি? সেই ঘুষিটা?” নরেন ভীত ভাবে উত্তর দিল “চুপ্‌ চুপ্‌ বড়দা শুন্‌তে পাবেন”। “সে ভয় করোনা! সেটা আমার নামেই জমা খরচের হিসাবে চলেছে, তুমি আর খুঁচিয়ে তুল্‌তে যেও না, তাহ'লে লুকানো থাক্‌বে না। বামুনের ছেলে বলে বড় বাবুর কাছে ওর ভারি মান দেখ্‌লাম! চাই কি, তোমায় পর্য্যন্ত রেহাই না দিতে পারেন! আমিই ওর বাম্‌নাই গিরি ফলানোর ভুর্‌ ভেঙ্গে দেব একদিন!” নরেন বুঝিয়া নীরব হইল।

ব্যাপার কিন্তু অন্যরকম দাঁড়াইল! প্রভাতে উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথ পাঠশালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক বেলায় নরেন পাঠশালায় গিয়া দেখিল, নীলমণির দলের সাক্ষ্যসাবুদ লইয়া ফুল বেঞ্চে ভোলা ও রতনের বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহারা পাঠশালা হইতে তাড়িত হইয়াছে এবং তাহার দলস্থ বালকেরা শাসিত হইয়াছে। নরেন সানন্দে হাসিতে হাসিতে বাড়ী আসিয়া নীলমণিকে তোলাইল "ওরে ওঠ ওঠ, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে"। নীলমণির যে জ্বর হইয়াছিল তাহা নরেন ভিন্ন কেহ জানিত না! নরেন নীলমণির হাতে পটি বাঁধা এবং আর্ণিকার গন্ধ পাইয়া বলিল, "ওষুধ কে দিল তোকে?" সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাভোগের পর একটু আরাম পাইয়া নীলমণির ঘুম আসিয়াছিল। নীলমণি তন্দ্রার মধ্যেই বলিল, "কে একজন এসে বেঁধে দিয়ে গেল, বড় দাদাবাবু পাঠায়ে দিয়েছেন।"

৪

নরেনের ভবিষ্যত্ বাণীই ফলিল। অপমানে এবং অভিমানে ভোলা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় যূথপতি-শূন্য রতনের দল শীঘ্রই নীলমণির দলে মিশিয়া গিয়াছে। নরেন বলে, "যেমন কুকুর তেমন মুগুর হয়েছে!" নীলমণি বলে, "এর নাম লঘুপাপে গুরুদণ্ড" এবং রতন সহাস্যে হাত তালি দিয়া বলে, "সে তার পিসীর ছেলেদের কাছে ভাল করে পদ্য-পাঠ মুখস্থ কর্‌তে গেছে।" রতনের স্বভাবের লোকেরা জগতের দণ্ড ও পুরস্কার উভয়েরই অতীত হইয়া শৃগালের মত অতি স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইতে থাকে।

প্রতিদ্বান্দ্বিহীন বালকগণ যুদ্ধবিহীন সৈন্যদলের মত ক্রমে যখন উত্তেজনা

ও উৎসাহ শূন্য হইয়া দিনে দিনে অলস হইয়া পড়িতেছিল তখন সহসা একদিন একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে তাহাদের দলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সকলে নীলমণিকে ঘিরিয়া ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করি—"নীলুদা, সত্যি তুমিও নরেনের সঙ্গে কল্‌কাতা যাচ্চ? নীলমণি সহাস্যে বলিল,—"হাঁরে, সত্যি বই কি!" "কেন তুমি যাবে কেন! নরেন বড় মানুষের ছেলে, সে ইংরিজি পড়্‌তে যাচ্চে, তুমি ইংরিজি পড়ে কি করবে!" "ইংরিজি নাই বা পড়্‌লাম, এমনি যাব।" "না না, তুমি তা যেওনা নীলুদা, তার চেয়ে তুমি এখানেই থাক, পুঁটে বড় খারাপ কথা বল্‌ল তোমায়!" "পুঁটে! বড় দাদা বাবুর সেই চাকর ছোঁড়াটা! কি বলেছে সে?" "সে বড় খারাপ কথা, শুনলে তুমি রাগ কব্‌বে।" নীলমণির কৌতূহল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, "না না, রাগ করবনা —বল্‌।" "বল্‌ছিল যে নরেনবাবুর খান্‌সামা হ'তে তুমি কল্‌কাতা যাচ্চ!" অত্যন্ত বিরক্তি এবং ক্রোধের মধ্যেও নীলমণি হাসিয়া বলিল, "ছুঁচো যেখান দিয়ে যায় তার গন্ধেই লোকে টের পায়।" সকলে এ উপমায় পরম কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে যাহার ভাণ্ডারে যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহা নীলমণির কর্ণে ঢালিতে ছাড়িল না। মুটু বলিল, "আমার ঠাক্‌মা শ্রীক্ষেত্তরে ঠাকুর দর্শন কর্‌তে যাবার সময়ে কলকাতায় কুটুমবাড়ী উঠেছিলেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি কলকাতায় নাকি ভারি অন্ধকার, একটু বাতাস ও আলোর মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যত সব নোনা স্যাঁতা ধরা ইটের বাড়ী, আর তার মধ্যে এমন রাস্তা যে মানুষের চল্‌তেও দম্ আটকে যায়। আবার বড় রাস্তায় এত সব মানুষ মারা যন্তরের গাড়ী, তাতে কেবলি লোক কাটা পড়্‌ছে। তাদের এত শব্দ যে কানে তালা ধরে যায়, আর তাদের

ধোঁয়ায় আকাশ পর্য্যন্ত অন্ধকার হ'য়ে থাকে। ঠাকুমা বলেন, "কল্-কাতায় কি মানুষ যায়, না—সেখানে থাকতে পারে, দম আটকেই মরে যেতে হয়।" নেপাল বলিল, আমার পিসি গঙ্গাসাগরে 'চান' করতে গিয়ে কল্‌কাতা দেখেছে। সে গঙ্গা আমাদের এ "জলঙ্গীর" মত নয়। বিচ্ছিরি নোংরা ঘোলা নোন্‌তা জল, তাতে এত কলের ইষ্টিম্বর চলছে যে. কুটোটি পড়লে দুখান হয়ে যায়। একটু সাঁতার দেবার কি থির হ'য়ে 'চান' করবার যো নেই, এই জল বাড়্ছে আবার কম্‌ছে। কল্-কাতার নদীতে চান করতে পর্য্যন্ত পারা যায় না।" ইত্যাকার বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ গবেষণা শুনিতে শুনিতে নীলমণির মন হইতে কলিকাতা যাওয়ার উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া আসিতেছিল, তথাপি কে যেন বলিল, "তা হলেই বা, নরেন তো সেখানে থাক্‌বে। সে যেমন করে থাক্‌বে আমিও তাই থাক্‌ব! নদীতে 'চান' করতে না পাই, বাড়ীতে করব। খেলবার মাঠ তো আছে, আরও ছেলেরাতো আছে,"—ন্টু বাধা দিয়া বলিল, "তবেই তুমি কল্‌কাতার সব জেনেছ! মাঠ কোথায় পাবে? খালি গলি ঘুঁজি আর বাড়ীতে বাড়ীতে অন্ধকার। মা কালীর বাড়ী যেতে একটা নাকি গরাদ দিয়ে ঘেরামাঠের মত আছে তাতে ছেলে পিলে পা দিলেই হয় গোরা নয় ছেলে ধরারা ধরে নিয়ে যায়। আর কল্‌কাতার ছেলেরা কি আমাদের মত হাডু-ডু কি ডাণ্ডাগুলি খেলে! তারা কেবল লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে চুরুট টেনে বেড়ায়! শুনিস্‌নি, সবাই বলে যে, "ছোঁড়া যেন কল্‌কাতার ফেরতা!" নীলমণি কতক বিশ্বাসে কতক অবিশ্বাসে বলিল, "ছেলে ধরায় আর ধরতে হয় না—গোরাই বা শুধু শুধু ধর্‌বে কেন! আচ্ছা, কল্‌কাতায় মাঠ আছে কিনা, সেখানে ছেলেরা খেলে কিনা, বড়দাদাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করব।" কিন্তু নরেন্দ্রের

মাতা যখন নরেনের বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহার জিম্মায় লাগাইয়া বাক্‌সে পূরিয়া দিতে লাগিলেন, তখন চকিতে তাহার পুঁটের মন্তব্য মনে পড়িয়া মুখ চোখ্ লাল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, সুরেন বাবুর বস্ত্রাদিও গৃহিণী এইরূপে পুঁটেকে জিম্মা দিয়া দেন। নরেন সানন্দে উচ্ছ্বাসে মাতাকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিয়া বলিতেছিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার অত ভাব্‌তে হবে না, আমরা দুজনে মিলে সব ঠিক্ রাখ্‌ব।" মাতা ধমক দিলেন, "তুইত সব পার্‌বি। নীলুকে সব দেখিয়ে না দিলে হয়! নীলু! পুঁটে যেমন হুসিয়ার, তেমনি হয়ো!" "কি মা, কাকে পুঁটের মত হুসিয়ার কর্‌ছ।" মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিকটে দেখিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বাহারে জামা ও বস্ত্রগুলি চাপা দিতে দিতে সন্ত্রস্ত স্বরে বলিলেন "এই নীলুকে নরুর সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। নরু যে আল্‌গা ছেলে, কোথায় কি হারায়ে থাকে, তার ত খোঁজও থাকে না ওর।" সুরেন্দ্রনাথ নীলমণির পানে চাহিয়া দেখিলেন, নীলমণি নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গণ্ড স্কন্ধ পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্র মাতাকে ও ভ্রাতাকে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে বল্‌লে নীলমণি কল্‌কাতা যাবে!" তাহার পরে নীলমণির পানে চাহিয়া যেন সান্ত্বনার স্বরেই বলিলেন, "তুমি এইখানেই থাক্‌বে, নীলমণি, যেমন পড়ছ শুন্‌ছ তেমনি পড়্‌বে খেল্‌বে। কল্‌কাতায় এখানকারমত কিছুতেই তোমার ভাল লাগবে না।" নীলমণি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া কৃতজ্ঞনেত্রে বড় বাবুর পানে চাহিল। সুরেন্দ্রের কথার উপরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা স্বয়ং কর্ত্তার সাহসেও কুলায় না—নরেন বা গৃহিণী তো পরের কথা। নীলমণি সম্বন্ধে আর কেহ উচ্চবাচ্য করিতে পারিবে না।

কলিকাতা যাত্রার জন্য সজ্জিত বাবুদের নৌকা সুরেন্দ্র

নাথ ও নরেনকে লইয়া পরদিন প্রভাতে গ্রাম ত্যাগ করিল। নীলমণি সদল বলে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নৌকা যখন ক্রমে দূর হইতে দূরে গিয়া বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইল, তখনো নীলমণি সেই দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষে তখনো নরেন্দ্রের ম্লান মুখ ও অশ্রুসিক্ত ঈষৎ রক্তাভ চক্ষু ভাসিতেছিল। জমিদার বাড়ীর লোকজন ভৃত্যবর্গ প্রভৃতি বাড়ী ফিরিয়া গেল, নীলমণি নড়িল না। ঘাটে স্নানার্থী লোকের সমাগম দেখিয়া ঘাট ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া বাঁধের উপর শ্যাম শষ্পাবৃত স্থানে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে তেমনি সেই নদীর বাঁকের দিকে চাহিয়া রহিল। সঙ্গীর দলও এদিকে ওদিকে নীরবে বসিয়া রহিল, তাহাকে কেহ ডাকিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইতেছিল না।

বহুক্ষণ পরে দলের অত্যন্ত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া নেপাল ডাকিল, "নীলুদা, নদীতে স্নান করে একেবারে বাড়ী যাই চল।" নুটু বলিল "না—না, চল আজ কমল দ'য়ে স্নান করে আসি!" কোন কথা না কহিয়া নীলমণি নিঃশব্দে জলে নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে বিবিধ ভঙ্গীতে কেহ পাড়ের উপর হইতে সোজাসুজি লাফ্ দিয়া কেহ ডিগ্‌বাজী খাইয়া কেহ পাছু হইতে সবেগে ছুটিয়া নামিয়া জলে গিয়া পড়িয়া শান্ত নদীনীরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করভ-শিশুর ন্যায় মথিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। জলে পড়িয়াও তাহারা সেই কথামালা-কথিত রাজহংসের মত "উড্ডীন্ ডীন্ প্রতিডীন্ মহাডীন্ ডীন্-ডিনের" সদৃশ বহু প্রকারের সন্তরণপটুতার পরিচয় দিতে লাগিল, কিন্তু নীলমণি তাহার শরীরটাকে আজ একটু নাড়িতেও পারিল না। জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া সে কেবলি ভাবিতেছিল, সে যদি এখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি নরেন্দ্রের নৌকা ধরিতে পারে না? পারে, হয়ত পারে,

কিন্তু বড় দাদা বাবু কি মনে করিবেন? এই কতক্ষণ আগেও যে সে কলিকাতা যাওয়াকে অপমান বলিয়া মনে করিতেছিল! এই গ্রামের আকাশ বাতাস এবং প্রত্যেক বৃক্ষটি পর্য্যন্ত যে তাহার মনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে সুদৃঢ় স্নেহ বন্ধনে বাঁধিয়া বলাইতেছিল "কল্‌কাতা যাবনা। সেথানে আমার ভাল লাগে না!" কিন্তু এই দুদণ্ডের মধ্যে আবার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! তাহার অধীর মন তাহাকে কেবলি তাগাদা দিতেছিল, "এখনো নদীর ধারে ধারে ছুটিলে নিশ্চয় নৌকা ধরা যায়, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু কি ভাবিবেন!" নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি জমিদার বাটী অভিমুখে চলিল।

সেই "কলমদহ" বিল, সেই মাঠ, সেই গ্রাম, সেই বহুদিনের নদী, বালকের দল—সবই তো তেমনি আছে! কেবল একটি লোকমাত্র চলিয়া গেলে যে চিরদিনের সবও এমন করিয়া মুছিয়া ধুইয়া এক হইয়া যায়, বায়ু শরীরকে স্পর্শ করে না—আলোর ঔজ্জ্বল্য শক্তি নিবিয়া যায়, আকাশ একটা কালো পরদার মত পৃথিবীর মাথার ওপরে এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত ঢাকিয়া সব আনন্দ সব অনুভব—বুঝি নিজের জীবনের অস্তিত্ব বোধকেও যে এমন করিয়া ঢাকিয়া দেয় এ তাহার বালক বুদ্ধির অগম্যই ছিল। আজ তাই সে অবাক্ হইয়া ব্যথিত মুখে প্রত্যেক জিনিষের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সঙ্গীরা খেলার জন্য জমায়েৎ হইয়াছে, চিরদিনের মত নীলমণিকেই তাহারা অগ্রবর্ত্তী করিতেছে, কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টায় দু এক "পাটি" খেলিয়াই শ্রান্ত দেহে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার শরীরটা ভাল নেই আজ। তোরা খেল্!" মূঢ়ের মত বসিয়া বসিয়া.কেবল সে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। কেন এমন হচ্চে? কেন খেল্‌তে পার্‌ছি না।

৫

যেদিন নরেনের হাতের লেখা একখানি চিঠি নীলমণির নামে আসিল, সেদিন নীলমণির তরুণ জীবনে আবার একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইল! একটা কাগজে লেখা গোটকতক আঁকা বাঁকা অক্ষরে "তুমি কেমন আছ ভাই! আমরা ভাল আছি। তোমার জন্য আমার মন কেমন করিতেছে" এই শব্দগুলার একি ক্ষমতা! সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও যে সে তাহাদের এই ছাড়াছাড়ির দুঃখের সান্ত্বনা পাইতেছিল না, সহসা একখানা কাগজে গোটাকতক অক্ষর আসিয়া কি অমৃত স্পর্শে তাহার সে চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে! অনাস্বাদিত এ কি সুখ!

ইতিমধ্যে নীলমণি পাঠশালায় যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, চালাঘরের হট্টগোলের মধ্যে কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া পা দুলাইয়া পড়া মুখস্থ করা বা ছোট বড় সকল বালকদের উপর সর্দ্দারি করার ক্ষমতায় সে আর কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছিল না। রতন, নেপাল, নুটুরাও মাঠে ঘাটে আর তাহার নাগাল পায় না। দু একদিন অপেক্ষা করিয়া শেষে কেহ কেহ সাহস পূর্ব্বক জমীদার বাড়ী গিয়া সন্ধান লইয়া দেখিল, নীলমণি নরেনের পড়িবার ঘরের এক কোনায় একখানা ছেঁড়া কৃত্তিবাসি রামায়ণ লইয়া অত্যন্ত মনঃসংযোগের সহিত "অঙ্গদ রায়বার," "কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ" পড়িতেছে। "পায়ে চোট্ লাগিয়া ব্যথা হইয়াছে, খেলিতে পারিব না" বলিয়া নীলমণি তাহাদের ফিরাইয়া দিত। রতনেরই ইহাতে "একাদশে বৃহস্পতি" যোগ ঘটিয়া গেল। সে-ই এখন বালকদলের "কমাণ্ডার ইন্ চিফ্" পদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িয়াও যখন আর সময় কাটিতে চাহিত না, তখন নিষ্কর্ম্মা নীলমণি অগত্যা উঠিয়া নরেনের পরিত্যক্ত বইগুলা ঝাড়িয়া পুছিয়া গুছাইয়া রাখিত, কোন সময় বা ঘরটা পরিষ্কার করিত। নরেনের প্রিয়পাত্র বলিয়া এতদিন সকলেই তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত, কিন্তু আজ নরেন দূরে থাকায় চাপ্‌রাস হারাণো চাপ্‌রাসীর ন্যায় নীলমণির অস্তিত্ব সকলকে যেন একটু বিরক্তই করিয়া তুলিত। নরেন্দ্রের মাতা তাহাকে নরেনের ছায়ার মত জানিয়া বরাবরই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেই নরেনের সঙ্গেই তাহাকে কলিকাতা গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং সুরেন্দ্রের কড়া শাসনে তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহাকে এইরূপ অনাবশ্যক প্রতিপাল্যের মত চিরদিনই রাখিতে হইবে বুঝিয়া তিনিও অন্তরে যেন তাহাকে একটু গলগ্রহের মতই বোধ করিতেছিলেন। অবশ্য কর্ত্তব্যবন্ধনের মধ্যে পড়িলে অনুগ্রহের মূর্ত্তিও নিগ্রহের রূপ ধারণ করে। কিন্তু যেদিন হইতে সে তাঁহার খুকীকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—নানা-প্রকারে তাহাকে খেলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে তিনি নীলমণির প্রতি নষ্ট-স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছেন। এই ছোট বোন্‌টি নরেনের অত্যন্ত প্রিয়,—নরেন তাহাকে সর্ব্বদাই আদর করিয়া কোলে করিত।

নরেনের পত্রখানি লইয়া সেদিন নীলমণি যেন বিব্রত হইয়াই পড়িয়াছিল। সমস্তদিনে বার পঁচিশ পড়িয়াও পড়া শেষ হইতেছিল না এবং প্রতিবারেই মনে হইতেছিল, ভাল করিয়া পড়া হয় নাই; আর একবার পড়িতে হইবে। পত্রখানা কোথাও রাখিয়াও সোয়াস্তি হইতেছে না,: এঘর হইতে ওঘরে যাইতে হইলেও সেখানাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইতে হইতেছে এবং তাহাতে পত্রখানা দুমড়াইয়া মুচ্‌ড়াইয়া যাইতেছে

বলিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে মাঝে মাঝে সেখানাকে বাহির করিয়া হস্তমার্জ্জনের দ্বারা তাহার অঙ্গের কোঁচকানো দাগগুলি বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে সমস্তদিন কাটাইয়া বৈকালে পত্রখানা লইয়া সে বিলের ধারের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। বালকের দল সহজে যে এখানে খেলিতে আসে না, তাহা সে বিশেষরূপেই জানিত। তাহাকে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাহার পরিচিত গোটা দুই কুকুর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গ লইল এবং সাহ্লাদে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কখনো মৃদু কখনো দ্রুত গতিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। নীলমণি বহু চেষ্টায়ও তাহাদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা ক্ষান্ত হইল।

বিলের ধারে একটা পতিত বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া সে পত্রখানা চোখের উপর বিস্তৃত করিয়া ধরিল, কিন্তু ক্ষণপরে তাহাতে যেন পড়ার অসুবিধা হইতেছে এই ভাবে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর শুইয়া পড়িয়া সেখানাকেও ঘাসের উপর পাতিয়া লইয়া এক একটি অক্ষরের উপর দৃষ্টিকে বহুক্ষণ ধরিয়া নিবদ্ধ রাখিতেছিল। যেন তাহার মধ্যে কি দুরূহ তত্ত্বই নিহিত আছে, যাহা বুঝিয়া না পড়িলে অর্থ বোধ হইবে না। ক্রমে গোধূলির আলোকও জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাখালেরা গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিবার সময় "নীলমণিদা"কে তদবস্থায় দেখিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর না পাইয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের বিগ্রহ-মন্দিরে আরতির শব্দ উঠিল, পশ্চিম আকাশের শেষ রক্তাভাটুকুও মিশাইয়া যাইতেছিল, অক্ষর আর একটিও চোখে ঠেকে না, কুকুর দুটার ক্ষুব্ধ আহ্বান-শব্দে তখন নীলমণি মুখ তুলিয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল সাঁজের তারা অনেকক্ষণ উঠিয়া পড়িয়াছে। তখন পত্রখানা সযত্নে মুড়িয়া হস্তে লইয়া নীলমণি বাড়ী অভিমুখে চলিল।

অতঃপর পত্রখানা যে কোথায় রাখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার মহা চিন্তা পড়িয়া গেল। নরেনের পরিত্যাক্ত ও সম্প্রতি তাহার অধিকারভুক্ত একটা কাঠের বাক্সমাত্র তাহার সম্পত্তি, কিন্তু সেটার মধ্যে রাখিতে মন সরিল না। কাঠের বাক্স হইতে আলমারির পাশ, তথা হইতে কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গি হইতে মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত হইতে নরেনের পুরাতন বইখানার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াও যখন তাহার মন শান্তি পাইল না, তখন সে পত্রখানা নিজের মাথার বালিসের তলায় চাপিয়া রাখিয়া তাহাব উপর মস্তক দিয়া শয়ন করিল। শুইয়া কিছুক্ষণ পরে মনে পড়িল, নরেন না তাহাকে পত্রের জবাব দিতে বলিয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার পত্রখানা টানিয়া লইয়া আলোর নিকটে গিয়া সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া অক্ষরগুলি একটি একটি করিয়া পড়িয়া দেখিল যথারীতি "পত্র পাঠ উত্তর দিবে" লেখা আছে বটে! উত্তর লিখিতে কিন্তু কাগজেরই যে অসংস্থান। মাটির দোয়াতের ভিতরে ভূষার কালিতে ভিজানো ন্যাকড়াখানা নীলমণির পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করার সঙ্গেই শুকাইয়া উঠিয়াছে, তবু নীলমণি তাহাতে একটু জল দিয়া খাকের কলম দিয়া ঘুঁটিয়া একটু কালি প্রস্তুত করিয়া লইল, কিন্তু কাগজের কি উপায় হয়? ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা সে মহাভারতের মলাটের উপরের পাত্‌লা মলিন শাদা পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পত্র লিখিতে বসিল, কিন্তু সেই তৈল-চিত্রিত পাত্‌লা কাগজখানির উপর স্বল্প ভূষা-মিশ্রিত জলভাগবহুল মসী কোন মতেই দাঁড়াইতে চাহিতেছিল না! বহু চেষ্টার পর নীলমণি ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

নীলমণি যখন এইরূপ মসী যুদ্ধে ব্যাপৃত, এমন সময়ে নরেনের মাতা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নরেনের ঘরটির সজ্জিত পরিষ্কৃত অবস্থা দেখিয়া

(যাহা এতদিন তিনি না পরিষ্কার করাইয়া দিলে তাঁহার মতে "আঁস্তাকুড়" হইয়া থাকিত।) প্রসন্ন মুখে ডাকিলেন "নীলু, কি কচ্ছিস্‌রে ?" নীলমণি তটস্থ ভাবে স্থির হইয়া বসিল। মাতা নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নরেনের চিঠির উত্তর লিখ্‌ছিস বুঝি ? (নীলমণি যে নরেনের পত্র পাইয়াছে নীলমণির উক্ত সব ব্যাপারে সে খবর মায় কর্ত্তার কাছে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে) আ কপাল, ঐ বুঝি কাগজ ! আর ঐ কালি ! ওতে কখনো চিঠি লেখা হয়। যা সরকারের কাছে গিয়ে এক খানা কাগজ আর তার দোয়াতটা চেয়ে আন্‌গে যা"। নীলমণি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া সরকারের সন্ধানে ধাবিত হইল, কিন্তু সরকারের "হুঃ ! "কাঙ্গালের ঘোঁড়া রোগ,"—"ঘুটে কুড়ুনির বেটা সদর নায়েব," "অতি দর্পে হত হইল লঙ্কার রাবণ। অতি মানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন। অতি দানে বলীর পাতালে হইল ঠাই, অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিহ ভাই !" প্রভৃতি বচন শুনিয়া অপমান-আরক্ত মুখে ফিরিয়া আসিয়া গৃহ কোণে প্রবেশ করিলে গৃহিণী বলিলেন, "কই, কালি কাগজ আন্‌লিনে ?" গৃহিণীও নীলমণিকে দিয়া নরেনকে কলিকাতার গাড়ী ঘোড়া ভরা রাস্তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য গোটা কতক কথা বলিয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। এক্ষণি নীলমণিকে রিক্তহস্তে ফিরিতে দেখিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "সরকার বুঝি দিলে না ? আমার নাম করেছিলি ?" "না"। "যা, আমার নাম করে চেয়ে আন্‌গে।" নীলমণিকে গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া বলিলেন, "তবে থাক্ কাল লিখিস্।" গৃহিণী চলিয়া গেলেন, কিন্তু নীলমণির তো কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলিবেনা। আবার সে ধীরে ধীরে সরকারের নিকটে গিয়া গৃহিণীর আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বহু বক্র উক্তি সহ করিয়াও কালি কাগজ লইয়া

আসিল! এরূপ সহিষ্ণুতা তাহার জীবনে এই প্রথম। পর দিন গৃহিণী তাহাকে নরেনের ঠিকানা বলিয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওরে পাগ্‌লা, পত্তর বুঝি অমনি যায়? ওতে দুটো করে পয়সা ট্যাক্‌স দিতে হয়। সরকারের সঙ্গেতো তোর বনেনা, নইলে সেই থান থেকে আমার নাম করে "ইষ্টাম্প" চাইতে বলতাম। তা এই দুটো পয়সা নে! গাঁয়ে যখন ডাকওয়ালা আসবে, তার কাছ থেকে "ইষ্টাম্প" কিনে নিস্‌।" মাথা হেঁট করিয়া নীলমণি হাত পাতিয়া পয়সা লইল, এও তাহার জীবনে এই প্রথম।

৬

পুঁটের দূরদর্শী ও জ্ঞানগর্ভ বচনেরই প্রামাণ্য ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। নীলমণি নরেনের নিকটে না গিয়াও ক্রমে ক্রমে জমীদার বাড়ীর সর্ব্বসাধারণের নিকটে এই এক বৎসরে একটি বিশ্বস্ত কর্ম্মদক্ষ ক্ষুদ্র থান্‌সামাতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর ঐরূপ স্নেহানুগ্রহ নীলমণিকে ক্রমে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনে সচেষ্ট করিয়া তুলিয়া খুকীর বাহনে পর্য্যবসিত করিয়াছে। জলে বাস করিয়া জলজন্তুদের সহিত বিবাদ রাখা চলে না। যখন নীলমণির এই জমীদার বাড়ী ও তাহার প্রিয় শিষ্য হরে রাখালের কুঁড়েঘর তাহার কাছে সমানই ছিল, তখন সে কাহাকেও খাতির করিয়া চলিত না! নরেনের উপরও সে তাহার শাসনদণ্ড চালাইত। কিন্তু আজ পাছে তাহাকে কেহ এ স্থান হইতে চ্যুত করে, সেই আশঙ্কা ক্রমে তাহাকে সকলের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত করিয়াছে! এ বাড়ী ছাড়িবার আর যে তাহার উপায় মাত্র নাই। এমন কি, চির শত্রু পুঁটেও যদি সেখানে থাকিত তো নীলমণি তাহারও সহিত নিশ্চয় সৌহৃদ্য স্থাপন

করিয়া ফেলিত। সরকার মহাশয়ও এখন সেই "ভেমো গোয়ালার ছেলের ষাট্ বৎসর বয়স হবার পূর্ব্বেই বুদ্ধির গুণে সে যে সাবালক হইয়াছে," একথা প্রসন্ন মুখেই স্বীকার করেন! নীলমণির নামে নরেনের পত্র আসিলে আর সেখানা লইয়া তিনি নীলমণিকে নির্দ্দয় ভাবে কষ্ট দেন না! "সরকার মশায়, আমার চিঠি বাক্‌সের মধ্যে পূরে রাখ্‌লেন, দিলেন না"! নীলমণির ইত্যাকার অভিযোগে গৃহিণীর রুষ্ট আদেশ আসিয়া তাঁহার চতুর্গুণ রুষ্ট হস্ত হইতে পত্রখানা নীলমণির মুখের উপরে লোষ্ট্রের আকারে পতিত হয় না। এখন তিনি নিজেই হাসিমুখে ডাকেন, "নীলুচাঁদ, ছোট বাবু তোকে পত্র দিয়েছেন রে!"

প্রত্যহ অম্লান মুখে সমস্ত দিন সকলের অশেষ ফর্‌মাইস্ খাটিয়া যে দিন তাহার পত্র আসিবার সম্ভাবনা বুঝে, সেদিন সে বৈকালে খুকীকে স্কন্ধে লইয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়ে, মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামান্তর হইতে এইপথ দিয়া ডাক হর্‌করা সে গ্রামে আসে। খুকীকে খেলা দিতে দিতে অধীর আগ্রহে সে পুনঃ পুনঃ মাঠের দিকে চাহিতে থাকে, গ্রামের রাখাল বা কৃষাণ গরু তাড়াইয়া :এদিক হইতে ওদিকে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে। ক্বচিৎ গ্রামান্তরগামী দু' এক জন পথিক পথ বাহিয়া আসে বা চলিয়া যায়! এমনি করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড ধরিয়া প্রতীক্ষার পর সহসা সেই প্রতীক্ষার বস্তু নিকটে আসে! নীলমণি তখন খুকীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে হর্‌করার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করে। পিয়ন জমীদার বাড়ী গিয়া স্কন্ধের ব্যাগ নামায়, সরকারের নিকটে একে একে সমস্ত চিঠি পত্র ইত্যাদি দিতে থাকে, নীলমণির ব্যাকুল দৃষ্টি কেবল সেই খামগুলির উপরে বিদ্যুতের মত ঘুরিতে থাকে—যদি সেই প্রিয় হস্তাক্ষরটি সে পাইবার পূর্ব্বেই দেখিয়া লইতে পারে। চশ্‌মা চোখে

সরকার মহাশয় সমস্ত পত্র একে একে দেখিয়া লইতে লইতে যেমন মুখ তুলেন অমনি নীলমণির সমস্ত বুকটা বহুক্ষণ ব্যাপী প্রতীক্ষার উদ্বেগপূর্ণ বিসম তালে ধ্বনিত হইতে হইতে সহসা একেবারে লাফাইয়া উঠে। তার পরে সরকার মহাশয়ের সহাস্য স্বর "নীলমণি, এই নে!" তখন অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত নীলমণির যেন বাহ্য জ্ঞানও থাকে না। আর যে দিন সরকার মহাশয় মাথা তুলেন না—পত্র গুলি একেএকে গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া যান, সেদিন আর সে উঠিয়া খুকীকে ঘাড়ে লইয়াও অন্দরে ঢুকিতে পারে না। কাহারো দ্বারা তাহাকে গৃহিণীর নিকট প্রেরণ করিয়া নিঃশব্দে মাঠে চলিয়া যায়। বহুক্ষণ তথায় কাটাইয়া রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে নিজস্থানে গিয়া শুইয়া পড়ে। হায়, কাহার জন্য আজ তাহার এ দাসত্ব! কোন্ সুখের আস্বাদ তাহাকে দিন দিন এইরূপে বন্দী করিয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করিতেছে! এবাড়ী ছাড়িয়া গেলে কি আর নরেনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে! তাই, সে সেকথা মনে করিতেও শিহরিয়া উঠে!

একবৎসর পরে একদিন শরতের প্রভাতে গৃহিণী বলিলেন, "ওরে নীলু, কাল তোর দাদাবাবুরা বাড়ী আস্‌ছে।" সে দিন ও রাত্রিটা নীলমণির কাটানো অসাধ্যই হইয়াছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া সে গৃহিণীকে বলিল, "মা আমি ঘাটের ধারে যাচ্ছি!"

"এত ভোরে গিয়ে কি কর্‌বি? তাদের আস্‌তে হয়ত বেলা দুপুরই হ'য়ে যাবে!"

নীলমণির অধীর অন্তর নিষেধ মানিল না! ছুটিতে ছুটিতে সে ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল। জমীদার বাড়ীর লোকজন ঘাটে বাবুদের প্রতীক্ষার্থ আসিলে নীলমণি

ঘাট ত্যাগ করিয়া নদীর কূলে কূলে অনেক দূর চলিয়া গিয়া একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। কত নৌকা শাদা পাল ফুলাইয়া আশ্বিনের খরবেগশালী নদীস্রোতের ভাটার টানে গা ছাড়িয়া দিয়া প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের লইয়া গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া চলিয়াছে! মাঝিরা আনন্দে আগমনী গাহিতেছে। নৌকার মধ্যেও আজ আনন্দভরা কণ্ঠের গুঞ্জন! সহসা এক সময়ে নীলমণি চমকিত হইয়া ডাকিল—"স্বরূপ দাদা নাকি?" নৌকা হইতে স্বরূপ মাঝি সাড়া দিল—"হাঁরে নীলুভাই!" সে পূর্ব্ব রাত্রে বাবুদের আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। আনন্দে নীলমণি আঘাটা ভাঙিয়া নিম্নে নামিতে লাগিল। নৌকা হইতে মুখ বাহির করিয়া সুরেন্দ্র বলিল, "নীলমণি নাকি?" "হাঁ, নরেন বাবু কই?" নরেন্দ্র ছইয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সানন্দ বিস্ময় কণ্ঠে বলিল, "এতদূরে এসেছ কেন? ঘাট যে এখান থেকে অনেকটা।" নীলমণি উত্তর দিতে পারিল না, কেবল নির্ব্বাক আনন্দ পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিল, নরেন এই একবৎসরে কত খানি বড় হইয়াছে, বুঝি কত সুন্দরও হইয়াছে—কণ্ঠের স্বরটাও এতদিন এত মিষ্ট ছিল না! সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নৌকা লাগাত' স্বরূপ, উঠে পড় নীলু।' স্বরূপের বিরক্ত মুখভঙ্গী দেখিয়া নীলমণি কুণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত "না না, আমি হেঁটেই যাব এটুকু" বলিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিল।

ঘাটে নৌকা পৌছিলে বাবুরা নামিয়া টম্‌টমে আরোহণ করিলেন। জিনিস পত্র গোশকটে বোঝাই হইল। নরেন ডাকিল, "এস নীলমণি!" নীলমণি চাহিয়া দেখিল, সরকার মহাশয় টম্‌টমের পশ্চাতে উঠিয়া বসিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল, "আপনারা গাড়ী চালান্, দেখুন হেঁটে আমি ওর সমান্ যাব।"

মহানন্দে দিন কাটিতে লাগিল। পুরাতন সঙ্গীদের আজ নীলমণির মনে হইলে মাঠে গিয়া খেলার প্রস্তাব করিবামাত্র নরেন তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "ছ্যাঃ—ওদের সঙ্গে আবার খেলে? সেই ডাণ্ডাগুলি আর হাডু-ডু তো? রামঃ! আমরা এখন ক্রিকেট্ খেলি! আমাদের স্কুলে তিনটে পার্টি আছে, এ-টিম্ বি-টিম্ সি-টিম্! বড় ছেলেরা এ-টিম আমরা বি-টিম্, আমাদের ছোটরা সি-টিম্। আমার একজন বন্ধু সেই যার কথা তোমায় লিখি—সেই অখিল বলে ছেলেটি সে যা রান্' দিতে আর খেলতে পারে, উঃ: তার নাম রেখেছি আমরা প্রিন্স রঞ্জিত সিংজি" ইত্যাদি! শুনিতে শুনিতে নীলমণির বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা লাগিল। অখিলনাথের নামে আর কোন দিনতো এরূপ কষ্ট হয় নাই।

নরেন্দ্র বাড়ী আসার পর আর কেহ নীলমণিকে কাজ করিতে ডাকিত না, কিন্তু নরেন্দ্র একদিন নীলমণিকে তাহাদের স্নানের বস্ত্র লইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, "তুমি পুঁটের কাজ কর্‌ছ কেন?" নীলমণি একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। আর একদিন খুকীকে তাহার স্কন্ধে দেখিয়া বলিল, "তুমি ওর বাহন হয়েছ যে দেখ্‌ছি?" মাতা উত্তর দিলেন "খুকী তো এখন ওর কাছেই সর্ব্বদা থাকে।" খুকী তখন নীলমণিকে ঘোড়া হইতে অনুরোধ করিতেছিল। বিরক্ত হইয়া নরেন বলিল, "কেন, ওর ঝি কি হ'ল?" "নীলুই ওকে খেলা দেয়, তাই ঝি আর রাখিনি!" "কেন, ওকি তোমাদের চাকর? বারণ করে দিচ্চি, ওকে দিয়ে তুমি এসব করিও না।" "তবে ও কি কর্‌বে রে পাগলা?" "যা খুসী কর্‌বে। ও আমার ভাইয়ের মত, ওকে আমরা কত ভালবাসি,—বড়দা বাসেন, আমি বাসি, তা কি তোমরা জান না?" লজ্জায় আনন্দে নীলমণি সেখান হইতে

সরিয়া তাড়াতাড়ি খুকীর দুধের বাটী ধুইতে বসিল। আজ এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ জগতে নাই, যাহা সে পারে না। আজ তাহার সমস্ত অধীনতা এমনি সার্থক হইয়া গেছে। কেবল সে সুরেন্দ্রনাথের নিকটে যাইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তিনি একদিন গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন,—"নীলমণি, শুনলাম তোমায় কেউ জোর করিয়ে পাঠ্‌শালা ছাড়ায়নি, তুমি নিজেই ছেড়েছ!" জড়িতকণ্ঠে নীলমণি উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কেন পাঠ্‌শালা ছাড়্‌লে?" "ভাল লাগ্‌ত না।" আর তিনি কিছু বলেন নাই, সেই হইতে নীলমণি পারত পক্ষে আর তাঁহার সম্মুখে যাইত না; তাঁহার সম্মুখে কোন কাজ করিতে তাহার কেবল কেমন যেন লজ্জা করিত।

ক্রমে পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেলে নরেনরা কলিকাতা যাত্রা করিল। নীলমণি এবারে তাহার সঙ্গে নিশ্চয় কলিকাতা যাইবে ভাবিয়া রাখিয়া ছিল, কিন্তু নরেন সে সম্বন্ধে কোন উচ্য বাচ্য না করায় নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল একটী বেদনা তাহার ব্যথিত হৃদয়কে যেন অধিকতর নির্ব্বাক করিয়া কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল।

৭

আবার একবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নীলমণি এখনো জমীদার বাড়ীতেই একভাবে দিন কাটাইতেছে। অধিকন্তুর মধ্যে এখন সে দুই তিনখানা পত্র লিখিয়াও নরেনের উত্তর না পাইয়া নিজেও পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। "নীলমণি আমার ভাইয়ের মত! তাকে আমি কত ভালবাসি" এই কথা কয়টী মাত্র বুকে লইয়া সে আজ ছয়মাস কাটাইতেছে, কিন্তু সব সময় আর তাহা মনে থাকে না। অন্যত্র জীবিকান্বেষণে যাইতে

মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগে, কিন্তু কাজে এখনো তাহা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। আবার সম্মুখে পূজা, নরেনরা বাড়ী আসিবে। স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছাটা এখন আবার তাহার মন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এবার নরেন্দ্র বাটী আসিলে সে চাকরের মতই দূরে দূরে থাকিত। এইরূপে রুদ্ধ অভিমানের বেদনা যখন দিনে দিনে পাহাড়ের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল, তখন সহসা একদিন সে শুনিল যে, নরেনের সহিত তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।

এক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা সে যাইতে পাইলে জগতের আর কিছুই বোধ হয় চাহিত না, কিন্তু আজ আর সেদিন নাই! তবু নরেন যখন তাহাকে সহাস্যমুখে বলিল, "নীলমণি, আমার সঙ্গে এবার তোমায় কলকাতা যেতে হবে ভাই, নইলে আমার ভারি অসুবিধা হচ্চে! আমায়ত জানই, কিচ্ছু ঠিক্ রাখ্‌তে পারি না। পুঁটেটাকে দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেটা ভারি চোর হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু যতই হোক, তবু আমাদের সব দেখ্‌ত শুন্‌ত তো! আমারই সব চেয়ে কষ্ট হচ্চে, তোমায় যেতে হবে ভাই।" তখন একটুখানি আনন্দের আভাসও যেন মনের মধ্যে দোলা দিয়া গেল। নরেনের যে তাহাকে এটুকু দরকার বোধও হইয়াছে, এ-ও তাহার পক্ষে অনেক লাভ। আর, সব চেয়ে বড় কথা, সে তাহা হইলে নরেনের কাছে থাকিতে পাইবে! যদিও আর এখন সে নরেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবী করে না, তথাপি তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বন্ধন যে এইখানেই!

কলিকাতায় গিয়া সে সুখী বই অসুখী হইল না, যাহার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সে জমীদার বাড়ীর "হারির পারির" ফরমাইস্ খাটিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারই সেবা করিতে সুখ ছাড়া অসুখ আসিতে পারে

না। বন্ধুত্বের দাবীর অভিমানের শেষতম কণাটুকুও ক্রমে নীলমণির মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছিল। জননীর মত ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ স্নেহে সে নরেনের সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিত। এই যত্ন করিতে পাওয়ার সুখ ক্রমে তাহার বন্ধন নিবিড়তম করিয়া দিতে লাগিল। মাঝে যে উদাস ভাব তাহার মনে কদাচিৎ উঁকি মারিত, কলিকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও মন হইতে নীরবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। একদিন সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "নীলমণি! পড়্‌তে ইচ্ছা কর যদি তোমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দি!" ম্লান হাসিয়া নীলমণি উত্তর দিয়াছিল, "আর না দাদা বাবু।"

সুখে থাকিতে পাইলে স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তাও মানুষকে ক্রমে আসিয়া ধরে। নীলমণির এই সুখের মধ্যেও যে দিন সুরেন্দ্র বাবু বাসায় না থাকিতেন সেইদিন স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়া যাইত। সেইদিন নরেনের বন্ধুরাই বাসায় সমবেত হইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। তাহাদেব বেসুরো বেতালা হরেক রকমের গানে ও হারমোনিয়ম বাজানার শব্দে "হাত হইতে আম ডাগর" গোছের বখামি পূর্ণ ইয়ার্কিতে তাস লেমনেড্ বরফ ইত্যাদি অশেষবিধ ফরমাইসে নীলমণি অস্থির হইয়া পড়িত। তাহাদের "ওরে নীলে," "ওহে নীলুখুড়ো" "ও সবে ধন নীল রতনমণি" ইত্যাকার অভদ্রোচিত ভাষার জন্যও সে তাহাদের অধিকতর ঘৃণা করিত। অখিলনাথ ওরফে "প্রিন্স রঞ্জি"ই এরূপ ভাষা ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং নরেনের সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্য বন্ধু। খেলায় সুযশের জন্য সে সুরেন্দ্রনাথেরও একটু প্রিয়পাত্র। সে জন্য তাহার গতিবিধিও সকলের অপেক্ষা ঘন ঘন। নীলমণির অস্বাচ্ছন্দ্যতা ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছিল।

এই ষোড়শ বর্ষীয় "প্রিন্স রঞ্জি"র অকালপক্কতা সম্বন্ধে শীঘ্রই সে একটা এমন প্রমাণ পাইল যে, তাহার ঘৃণা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। একদিন নরেন্দ্রের অসাক্ষাতে অখিলনাথ তাহার হাতে পয়সা দিয়া এমন একটা জিনিষ আনিতে বলিল যে, নীলমণি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়া বলিল, "খবর্দ্দার, আমায় ওসব জিনিষ আন্‌বার ফরমাইস্ কর্‌বেন না। আমি আপনার চাকর নই, এটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন।" অখিল অপ্রস্তুত হইবার ছেলে নয়, অম্লান মুখে বলিল, "ব্যাটা পাঁড়াগেয়ে ভূত! নেশার জিনিষ হাতে কর্‌লেই জাত যাবে, সেই ভয়ে ম'লো! আচ্ছা, যদি তোর মনিবে এনে দিতে বলে?"—নীলমণি গুম্‌রাইয়া অস্পষ্ট গর্জ্জনে বলিল, "সেদিন—দেখা যাবে।"

অখিলের এই স্বভাবের কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে কি না ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে শুনিল যে, মেসে থাকার অসুবিধা হয় বলিয়া অখিলনাথ নরেন্দ্রের সাদর আহ্বানে কিছু দিনের জন্য তাহাদেরই বাসায় আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এ সংবাদে নীলমণির অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। নরেন্দ্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে অত্যন্ত বিচলিত হইল। বন্ধুর নামে লাগাইতে আসিয়াছে বলিয়া নরেন নীলমণির প্রতি যদি অসন্তুষ্টও হয়, তথাপি তাহার এরূপ স্থলে চুপ করিয়া থাকা কোন' মতেই উচিত নয়। অনধিকারের অভিমানও তাহাকে এক্ষেত্রে আর বাধা দিতে পারিল না!

বলিয়া কিন্তু কোন' ফল হইল না। নরেন একটু হাসিয়া বলিল, "যারা খুব খেলোয়াড় হয়, তাদের একটু আধটু নেশা না কর্‌লে চলে না। আর, "কোকেন" তো মদের মত অনিষ্ট করে না—সহরের ছেলেরা প্রায়ই খায়,—আমাদেরই ভাল লাগে না। যা' হোক্, আমি অখিলকে

বারণ করে দেব—তোমায় আর না সে এরকম ফর্মাস করে। তুমি যেন দাদাকে একথা বলোনা কখনো।”

তাহা সে অবশ্য বলিবে না। কিন্তু নরেনের কথায় সে অবাক হইয়া গেল। কোকেন অনিষ্টকারী নয়, নেশা না করিলে খেলা হয় না! কি জানি হইবেই বা! কিন্তু এমন খেলারইবা কি দরকার, যাহাতে নেশা হয়। যাক্, সে পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত, তাহার বেশী কথায় কাজ নাই।

অখিল নরেন্দ্রের নিকট বাস করিতে লাগিল এবং নীলমণিকে আর কখনো সেরূপ ফরমাইস্ করিত না বটে, কিন্তু নীলমণিকৃত সেদিনের অপমানও সে ভুলিতে পারিল না। সেই দিন হইতে নীলমণির উপর তাহারও বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। যখন তখন যে কোন' উপায়ে নীলমণিকে সে অপদস্থ এবং তিরস্কৃত করিবার চেষ্টায় থাকিত। নীলমণির প্রত্যেক কাজেই খুঁত বাহির করিয়া—“নবাব খাঞ্জাখাঁ—“কুড়ের বাদ্সা”—“ভিজে বেড়াল” প্রভৃতি নামকরণ করিয়া—আলো ভাঙ্গা—ঘড়ীর কল খারাপ ক'রে দেওয়া—পানে ইচ্ছে ক'রে চূণ বেশী দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি অপবাদ দিয়াও সে নীলমণির কিছু করিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথের সমক্ষে এসব বড় বেশী প্রকাশিত হইত না, যৎসামান্য যাহা কিছু হইত, অখিল অভ্যাগত বলিয়া তিনিও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেন না এবং নরেনও নীলমণির অজস্র নিন্দা শুনিয়াও এক ভাবেই চুপ করিয়া থাকিত। নীলমণিও অখিলের নিষ্ফল রোষের দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে একটা আমোদ অনুভব করিতে লাগিল।

সে দিন সুরেন্দ্রনাথ বা নরেন্দ্র কেহই বাসায় ছিল না। অখিল অসময়ে কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া ডাকিল—“নীলে!” নীলমণি সযত্নে নরেনের কাপড় কুঁচাইতেছিল, বিরক্তিভরা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল

"যাচ্চি।" ক্ষণপরে উচ্চতর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "এই নীলে। নবাবের ঘুম আর ভাঙ্গে না!" অধিকতর বিরক্ত হইয়া নীলমণি উত্তর দিল, "দাদাবাবুর কাপড় কোঁচাচ্চি।"

"কাপড় কোঁচাচ্চ না মাথা!—প'ড়ে প'ড়ে রামায়ণ পাঠ হচ্চে! আজ কৃত্তিবাস ঠাকুরের শাস্তি হবে দেখ্ছি কিছু আমার হাতে! শুনে যা বল্‌ছি—"

স্থির দৃঢ় কণ্ঠে নীলমণি বলিল, "কি দরকার বলুন—নইলে উঠব না, কোঁচানো নষ্ট হয়ে যা'বে"।

"কি! দরকার না বল্‌লে তুই উঠ্‌বিনা?—ডাম ষ্টুপিড্ রাস্কেল্—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা,—বাঁদি-কি বাচ্ছা!"

নীলমণি বস্ত্র ফেলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে গৃহ মধ্যে গিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল "চুপ। আর জভ্ নাড়্‌বে কি তুমি গিয়েছ। নরেনের বন্ধু ব'লে ঢের সয়েছি—চুপ্!" অখিল ক্ষণকাল যেন বাক্‌রহিত হইয়া গেল—কিন্তু নীলমণি যখন তাহার প্রশান্ত মুখে বলিল, "বল তোমার কি চাই?" তখন নষ্ট সাহস পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অখিল ছুটিয়া গিয়া নীলমণির ঘাড় ধরিল—"হারাম জাদা!" তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল—নীলমণি এক হাতে তাহার ক্ষীণ লম্বা দেহ শূন্যে উত্তোলন করিয়া বলিল, "কেমন—এখন! দিই এক আছাড়?" তাহার পরে নিঃশব্দে অখিলকে একটা ঝাকুনি দিয়া নামাইয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

অখিল সাম্‌লাইয়া লইয়া মহা সোরগোলে কুলী ডাকাইয়া নিজের জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিল! তখন নরেনও কলেজ হইতে আসিয়াছে। সে চমৎকৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের পর কতক তথ্য অবগত হইল। তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল "ওঃ এই জন্য এত? নীলমণিকে এখনি শাসন

করে দিচ্চি—এরই জন্য তুমি এত কাণ্ড করছ!—ছিঃ!" অখিল গম্ভীর মুখে বলিল, "না না নরেন—বিষয়টা তুমি যত সামান্য মনে কর্‌ছ, তত সামান্য নয়! শেষ কালে কি বন্ধুর বাড়ী থেকে বন্ধুর চাকর ঠেঙ্গানো বদ্‌নাম নেব?" অখিল তখনো নিজের গর্ব্বটুকু ছাড়ে নাই শুনিয়া অন্তরালে নীলমণি হাসি চাপিতে পারিল না।

"আর, একটা চাকরের ওপর রাগ ক'রে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, এ ব্যাপারে তুমি কি বিষয়টাকে অযথা বাড়াচ্চো না? যাকে একটু শাসন করলেই গোল্ মিটে গেল, তার উপরে রাগ? ছি! তুমি কি রাগের আর পাত্রও পেলে না! আঃ—মাথাটা যে বেজায় গরম করে ফেলেছ দেখ্‌ছি। চল, একটু বেড়িয়ে আসি, দোকান থেকেই চা-টা খেয়ে নেব এখন আজ,—চল।"

উভয়ে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গেল। নীলমণি বারাণ্ডায় থামের পাশে এক ভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। ষ্টোভে চা'য়ের জল ফুটিয়া যাইতেছে—হস্তে তাহার জল খাবার সজ্জিত রেকাবী।

সে চাকর, এ কথাতো সবাই জানে, সকলেই বলে। একথা এমন নূতন কথাই বা কি? সে চাকরের মত থাকে, চাকরের কাজ করে! সে যে স্বেচ্ছায়ই একদিন নরেনের বাড়ীর সকলেরই চাকর হইয়াছিল। আজ নরেনের মুখে এ কথায় তাহার তবে কেন এত বাজিল?

হ্যাঁ—সে চাকর বটে, কিন্তু—ঐ একটা কিন্তু! ঐ 'কিন্তু' তেই সব গোল হইয়া যাইতেছে! বুকের ভিতর একটা বেদনা শেলের মত ফুটিতেছে, চক্ষের জল ও সংবরণীয় হইতেছে। সে চাকর—কিন্তু "নীলমণি আমার ভাই"—এই কথাটি যে সে কখনো ভুলিতে পারে না, অহরহ অন্তরে অন্তরে সুমিষ্ট রাগিণীর মত বাজিতে থাকে এবং সে সুখের

মাদকতায় সে যে জননীর মত—জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মত নরেনের সর্ব্বসেবা আদরের সহিত বুকে করিয়া লয়, তাহার আত্মীয়দিগের আদেশ মাথায় করিয়া লয়! আজ সে শুনিল, সে এমনি চাকর—যে তাহার উপরে রাগ-করাটাও অন্যের পক্ষে লজ্জার বিষয়!

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে কলিকাতাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, সে অন্ধকার দূর করিবার জন্য গ্যাস পোষ্ট গুলা যেন উজ্জ্বল মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, রাস্তার ফিরিওলা হাঁকিতেছে—'বরফ্'—"অবাক জল পান"।

নীলমণি একবার আলোকিত কক্ষের পানে চাহিল। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল, তিনি যেন তাহাকে খুঁজিতেছেন—"নীলমণি!—কোথায়?" নীলমণি মস্তক নত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল, মনে পড়িল, জগতে কেবল এই একমাত্র ব্যক্তি ভালবাসার নিকটে তাহার এরূপে আত্মসম্মান বিক্রয় পসন্দ করেন নাই। তাহার স্বতন্ত্র মূল্য, ইনি শেষ পর্য্যন্তই যেন নীলমণিকে বুঝাইতে চাহিতেন। নীলমণি তাহা বুঝিতে চাহে নাই, তাই ইঁহার নিকটে যাইতেও সঙ্কুচিত হইত! আজ যাইবার দিন—মস্তক নত করিয়া সে তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিল।

তাহার পরে একবার নরেন্দ্রের কক্ষের পানে চাহিতেই হুহু শব্দে প্লাবনের মত অশ্রুস্রোত আসিয়া তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বাহিয়া ছুটিল। ক্রমে নির্দ্দয় পীড়নে চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে করিতে নীলমণি নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তাহার পরে সেই গলির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের মত সে নিঃশব্দে মিশিয়া গেল!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সমাপ্ত।